শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহ্লভী (রহঃ)

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ

[প্রথম খন্ড]

মূল

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসী দেহলভী (রহ.)

অনুবাদ

অধ্যাপক আখ্তার ফারুক

এম. এম; এম. এ

প্রকাশনায়

রশীদ বুক হাউস

৬নং প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

HUJJATULLUHIL BALIGAH

BY

SHAH WALIULLAH MUHADDIS-E-DEHLAVI

প্রকাশক

আব্দুর রব খান

রশিদ বুক হাউস

৬নং প্যারিদাস রোড,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০১ইং

তৃতীয় প্রকাশ ঃ মে ২০০৮ইং

বর্ণবিন্যাস

ওয়ালেদাইন কম্পিউটার

প্যারিদাস রোড, ঢাকা

মূল্য ঃ ২৪০.০০ টাকা

সূচীপত্র

বিষয়ঃ পৃষ্ঠা

অনুবাদকের আরজ

ইসলামী দুনিয়ার একটি অবিস্মরণীয় নাম হচ্ছে "শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী" আর "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্' হল তাঁর এক অবিনশ্বর কীর্তি। এ মহাগ্রন্থ শুধু মুসলিম জাহানেই নয়, সারা বিশ্বে এক মহা বিস্ময় হয়ে আছে। এ মহাগ্রন্থের মহান গ্রন্থকার কে ছিলেন তা বলা সহজ, কিন্তু কি ছিলেন তা অনুধাবন করা এ অধম তো দূরে, কোন উত্তমের পক্ষেও নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার। তাই তাঁর গ্রন্থের ভাষান্তর ব্রতটি যে স্বতঃসিদ্ধ এক দুঃসাধ্য সাধনা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শুকরিয়া যে, তিনি এ অধম বান্দাকে সেই দুঃসাধ্য সাধনার দুঃসাহস দান করেছেন আর তাওফিক দিয়েছেন তার পয়লা পর্ব সমাপ্ত করার। তাই তাঁরই সমীপে এ অধমের ঐকান্তিক প্রার্থনা, যেন তিনি এর দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত করার তাওফিকও এ অধমকে এনায়েত করেন।

ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ।

অসংখ্য দরূদ ও সালাম সেই মহানবী (সঃ)-এর উদ্দেশ্যে যে মহাজ্যোতিষ্কের অপূর্ব জ্যোতি প্রভায় উপ-মহাদেশে এ বিস্ময়কর জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটেছে। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর আল-আসহাবের ওপরও এ অধমের দরূদ ও ছালাম পৌঁছে দিন। আমীন।

বস্তুতঃ "ফালিল্লাহিল হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ" আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতিটি বাণী ও বিধানই যে অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাঁর জ্বলন্ত স্বাক্ষর বয়ে চলছে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্। তাঁর লৌকিক কি পারলৌকিক, জৈবিক কি আত্মিক কোন বাণী ও বিধানই যে অযৌক্তিক ও অবাস্তব নয় এ মহা গ্রন্থের প্রতিটি পাতায় তার বলিষ্ঠ প্রমাণ উজ্জীবিত হয়ে আছে। তাই যে কোন সংশয়ীমনকে এ মহাগ্রন্থ যথার্থ ঈমানদার, আমলদার, এমন কি সম্ভবতঃ আল্লাহওয়ালায় পরিণত করতে সক্ষম।

তবে কথা হচ্ছে, লাখো গুরুর যিনি গুরু তাঁর গ্রন্থ স্বভাবতঃই গুরুজনদের জন্যে লিখেছেন যেন গুরুজনরা তা অনুধাবন করে লঘুজনদের পথনির্দেশ করেন। তাই লঘুজনরা যে সরাসরি এ গ্রন্থ হজম করতে পারবেন তা' আশা করাই বাতুলতা মাত্র। এ কারণেই আশা করি লঘুজনরা গুরুজনদের

মাধ্যম ছাড়া কখনও এ গ্রন্থ গলাধঃকরণ করতে গিয়ে জটিলতার শিকার হবেন না।

আধুনিক বিশ্বের এটাই বিস্ময় যে, দু'শ বছর আগের এক জ্ঞানতাপস কি করে একালের জটিল সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও অর্থনীতির এরূপ অত্যাধুনিক বিশ্লেষণ ও নীতিমালা দিয়ে গেলেন। আর কি করেই বা তিনি একালের প্রাত্যহিক জটিল সমস্যাগুলোর এরূপ স্থায়ী সমাধান আবিষ্কার করলেন। জ্ঞানের জগতে এরূপ অভাবনীয় দূরদর্শীতার নজীর তাদের সামনে আজও অনুপস্থিত।

শরীয়তের ছোট-বড় প্রতিটি বিধানই যে মানবকুলের জন্য অশেষ কল্যাণপ্রদ ও তাদের সকল ব্যাধি নিরসনের অমোঘ বিধান তা এত অকাট্যভাবে এ গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে যা এ কালের তর্কশাস্ত্রের মহাপণ্ডিতরাও খন্ডন করতে পারবেন না। আল্লাহর দ্বীন কবুল করার তাওফিক যার হয়নি তাকেও এ গ্রন্থ মানিয়ে ছাড়বে যে, মূলতঃ এ দ্বীনই সত্য দ্বীন। হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার এটাই শ্রেষ্ঠতম সাফল্য।

মালা-এ-আ'লার সর্বোচ্চপরিমণ্ডল পরিবৃত অবস্থায় যে মহাগ্রন্থ রচিত হয়েছে, মালা-এ আসফালের সর্বনিম্ন পরিমণ্ডলের এ অধম বাসিন্দা তার কতটুকু মর্ম উদ্ধার করতে পেরেছে তা আল্লাহই ভাল জানেন। তবে সান্ত্বনা এই যে, যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। তাই বলছি, এক মহামানবের এ মহান গ্রন্থের কিছুমাত্র মর্ম উদ্ধার করেও যদি জাতিকে উপহার দিতে সমর্থ হয়ে থাকি, তার সব কৃতিত্বই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের। পক্ষান্তরে এ ক্ষেত্রে যা কিছু ব্যর্থতা ও ভুল-ভ্রান্তি তার সব দায়-দায়িত্ব একান্তই আমার, তাই অনুরোধ, কোন সহৃদয় গুরুজন যদি এ ক্ষেত্রে আমাকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন তা হলে সানন্দে ও সকৃতজ্ঞ চিত্তে তা গ্রহণ করা হবে।

আল্লাহ পাক এ গ্রন্থকেও মূল গ্রন্থের মকবুলিয়াত ও বরকত দান করুন এটাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। আমীন।

আহ্কার

আখতার ফারুক

গ্রন্থকার পরিচিতি

পটভূমি ঃ

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই ইসলামের আওয়াজ ভারত উপমহাদেশে পৌছেছিল।

প্রাচীনকাল থেকেই আরব ব্যবসায়ীগণ ভারত উপমহাদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখত। বিশেষতঃ শ্রীলঙ্কা ও উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলীয় এলাকাগুলোর সাথে আরবদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। এ পথেই সুদূর চীন পর্যন্ত তাদের বাণিজ্যিক নৌবহর যাতায়াত করত।

উপমহাদেশে শুধু বাণিজ্যিক সম্পর্কের মাধ্যমেই ইসলাম আসেনি; বরং হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর যুগেই এদেশে মুসলমানদের সামরিক অভিযান শুরু হয়। অতঃপর ৯২ হিজরীতে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম সিন্ধু জয় করে উমাইয়া খেলাফতের অন্তর্ভূক্ত করেন। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফতের সময়ে উমহাদেশের পশ্চিম অঞ্চলের সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত মুসলমানদের সামরিক তৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল। আব্বাসীয় খেলাফতের শেষভাগে সুলতান মাহমুদ বারংবার অভিযান চালিয়ে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বিশাল এলাকা দখল করেন।

মাহমুদ গজনভীর শাসন কালের পর মুহাম্মদ ঘোরীর শাসন শুরু হয়। মুহাম্মদ ঘোরী বারংবার অভিযান চালিয়ে উপমহাদেশের অধিকাংশ এলাকা জয় করেন। অতঃপর দাস, খিলজী ও লোদী বংশের শাসনামলে সর্ব ভারতে মুসলিম শাসনের জয় ডংকা নিনাদিত হয়। পরিশেষে মোঘল শাসনামলে গোটা উপমহাদেশ ইসলামী শাসনের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। অবশেষে সম্রাট আলমগীরের সময়ে সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি ঘটে। কিন্তু তাঁর পরবর্তী সম্রাটদের দুর্বলতার কারণে মোঘল শাসনের পতন শুরু হয়। এমনকি শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা ইংরেজের হাতে চলে যায়।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) মোগল সম্রাটদের এই পতনকালের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তখন চারদিকে বিদ্রোহ ও হাংগামা

চলছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাঙ্গনের সর্বত্রই এক নৈরাজ্যকর অবস্থা চলছিল। চারদিকে জুলুম, শোষণ ও অস্থিরতা বিরাজ করছিল। ঠিক এমনি এক মুহূর্তে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) এক প্রভাতী সূর্যের ন্যায় আবির্ভূত হলেন। তিনি ইসলামকে বিকৃতির হাত থেকে মুক্ত করলেন। রাজনীতিকে ইসলামের সেবক ও ইসলামপন্থীদের শৌর্যের প্রতীকরূপে প্রতীয়মান করালেন।

নাম ঃ

হুজ্জাতুল ইসলাম শায়েখ কুতুবুদ্দিন আহমদ ওরফে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী ইবনে শায়েখ আবদুর রহীম ইবনে শায়েখ ওয়াজিহ উদ্দীন ইবনে শায়েখ মুয়াজ্জিম ইবনে শায়েখ মানসুর ইবনে শায়েখ আহমদ ইবনে শায়েখ মাহমুদ ইবনে শায়েখ নিজামুদ্দিন ইবনে শায়েখ কামালুদ্দীন ছানী ইবনে শায়েখ কাজী কাসেম ইবনে শায়েখ কাজী বুধা ইবনে শায়েখ আবদুল মালেক ইবনে শায়েখ কুতুবুদ্দীন ইবনে শায়েখ কামালুদ্দীন (আউয়াল) ইবনে শায়েখ শামসুদ্দীন মুফতী ইবনে শের মালিক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবুল ফাতাহ ইবনে উমর ইবনে আদিল ইবনে ফারুক ইবনে জার্জিস ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উসমান ইবনে হামান ইবনে হুমায়ুন ইবনে কুরায়েশ ইবনে সুলায়মান ইবনে আফফান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব আল কুরায়শী।

শাহ সাহেব (রঃ) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ "তাফহীমাতে এলাহীয়ার" দ্বিতীয় খণ্ডে বলেনঃ

আমার মুহতারাম আব্বা (শায়েখ আবদুর রহীম) ছিলেন জাহেরী ও বাতেনী ইলমে পরিপূর্ণ। তিনি ছিলেন এক আরিফ বিল্লাহ ওলী। ঘটনাক্রমে তিনি একবার শায়েখ কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রঃ)-এর মাজার জিয়ারত করতে গেলেন। শায়েখ বখতিয়ার কাকী (রঃ) তাঁর সাথে কথাবার্তা বললেন। তিনি আব্বাকে একটি সন্তানের সুসংবাদ দিলেন। সন্তানটি তাঁর ঘরেই জন্ম নেবে। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন ছেলের নাম রাখবে কুতুবুদ্দীন। অতঃপর যখন আমার জন্ম হল, আল্লাহ পাক তাঁকে কুতুবুদ্দিন নাম রাখার ব্যাপারটি ভুলিয়ে দিলেন। তিনি নাম রাখলেন

ওয়ালিউল্লাহ। পরে অবশ্য কুতুবুদ্দীন নামও রেখেছিলেন। শাহ্ সাহেব (রঃ) ফারুকী খান্দানের লোক। তাই ইসলামের শুরু থেকেই তারা ইসলামী শিক্ষা ও রাজনীতির সমন্বয়কারী হিসেবে চলে আসছেন। তাঁদের বংশে বীরত্ব, বদান্যতা, জ্ঞান ও মর্যাদায় খ্যাতিমান বহু ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে।

তাঁর খান্দানের ভেতর সর্বপ্রথম উপমহাদেশে আগমন করেন শায়েখ শামসুদ্দীন মুফতী। তিনি দিল্লী থেকে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত এক ক্ষুদ্র শহরে এসে অবস্থান নেন। তিনি অত্যন্ত উঁচু দরের আলেম, জাহেদ ও পরহেজগার বুযুর্গ ছিলেন। ইসলামের প্রচার-প্রসার কল্পে তিনি সেখানে একটি দ্বীনি মাদ্রাসা কায়েম করেন এবং দ্বীনের প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সময়ে দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাঁকেই সবাই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পথপ্রদর্শক ভাবত। ফলে পার্থিব ঝগড়া-বিবাদের কাজী ও দ্বীনি মাসায়েলের মুফতী হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করতেন।

তাঁর পর থেকে শায়েখ মাহমুদ ইবনে কাওয়ামুদ্দীন পর্যন্ত কাজীর দায়িত্বভার তাঁদের হাতেই ছিল। তবে শায়েখ মাহমুদ তা পরিত্যাগ করে সেনা বিভাগে যোগ দেন। শাহ সাহেব (রঃ)-এর দাদা পর্যন্ত তাঁর পূর্বপুরুষরা জেহাদের ময়দানেই দ্বীনের শান-শওকত বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত থাকেন। কাফে- মোশরেকের বিরুদ্ধে জেহাদে লিপ্ত থাকাকেই তাঁরা পেশা করে নিয়েছিলেন। তাঁর দাদা শায়েখ ওয়াজিহুদ্দীন আজীবন রণাঙ্গণে কাটিয়েছেন। এমনকি মোগল সম্রাট মহিউদ্দিন মুহাম্মদ আলমগীরের সময়ে তিনি জেহাদের ময়দানে শাহাদাত বরণ করেন।

শায়েখ ওয়াজিহুদ্দীনের তিন ছেলে ছিল, তারা হলেন শায়েখ আবু রেজা মুহাম্মদ, শায়েখ আব্দুল হাকীম ও শায়েখ আবদুর রহীম। শাহসাহেবের পিতা শায়েখ আবদুর রহীম ১০৬৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কুরআন শরীফ, নাহু, সরফ ও অন্যান্য প্রারম্ভিক শিক্ষার কিতাবাদি তার বড় ভাই শায়েখ আবু রেজা মুহাম্মদের কাছে পড়েন। পরবর্তী স্তরে তিনি আল্লামা মীর মোহাম্মদ জাহেদের কাছে জ্ঞানার্জন করেন। এমনকি কিতাবী ও তাত্ত্বিক জ্ঞানে তিনি এরূপ পারদর্শী হলেন যে, তিনি অনতিকালের ভেতর এ উভয়বিধ জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালেন। সম্রাট আলমগীর জিন্দাপীরের উদ্যোগে প্রণীত "ফতোয়ায়ে আলমগীরী" কিতাবের তিনি

সম্পাদনা ও শুদ্ধিকরণের দায়িত্ব পালন করেন। বাদশাহ আলমগীর তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন।

শরয়ী মাজহাবের দিক থেকে তিনি হানাফী ছিলেন। তাসাওফের ক্ষেত্রে তিনি নকশবন্দী তরীকার অনুসারী ছিলেন। অবশ্য দলীলের শক্তি ও প্রাধান্যের কারণে কখনও হানাফী মজহাবের বাইরেও ফতোয়া দিতেন। ১১৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

জন্ম ঃ

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) ১১৬৪ হিজরীর ১৪ই শাওয়াল বুধবার দিল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। অর্থাৎ, ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। শায়েখ আবদুর রহীম (রঃ)-এর জীবনচরিত "বাওয়ারিফুল মারিফাত" গ্রন্থে শাহওয়ালিউল্লাহ (রঃ)-এর জন্মকাল ও তার প্রাক্কালের এমনসব ঘটনাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাতে তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শিক্ষা জীবন ঃ

পাঁচ বছর বয়সেই কুরআন শিক্ষার জন্য তাঁকে মকতবে ভর্তি করা হয়। সাত বছর হতেই তিনি কুরআনের হাফেজ হলেন। সে বছরেই তাঁর আব্বা তাঁকে রোযা রাখার নির্দেশ দেন। এমনকি ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধানও যথাযথভাবে আমল করার জন্যে উপদেশ দেন।

সাত বছর বয়স থেকে তিনি ফার্সী কিতাব অনায়াসে পড়ার যোগ্যতা হাসিল করেন। এক বছরে ফার্সী শেষ করে নাহু, সরফ সম্পর্কিত গ্রন্থাদি পড়া শুরু করেন। দশ বছর বয়সে তিনি শরহে মোল্লা জামী আয়ত্ত করেন। মোটকথা মাত্র তিন বছরে তিনি নাহু-সরফে এরূপ পারদর্শী হলেন যে, উক্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ পর্যন্ত তাঁর সামনে এসে মাথা নত করতে বাধ্য হতেন।

তিনি লোগাত, তফসীর, হাদীস, ফিকাহ, তাসাওফ, আকায়েদ, মানতেক, চিকিৎসা শাস্ত্র, দর্শন, অংক শাস্ত্র, জ্যোতি বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক কিতাব ও গ্রন্থাদি তাঁর আব্বা শায়েখ আবদুর রহীমের কাছে শিখেন। মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি এসব কেতাব শেষ করেন। পুঁথিগত ও জ্ঞানগত সকল বিদ্যা শেষ করে তিনি তাঁর আব্বার হাতে আধ্যাত্মিক

জ্ঞানার্জনের জন্যে বাইয়াত নেন। অতঃপর তিনি নকশবন্দীয়া তরীকার সুফীদের বিভিন্ন স্তর আয়ত্ত করেন। তিনি আধ্যাত্ম চর্চার ক্ষেত্রেও এরূপ দক্ষতা অর্জন করলেন যে, অল্পসময়ের ভেতরে তিনি সে জগতেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করলেন। সলুক সম্পর্কিত তালীম শেষ হলে তাঁর আব্বা শায়েখ আবদুর রহীম তাঁর মাথায় মর্যাদার পাগড়ী বেঁধে দেন এবং তাঁকে শিক্ষা দান করার অনুমতি প্রদান করেন। এ উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। তাতে দিল্লীর ওলামায়ে কেরাম, বুযুর্গানে দ্বীন, কাজীবৃন্দ ও অন্যান্য আমীর-উমারা উপস্থিত হন। সকলের উপস্থিতিতে শায়েখ আবদুর রহীম তাঁর ভাগ্যবান মহা মর্যাদাবান পুত্র শাহ ওয়ালিউল্লাহকে জাহেরী ও বাতেনী দ্বীনী ইলম শিক্ষা দানের অনুমতি দান করেন। পরন্তু তিনি নিজ পুত্রের ইলম ও হায়াত দারাজীর জন্যে দোয়া করেন। গোটা মজলিস আমীন, আমীন বলে দোয়ায় শরীক হন এবং এক যোগে তাকে মোবারকবাদ জানান।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) তাঁর আব্বা ও শায়েখ মুহাম্মদ আফজাল শিয়ালকুটির কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

বিবাহ ঃ

শাহ সাহেব (রঃ)-এর বয়স যখন চৌদ্দ বছর, তখনই তাঁর পিতা তাঁকে বিয়ে করাবার সিদ্ধান্ত নেন। যদিও সংসারের অন্য সবাই বিয়ের প্রস্তুতি নেই বলে ওজর পেশ করেন, তথাপি তাঁর পিতা সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তিনি বরং অতি ক্ষিপ্রতার সাথে এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য উদগ্রীব হলেন। তিনি লিখে পাঠালেনঃ কেন আমি এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছি তা তোমরা অচিরেই বুঝতে পারবে। এ চিঠি পেয়ে সবাই রাজী হয়ে গেলেন এবং বিয়ে সম্পন্ন হল।

বিয়ের পর পরই তাঁর কজন নিকটাত্মীয় ইন্তেকাল করেন। কদিন না যেতেই শায়েখ আবু রেজার ছেলে আবদুর রশীদ মারা যান। তার কিছুদিন পর শাহ সাহেবের মাতা ইন্তেকাল করেন। তারপর স্বয়ং তাঁর আব্বা শায়েখ আবদুর রহীমও ইন্তেকাল করেন। এটাই ছিল শাহ সাহেবের বিবাহের ব্যাপারে তার পিতার তাড়াহুড়ার মূল রহস্য।

পর পর এতগুলো আঘাত স্বভাবতঃই তার ওপর প্রভাব ফেলেছিল।

তথাপি তিনি তাঁর জাহেরী ও বাতেনী ইলমের জোরে এসব বিপদাপদ সহজেই কাটিয়ে উঠেন।

হারামাইনের সফর ঃ

১১৩১ হিজরীতে তার আব্বার ইন্তিকালের পর তিনি রহীমিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। তারপর একযুগ শিক্ষকতার মাধ্যমে তিনি আরব-আজমের সর্বত্র স্বীয় শিক্ষাগত যোগ্যতায় বিরাট খ্যাতি অর্জন করেন। চারদিক থেকে ছাত্ররা ছুটে আসছিল তাঁর কাছে জ্ঞানার্জনের জন্যে। তারা জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন। বার বছর শিক্ষকতার পর তিনি হজ্জের নিয়তে হারামাইন শরীফাইনে যাবার উদ্যোগ নেন এবং ১১৪৩ হিজরীতে তিনি হেজাজে তশরীফ নেন। অতঃপর ১১৪৫ হিজরীতে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রায় দু'বছর তিনি মক্কা ও মদীনায় কাটান। সেখানকার ওলামায়ে কেরামের সাথে মিলিত হন। সেখানকার হাদীসবেত্তাদের থেকে তিনি হাদীসের সনদ নেন। বিশেষতঃ শায়েখ ওবায়দুল্লাহ ইবনে শায়েখ মোহাম্মদ ইবনে সুলায়মান আল-মাগরেবীর কাছ থেকে তিনি বিশেষভাবে হাদীসের সনদ গ্রহণ করেন। তাছাড়া সেকালের হারামাইনের সেরা আলেম, ফকীহ ও মুহাদ্দেস শায়েখ আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল-মাদানী থেকেও তিনি হাদীসের সনদ নেন। এ সম্পর্কে তিনি স্বয়ং বলেন ঃ

"আমি হারামাইন শরীফাইনের অধিকাংশ বুযুর্গের সাথে দেখা করেছি। সেখানকার অধিকাংশ সম্মানিত লোকদের সাথে মেলামেশা করেছি। কিন্তু তাদের কাউকেই সর্বজ্ঞাতা পারদর্শী হয়েও উত্তম চরিত্রে বিমণ্ডিত রূপে দেখতে পাইনি। শুধুমাত্র শায়েখ আবু তাহের আল-মাদানীকে আমি সেরূপ পেয়েছি। তাঁর দূরদর্শীতা ও অগাধপান্ডিত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমি আমার গ্রন্থরাজির বিভিন্ন স্থানে তা উল্লেখ করেছি।"

শাহ সাহেব (রঃ) তাঁর সান্নিধ্যে যথেষ্ট সময় কাটিয়েছেন। তাঁর কাছে হাদীসের বর্ণনা শুনেছেন। মোটকথা শায়েখ আবু তাহের আল-মাদানী তাঁকে শুধু সনদদেননি, তাঁর নিজস্ব খিরকাও শাহ সাহেবকে দান করেন। সে খিরকা জাহেরী ও বাতেনী সকল প্রকার ইলম ও ফায়েজের আধার ছিল।

হারামাইনে থাকা কালে তিনি শায়েখ তাজুদ্দীন হানাফীর খেদমতেও হাজির হন। তাঁর কাছ থেকেও তিনি সনদ হাসিল করেন। তাছাড়াও তিনি সেখান থেকে শায়েখ আহমদ থানাভী, শায়েখ আহমদ কাশানী, সাইয়েদ আবদুর রহমান ইদরিসী, শায়েখ শামসুদ্দীন মোহাম্মদ, শায়েখ ঈসা জাফরী, শায়েখ হাসান আজমী, শায়েখ আহমদ আলী, শায়েখ আবদুল্লাহ্ ইবনে সালেম প্রমুখ থেকেও সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে সনদ হাসিল করেন। শায়েখ আবদুল্লাহ ইবনে সালেম আল বাসরী ওয়াল মক্কী সবচেয়ে উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দেস ও আলিম ছিলেন।

দেশে প্রত্যাবর্তন ঃ

হারামাইন শরীফাইনের বুযুর্গ ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে জাহেরী ও বাতেনী ইলমে ভরপুর হয়ে শাহ সাহেব উপমহাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১১৪৫ হিজরীর ১৪ই রজব তিনি দিল্লী পৌছেন এবং নিজ পৈত্রিক আলয়ে অবস্থান করেন। কিছুদিন তিনি বিশ্রাম নেন। এ ফাঁকে দিল্লীর ওলামা-মাশায়েখদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। তারপর রহীমিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা দানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। শত শত হাদীস শিক্ষার্থী সেখানে ছুটে এসে তাঁর কাছ থেকে হাদীসের সনদ হাসিল করে চললেন। আশে-পাশের রাজ্যগুলোয়ও অনতিকালের ভেতর হাদীস চর্চা ছড়িয়ে পড়ল।

শাহ সাহেবের যুগে মুসলমান হাদীস সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছিল। তারা ফিকাহ্ শাস্ত্রকেই ইলমের জন্যে যথেষ্ট ভাবত। শাহ সাহেবই হাদীসের গুরুত্ব সুস্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। তিনি লোকদের কোরআন ও হাদীসের গভীর অধ্যয়ন এবং এ দুটোকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়ার ও সব মতভেদের বিষয়গুলোর মীমাংসা কোরআন ও হাদীস থেকে আহরণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন। এমনকি এ ক্ষেত্রে তিনি আশাতীত সাফল্যও লাভ করেন।

মছলক ঃ

শাহ সাহেবের অনুসৃত পন্থা ছিল সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থা। তিনি বিশুদ্ধ বর্ণনা ও যুক্তি-প্রমাণ এক করে ফকীহ্দের রাস্তায় চলতেন এবং অধিকাংশ ওলামা ও ফোকাহাদের মতৈক্যের ভিত্তিতে তিনি রায় দিতেন।

মতভেদের বিষয়গুলোয় তিনি বিশুদ্ধ হাদীস অনুসরণ করতেন। দ্বীনী ইলমের ক্ষেত্রে তিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তিনি হানাফী ও শাফেয়ী মজহাবকে প্রাধান্য দিয়ে পড়াতেন। উপমহাদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী যেহেতু হানাফী মজহাবের অনুসারী তাই তিনি সে মজহাবের বিরোধিতা করতেন না।

প্রায় সমগ্র উম্মতই চারটি প্রণীত মজহাবের সাথে জড়িত হয়ে গেছে। তাই আমাদের যুগে তাদের তাকলীদ করা বৈধ হয়ে গেছে। তার ভেতরে কয়েকটি কল্যাণকর দিক রয়েছে আর তা অস্পষ্টও নয়। যে যুগে মানুষের হিম্মত কমে গেছে আর মানুষের অন্তরগুলো বাসনা-কামনায় ভরপুর হয়ে গেছে, সে যুগে এ ছাড়া আর করারই বা কি আছে?

ছাত্রবৃন্দ ঃ

শাহ সাহেবের অসংখ্য ছাত্র ছিলেন। তাদের ভেতরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁর চার ছেলে যথাক্রমেঃ শাহ আবদুল আসীফ, শাহ্ রফিউদ্দিন, শাহ আবদুল কাদের ও শাহ আবদুল গনী। অন্যান্যরা হলেন ঃ শায়েখ মুহাম্মদ আশেক দেহলভী, শায়েখ মুহাম্মদ আমীন কাশ্মীরী, সাইয়্যেদ মুর্তাজা বিলগ্রামী, শায়েখ জাফরুল্লাহ ইবনে আবদুর রহীম লাহোরী, শায়েখ মুহাম্মদ আবু সাঈদ বেরেলভী, শায়েখ রফিউদ্দিন মুরাদাবাদী, শায়েখ মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ্ বিলগ্রামী, শায়েখ মুহাম্মদ মুঈন সিন্ধী, কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী প্রমুখ।

রচনাবলী ঃ

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তার ভেতরে প্রায় পঞ্চাশখানার খোঁজ পাওয়া গেছে। তিনি তফসীর, হাদীস, তাসাওফ অন্যান্য ইসলামী বিষয়াবলীর ওপর এমন সব গ্রন্থ রচনা করেন যা দেখে জাহেরী বাতেনী ইলমের ধারক ও বাহকগণ তাঁকে এক বাক্যে ইমাম হিসেবে মেনে নেন। তিনি কিছু গ্রন্থ আরবী ভাষায় ও কতিপয় গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় রচনা করেন। তাঁর যুগে ফার্সী ছিল সরকারী ভাষা। তাই দেশব্যাপী এ ভাষায় বহুল প্রচলন ছিল। শাহ্ সাহেবের প্রণীত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

১। ফত্হুর রহমান বতরজামাতুল কুরআন ঃ

এটি হচ্ছে কুরআন পাকের ফার্সী অনুবাদ। আজ থেকে দেড়শ বছর আগে এ অনুবাদ কার্যটি সম্পন্ন হয়। তথাপি আজও এর কল্যাণকারিতা ও গুরুত্ব সমানেই অনুভূত হচ্ছে। শাহ্ সাহেব তাঁর অনুবাদে গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলো সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

২। আয্ যুহরাবীন ফী তাফসীরে সূরা বাকারা ওয়া আলে ইমরান ঃ

এটা সূরা বাকারা ও আলে ইমরানের ফার্সী বিশ্লেষণ।

৩। আল-ফাউযুল কাবীর ঃ

তফসীর শাস্ত্রের নীতিমালা সম্পর্কিত এ গ্রন্থখানি শাহ্ সাহেবের একটি মূল্যবান অবদান। এর মধ্যে তিনি কুরআন পাকের মূল পাঁচটি বিষয়ের ওপর আলোপকপাত করেছেন। এতে তিনি কুরআনের ব্যাখ্যা ও তার রীতি-নীতি সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও মূল্যবান আলোচনা করেছেন। মোটকথা শাহ সাহেবের এ ক্ষুদ্রাকৃতির গ্রন্থটি এ বিষয়ের ওপর রচিত বিরাট বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দিয়েছে। কুরআনের হরফের মুকাত্তায়াত ও অন্যান্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় তিনি এতে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

৪। ফতহুল কবীর ঃ

এতে কুরআনের কঠিন ও দুর্লভ শব্দ ও পরিভাষার সহজ ও সুন্দর সমাধান রয়েছে। কিতাবটি আরবী ভাষায় লিখিত। কুরআনের আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীসের সাহায্যে তিনি বিভিন্ন শব্দ ও পরিভাষার বিশ্লেষণ করেছেন।

৫। আল মুসাওয়া মিন আহাদীসিল মুয়াত্তা ঃ

ইমাম মালিকের হাদীস সংকলন "আল মুয়াত্তার" এক বিস্ময়কর আরবী ভাষ্য। শাহ সাহেব ফেকহী দৃষ্টিকোণ থেকে এর অধ্যায়গুলো সজ্জিত করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি ইমাম মালেকের সেসব মতামত বাদ দিয়েছেন যা অন্যান্য সকল মুজতাহিদের পরিপন্থী। তার বিন্যস্ত প্রত্যিটি অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কুরআনের আয়াতের তিনি সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। এ গ্রন্থটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করায় এর বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৩৫১ হিজরীতে মক্কা শরীফের "আল মাকতাবাতুস্ সলাফিয়া" থেকেও এটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়।

৬। আল মুসাফ্‌ফা শরহে মুয়াত্তা ঃ

এটি মুয়াত্তার ফার্সী ভাষ্য। সংক্ষিপ্ত হলেও ভাষ্যটি খুবই উপাদেয়। এতে তিনি মুজতাহিদ সুলভ পর্যালোচনা করেছেন। এতে তার ইজতিহাদ ও ইস্তেখরাজের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

৭। আল আরবাঈন ঃ

শাহ সাহেব এতে চল্লিশটি হাদীসের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। হাদীসগুলো স্বল্প কথায় অথচ ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। হাদীসগুলো তিনি তাঁর শায়েখ আবু তাহের (রঃ)-এর সনদে হজরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন।

৮। মুসাল সিলাত ঃ

এটি একটি ক্ষুদ্রকায় আরবী কেতাব। সনদ সম্পর্কিত অতি মূল্যবান তথ্য এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৯। হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ঃ আরবী ভাষায় রচিত শাহ সাহেবের এ গ্রন্থটি একটি অমূল্য সম্পদ। এতে শরীয়তের বিধি-নিষেধগুলোর গূঢ় রহস্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে। পরন্তু এ কালের আধুনিক মন-মানসের শরীয়ত সম্পর্কিত বিভিন্ন জিজ্ঞাসার চমৎকার জবাব দান করা হয়েছে। মোটকথা এ গ্রন্থটি একটি অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় গ্রন্থ। প্রাচীন ও নবীন সবার জন্যেই এটি সমান উপাদেয়।

১০। আকদুল জীদ ফীল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ ঃ

ইজতিহাদ ও তাকলীদের ওপর লিখিত একটি বিরল আরবী গ্রন্থ।

১১। আল ইরশাদ ইলা মুহিম্মাতে ইলমিল ইসনাদ ঃ

এটি আরবী ভাষায় লেখা সনদ সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব।

১২। আল ইনসাফ ফী-বয়ানে সাববিল ইখতিলাফ ঃ

এটি আরবী ভাষায় লেখা একটি উত্তম কিতাব। এতে ফকিহ ও মুহাদ্দেসের মতভেদের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া তাকলীদ করা বা না করার ব্যাপারেও এতে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে। শাহ সাহেব তাঁর আলোচনায় সকল সংকীর্ণতার অবসান ঘটিয়েছেন।

১৩। আল ইন্তিবাহ ফী-সালাসিলে আওলিয়া আল্লাহ ঃ

গ্রন্থটি ফার্সী ভাষায় রচিত। পয়লা খণ্ডে খ্যাতনামা আওলিয়ায়ে কেরামের সিলসিলার সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডে রয়েছে হাদীসের

সনদসমূহ ও ফিকাহ শাস্ত্র সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্যাবলী। হাদীস ও ফিকাহের ওপর শাহ সাহেব এ গ্রন্থটিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

১৪। তারাজিমু আবওয়াবিল বুখারী ঃ

এটি আরবী ভাষায় একটি মূল্যবান গ্রন্থ। হায়দরাবাদে এটি ছাপা হয়।

১৫। ইযালাতিলখাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা ঃ

শাহ সাহেব (রঃ)-এর যুগে রাফেজীদের উৎপাত বেড়ে গিয়েছিল। শাহ সাহেব তাদের যাবতীয় প্রশ্নাবলীর জবাব দিয়ে এ গ্রন্থটি লিখেন। এতে তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। পরন্তু ইসলামী হুকুমতের তাৎপর্য কি তাও তিনি তাতে সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। এমনকি ইসলামী হুকুমতের রূপরেখাও পেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের গুণাবলী ও তাঁদের খেলাফতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এবং ইসলামী রাজনীতির নীতিমালাগুলো সবিস্তারের বর্ণনা করেছেন। এ কিতাবের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

১৬। কুররাতুল আইনাইন ফী তাফাসিলিশ শায়খাইন ঃ

এটি একটি ফার্সী গ্রন্থ। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর গুণাবলী ও মর্যাদার বিভিন্ন দিক তিনি এতে তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থে দলীয় প্রমাণ ও যুক্তি বুদ্ধি দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন যে, তাঁরা দু'জন উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাতে হযরত উসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা বর্ণনা করে রাফেজীদের সমালোচনার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন।

১৭। কিতাবুল ওয়াসিয়াত ঃ

এটি একটি ফার্সী পুস্তিকা। এতে শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

১৮। রিসালায়ে দানেশমন্দী ঃ

এটিও একটি কল্যাণপ্রদ ফার্সী পুস্তিকা। এতে শিক্ষাদানের পদ্ধতি নিয়ে লিখেছেন।

১৯। আল কাওলুল জামীল ঃ

শাহ সাহেব (রঃ) তাসাওফ তত্ত্বের ওপর সংক্ষেপে অথচ সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ এ গ্রন্থটি আরবী ভাষায় রচনা করেন। তাসাওফের চার তরীকার সিলসিলাগুলো এতে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। এ চার তরীকাই উপমহাদেশে চালু রয়েছে। এতে তিনি তাঁর পিতা শাহ আবদুর রহীম ও অন্যান্য বুযুর্গদের ওজিফা ও দোয়া-দরূদ লিপিবদ্ধ করেছেন।

২০। সাতাআত, ২১। হামাআত, ২২। লামাহাত ঃ

এ তিনটি পুস্তিকাও তাসাওফের ওপর লেখা হয়েছে।

২৩। আলতাফুল কুদ্স ঃ

এটি ফার্সী ভাষায় লিখিত তাসাওফ সংবলিত অত্যন্ত মূল্যবান একটি পুস্তিকা।

২৪। তা'বীলুল আহাদীস ঃ

এটি আরবী ভাষায় লেখা একটি কল্যাণপ্রদ গ্রন্থ। কুরআন পাকে যে সব আম্বিয়ায়ে কেরামের উল্লেখ রয়েছে, এ গ্রন্থে তাদের ঘটনাবলীর সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে নবী করীম (সঃ) পর্যন্ত নবুয়তের যে ক্রমবিকাশ ও পূর্ণতা ঘটেছে তার রহস্য ও ব্যবস্থাপনা সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তবে কিতাবটি স্বভাবতঃই জটিল ও আয়াশলব্দ।

২৫। আল খায়রুল কাসীর ঃ

এ কিতাবটিও আরবী ভাষার রচিত। এটা সৃষ্টি জগতের রহস্য ও কলাকৌশলের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। এ বিষয়ের ওপর এটা এক অনন্য গ্রন্থ।

২৬। আত্ তাফহীমাতে এলাহিয়্যা ঃ

এ গ্রন্থটি দু'খণ্ডে লিখিত। এর কিছু অংশ আরবী ও ফার্সীতে লেখা হয়েছে। এতে বিভিন্ন শ্রেণীর মাকালাত ও রিসালা জমা করা হয়েছে। শরীয়ত ও যুক্তিবুদ্ধির বিভিন্ন সমস্যা এতে আলোচিত হয়েছে এবং ইলহামীপন্থায় তা উপস্থাপন করা হয়েছে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ একাডেমী থেকে তার নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

২৭। আল বদুরুল বালেগাহ ঃ

তাসাওফ শাস্ত্রের ওপর লেখা শাহ সাহেবের এ গ্রন্থখানি অনন্য। এ

গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে শাহ্ সাহেবের অন্যান্য গ্রন্থ বুঝা সহজ হয়ে যায়। সত্য কথা এই যে, কিতাবটি শাহ্ সাহেবের অন্যান্য কিতাবের সারমর্ম। এ কিতাবটিও শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়।

২৮। ফুয়ূজুল হারামাইন ঃ

এ গ্রন্থটিতে শাহ্ সাহেব সেই সমস্ত ব্যাপার সন্নিবেশিত করেছেন যা তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান কালে হযরত (সঃ)-এর রুহানী ফয়েযের মাধ্যমে হাসিল করেছেন। সংক্ষিপ্ত হলেও কিতাবটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও কল্যাণকর।

২৯। আদ্দুররুস সামীন ফী মুবাশ্শিরাতে নবায়্যেল আমীনঃ

এ কিতাবে শাহ্ সাহেব তাঁর পিতা শায়েখ আবদুর রহীম ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়েখ আবুর রিজা মুহাম্মদের বিশেষ বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

৩০। হুসনুল আকীদা ঃ

আরবী ভাষায় লিখিত এ গ্রন্থটিতে আকায়েদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩১। ইনসানুল আইন ফী মাশায়েখিল হারামাইন ঃ

ফার্সী ভাষায় এ গ্রন্থটিতে শাহ্ সাহেব ইতিহাস সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন।

৩২। আল মুকাদ্দামাতুস সুন্নিয়াহ্ ফী ইনতিসারে ফিরকাতুস সুন্নিয়াহ্ ঃ

এ গ্রন্থটিতে আরবী ভাষায় আকায়েদ সম্পর্কে লেখা হয়েছে। এ গ্রন্থটি এ বিষয়ে অনন্য।

৩৩। আল মাকতুবুল সাদানী ঃ

এটি তাওহীদের হাকীকত সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি। তিনি ইসমাইল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে রূমীর কাছে এ চিঠি লিখেছিলেন।

৩৪। আল হাওয়ামেহ্ ফী শরহে হিজবিল বাহ্র ঃ

এটি হিজবুল বাহর কিতাবের এক অতুলনীয় ভাষ্য।

৩৫। শেফাউল কুলুব ঃ

এটি ফার্সী ভাষায় তাসাওফের ওপর লেখা একটি অতি উত্তম গ্রন্থ।

৩৬। সাব্রুরুল মাখযান ঃ

শায়েখ কবীরজ্জান জানান দেহলভী (রঃ)-এর নির্দেশে শাহ সাহেব ফার্সী ভাষায় এ জ্ঞানগর্ভ কিতাবটি রচনা করেন।

৩৭। শায়েখ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল বাকীর প্রশ্নাবলীর জবাব ঃ

৩৮। তাইয়েবুন নগমা ফী মদহে সাইয়্যেদিল আরবে ওয়াল আজম ঃ

এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসাপূর্ণ একটি আরবী কাব্যগ্রন্থ।

৩৯। মজমুয়ায়ে আশআর ঃ

শাহ সাহেবের লিখিত বিভিন্ন কবিতার সংকলন গ্রন্থ ঃ

৪০। ফাতহুল ওয়াদুদ ওয়া মারিফাতিল জুনুদ ঃ

এ সংক্ষিপ্ত আরবী রিসালায় শাহ সাহেব সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

৪১। আওয়ারিফ ঃ

আরবী ভাষায় লেখা এ পুস্তিকাটিতে তাসাওফ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৪২। শরহে রুবাইয়্যাতাইন ঃ

খাজা বাকী বিল্লাহ (রঃ)-এর দুটি রুবাইয়্যাতের ব্যাখ্যা।

৪৩। আনফালুল আরেফীন ঃ

এটি শাহ সাহেবের রচিত একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এতে তিনি তাঁর দাদা ও বংশের অন্যান্য বুযুর্গদের জীবনালেখ্য ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সন্নিবেশিত করেছেন। তাঁদের জাহেরী ও বাতেনী ইলম ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর এতে সবিস্তার আলোচনা রয়েছে।

ইন্তেকাল ঃ শাহ সাহেব (রঃ) ১১১৪ হিজরীর ৪ঠা শাওয়াল সূর্যোদয়ের মুহূর্তে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৬৩ বছর বয়সে ১১৭৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। মাত্র অল্প ক'দিন তিনি হাল্কা রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তারপর তিনি দুনিয়া ছেড়ে রাব্বুল আলামীনের দরবারে চলে যান। ইন্নালিল্লাহি---রাজিউন। পুরাতন দিল্লীর শাহজাহানাবাদের দক্ষিণ ভাগে

তাঁকে দাফন করা হয়। সে কবরস্তানকে মুহাদ্দেসীনের কবরস্তান বলা হয়।

সন্তান-সন্ততি ঃ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (রঃ)-এর পাঁচটি ছেলে জন্ম নিয়েছিল। এক ছেলে যৌবনে পদার্পণ করেই মারা যান। তাই তার সম্পর্কে তাঁর জীবনী গ্রন্থে তেমন কিছু লেখা হয়নি। অবশিষ্ট চার ছেলে যথাযোগ্য শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে তাঁর বংশকে সমুজ্জ্বল করেছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান শাহ আবদুল আযীয (রঃ) ১১৫৯ হিজরীতে জন্ম নেন এবং তাঁর সতের বছর বয়সে শাহ সাহেব ইন্তেকাল করেন। তাঁর শৈশবের লেখাপড়া পিতার কাছেই সম্পন্ন হয়।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি কোরআন পড়া শুরু করেন এবং তের বছর বয়সে তিনি নহু, ছরফ, ফিকাহ্, মান্তেক, ইলমুল কালাম, আকায়েদ ইত্যাদি বিষয়ের কিতাবসমূহ আয়ত্ত করেন। অতঃপর পনের বছর বয়সে রহীমিয়া মাদ্রাসায় তাঁর পিতার মসনদে বসে শিক্ষা দানে ব্রতী হন। তাঁর গোটা জীবন শিক্ষা দানে ও কিতাব রচনায় ব্যয়িত হয়। তাঁর যুগে রাফেজী ও অন্যান্য বাতিল পন্থীদের প্রভাব অত্যধিক বেড়ে গিয়েছিল। তাই তিনি তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোরালো কিতাব লিখেন। তাঁর রচিত তফসীরে আযীয ও তোহফায়ে ইসনা আশারিয়ায় তিনি রাফেজীদের বাতিল ধ্যান-ধারণার মূলোৎপাটন ঘটিয়েছেন। তাছাড়া মুহাদ্দেসদের অবস্থা ও হাদীস সংকলনসমূহের ওপর তিনি বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন নামে এক তথ্য বহুল গ্রন্থ রচনা করেন। পরন্তু তিনি শরহে মিযানুল মান্তেক ও আযীযুল ইকতেবাস ফী ফাযায়েলে আখবারিন্নাস নামে আকায়েদের এক মূল্যবান ভাষ্য রচনা করেন। তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের নাম শাহ রফিউদ্দীন। তিনিও তাঁর পিতার কাছে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন। শাহ রফিউদ্দিন কোরআন মজীদের সহজ উর্দু অনুবাদ করেন। সেটি অত্যন্ত কল্যাণপ্রদ ও জনপ্রিয় হয়েছে।

শাহ সাহেবের তৃতীয় ছেলের নাম শাহ আবদুল কাদের। তিনি তফসীর শাস্ত্রে পরম ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত সরল ও একান্ত নিঃসঙ্গ জীবন যাপন পছন্দ করতেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি আকবরাবাদ জামে মসজিদের এক হুজরায় কাটিয়ে গেছেন। তিনি কোরআনের এরূপ উত্তম অনুবাদ করে গেছেন যা বড় বড় তফসীরের কাজ দেয়। এ অনুবাদ

ছিল ইলহামী অনুবাদ। উপমহাদেশের উলামায়ে কেরাম এক বাক্যে সেটাকে সর্বোত্তম অনুবাদ বলে গ্রহণ করেছেন।

তাঁর চতুর্থ ছেলের নাম শাহ আবদুল গনী। তিনি ইলমে তাসাওফে যথেষ্ট পারদর্শীতা অর্জন করেন। তিনিও তার পিতার কাছে হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। খোদা নির্ভরতা ও স্বল্পে তুষ্টির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁরই পুত্র হলেন বালাকোটের শহীদ শাহ ইসমাঈল (রঃ)। তিনি পাঞ্জাব ও সীমান্তে কিছু এলাকা দখল করে ইসলামী হুকুমত কায়েম করেছিলেন। তাঁর "তাকবিয়াতুল ঈমান" ও "আল আবাকাত" কিতাবদ্বয় দেশ-বিদেশে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

সাজরা
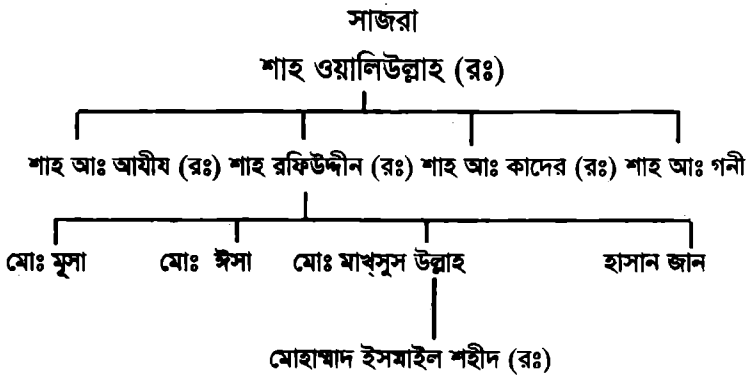
গ্রন্থের উদ্দেশ্য

বর্ণনামূলক ও জ্ঞানগত বিদ্যার ওপর সেকালে ও একালে বহু বই লেখা হয়েছে। প্রত্যেক মনীষীই জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন। ইসলামের প্রথম যমানায় যুক্তি-বুদ্ধি চর্চার তেমন প্রাধান্য ছিল না। সে যুগে বর্ণনামূলক বিদ্যারই সর্বাধিক চর্চা চলছিল এবং এটাকেই তখন যথেষ্ট মনে করা হত। মুসলিম জাহান তখন রাসূলে করীম (সঃ)-এর কাছাকাছি যমানায় লালিত হচ্ছিল। তাই রাসূল (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের ফয়েজ ও বরকতের প্রভাবে হাজারো দর্শনের দার্শনিক মার প্যাঁচ তাদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়নি। তবে যতই ইসলামী দুনিয়ার প্রসারতা বেড়ে চলল আর এমনকি ইরান, হিন্দুস্তান ও পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন এলাকায় যখন তা ছড়িয়ে পড়ল, তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের দুষ্ট প্রভাব মুসলমানদের সহজ সরল ঈমান ও আকায়েদের মজবুত ভিত্তিকে দুর্বল করে দিল। ফলে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানের হেফাজতের জন্যে এমন ব্যক্তিত্বের এ পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটালেন যাঁরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে তাদের স্তব্ধ করে দিলেন। তারা শুধু ইসলামের জন্যেই প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালেন না, পরন্তু দার্শনিকদের ভ্রান্ত চিন্তাধারার কল্পনার ফানুস ছিন্ন ভিন্ন করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন। ইসলামের ওপর বারংবার হামলা করেছে। কিন্তু তাদের ভাগ্যে লাঞ্ছনাকর পরাজয় ভিন্ন আর কিছুই জোটেনি। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) ও তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার আবির্ভাব ও সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ পাকের সেই মর্জিই সক্রিয় ছিল।

শাহ সাহেব (রঃ) এ গ্রন্থটিতে শরীয়তের রহস্যাবলী তুলে ধরেছেন। পূর্বসূরীদের কেউই এ বিষয়ের ওপর কলম ধরেননি। শাহ সাহেব (রঃ) শরীয়তের মূলনীতি দাঁড় করেছেন, তার শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করেছেন। যদিও গ্রন্থখানি শরীয়তের রহস্যাবলীর ওপর তিনি লিখেছেন, তথাপি তিনি তাতে হাদীস, ফিকাহ, আখলাক, তাসাওফ ও দর্শনের সমারোহ ঘটিয়েছেন। উম্মতের ভেতর তিনিই প্রথম বর্ণনামূলক ও জ্ঞানগত বিদ্যার বিশেষজ্ঞ, যিনি শরীয়তের রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে শুধু জ্ঞানানুসন্ধানের পথ বেছে নিয়েছেন। তিনি কিতাব ও সুন্নাতের প্রতিটি নির্দেশের এরূপ

অনড় কারণ খুঁজে বের করেছেন যা কোন যুগেই কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। গ্রন্থটি পাঠ করতে গিয়ে মনে হয় জ্ঞান ও যুক্তি শাস্ত্রের সকল স্তর আয়ত্তকারী এক বিশাল ব্যক্তিত্ব কথা বলেছেন। কখনও মনে হয়, মালায়ে আলার ইলহাম পেয়ে অধ্যাত্মিকতার বর্ণনা দিচ্ছেন। কখনও দেখা যায় যে, এক মুজতাহিদ এমন ভাবে মসআলা পেশ করছেন যাতে চার মজহাবের সমন্বয় ঘটে যাচ্ছে। এমনকি কিতাব ও সুন্নাতের বক্তব্যের সাথে তা হুবহু মিলে যাচ্ছে।

আল্লামা আবু তাইয়্যেব (রঃ) "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ" সম্পর্কে বলেনঃ

"যদিও গ্রন্থটি ইলমে হাদীস নয়, তথাপি তাতে হাদীসের প্রচুর ব্যাখ্যা মিলে। এমনকি তাতে বিভিন্ন হাদীসের তত্ত্ব ও রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সে যাক, পূর্ববর্তী বার শতকে আরব-আজমের কোন আলেম এরূপ মহামূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে যাননি। গ্রন্থটি এ বিষয়ে অনন্য। মোটকথা, গ্রন্থকারের এটা শুধু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থই নয়, সর্বকালের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।"

শাহ সাহেব (রঃ) তার গ্রন্থটিকে দু'খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। পয়লা খণ্ডটি সাত অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রতিটি অধ্যায় কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছেন।

প্রথম খন্ড

পয়লা খণ্ডে শাহ সাহেব (রঃ) শরীয়তের সেসব রহস্য ও নীতিমালা তুলে ধরেছেন, যদ্দারা শরীয়তের বিধি-নিষেধসমূহ সহজেই বের ও উপলব্ধি করা যায়। অতঃপর তিনি পয়লা অধ্যায়ে মানুষকে কেন জবাবদিহি করা হবে আর কেন তাদের পুরস্কার বা শাস্তি দান করা হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়ে তেরটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। পয়লা পরিচ্ছেদে সৃষ্টির উন্মেষ ও তার ব্যবস্থাপনা নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। যেহেতু সৃষ্টিতত্ত্বই সব কিছুর আদি প্রশ্ন, তাই তিনি সর্বাগ্রে সেটারই সমাধান দিয়েছেন। আর স্বভাবতঃই সামগ্রিক জ্ঞানের জন্যে রচিত গ্রন্থে এটাই সর্বাগ্রে ঠাঁই পাবে।

আমরা যদি সর্বাগ্রে অবতীর্ণ আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি, তাহলেও দেখতে পাই, সেখানেও সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে শুরু করা হয়েছে। যেমন ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ * خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ *

সূরা আলাক্ব ঃ আয়াত ১-২

অর্থাৎ, "সেই প্রভুর নামে পড়, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। সৃষ্টি করেছেন এক বিন্দু রক্তপিন্ড থেকে।"

শাহ সাহেব (রঃ)ও আল্লাহ পাকের এ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। অতঃপর তিনি আলমে মেসাল (নমুনা জগত) মালা-এ-আ'লা (উচ্চতর পরিষদ), হাকীকাতে রূহ (আত্মাতত্ত্ব)ও জবাবদিহি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, সবাইকে কর্মফল ভোগ করতে হবে। ভাল কর্মের জন্যে ভাল ফল ও মন্দ কর্মের মন্দ ফল পাবে। তিনি এটাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তা চার কারণে হবে। এক, যে প্রকারের কাজ সেই প্রকারের ফল হওয়াই স্বাভাবিক।

দুই, মালা-এ-আ'লার সিদ্ধান্ত এটাই।

তিন, শরীয়তের চাহিদাও তাই।

চার, হুযুর (সঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর এবং তাঁর দোয়া ও আল্লাহ পাকের সাহায্যের আশ্বাস স্বভাবতঃই সেটাকে অপরিহার্য করেছে।

অতঃপর তিনি বলেন, কর্মফলের পয়লা দুটি দিক হল স্বাভাবিক। তার পরিবর্তন অসম্ভব। তৃতীয়টি কালের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। চতুর্থটি নবী প্রেরণের পরে দেখা দেয়। অবশেষে তিনি কার্যকারণের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে পয়লা অধ্যায় শেষ করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি পার্থিব জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা অর্থাৎ,মানুষের সর্বাংগীন জীবন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ নিয়ে আমরা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারি অতি চমৎকার ভাবে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন কিভাবে সুখময় ও সুন্দর হতে পারে তা তিনি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। এ অধ্যায়টিকে তিনি এগারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। পয়লা পরিচ্ছেদে মানবিক প্রয়োজন ও মৌলিক অধিকারের নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর বিভিন্ন প্রয়োজন ও অধিকারের বাস্তবায়ন পদ্ধতি বলেছেন। ফলে নাগরিক জীবন, পারস্পরিক লেন-দেন, রাষ্ট্রনীতি, সমরনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির বিভিন্ন দিক এভাবে বিন্যস্ত করেছেন যা দেখে অত্যাধুনিক কালের রাষ্ট্র বিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদরাও হতভম্ব হয়ে যায়।

শাহ সাহেব (রঃ) শাসকদের জীবন চরিত সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলেনঃ শাসককে অবশ্যই উত্তম চরিত্রের হতে হবে। তাকে এক দিকে বীরের মত শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে জন কল্যাণের প্রয়োজনে, অপর দিকে তাকে দয়ালুও হতে হবে। তাকে বিজ্ঞ হতে হবে যাতে ইসলামী বিধি-নিষেধগুলোর তিনি যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটাতে পারেন। তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক, বুদ্ধিমান এক স্বাধীন পুরুষ হতে হবে। তা না হলে তার প্রভাব জনগণের ওপর পড়বে না। তাকে পূর্ণাংগ দেহের এক সুস্থ ব্যক্তি হতে হবে। তা না হলে জনগণ তাকে যথাযথ সম্মান দিতে পারবে না। তাকে দাতা ও সামাজিক হতে হবে, তা হলে জনগণ তাকে ভালবাসবে। তাকে জন কল্যাণের কাজে নিয়োজিত হতে হবে, তা হলে জনগণ তাকে তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ভাববে। তাকে চতুর শিকারীর দূরদর্শীতা নিয়ে জনগণের সাথে ব্যবহার বজায় রাখতে হবে এবং সময়সুযোগ মতে শিকারের কাজ করতে হবে। তার বড় কাজ হবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ব্যাপারে তাকে সার্বক্ষণিক সজাগ দৃষ্টির অধিকারী হতে হবে। এভাবে অল্প কথায় তিনি জনপ্রিয় শাসকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। শেষ পরিচ্ছেদে তিনি জনগণের ভেতরে প্রচলিত বিভিন্ন রীতি-নীতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন। চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি সৌভাগ্য নিয়ে আলোচনা করেন। সৌভাগ্য কাকে বলে এবং সৌভাগ্য সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা নিয়ে মানুষের ভেতরে কি কি মতভেদ রয়েছে এবং সৌভাগ্য অর্জনের উপায় নিয়ে তিনি এ অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। সৌভাগ্যের অধ্যায়টিকে তিনি সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি পুণ্য ও পাপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এটাকে তিনি সতেরটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। এ অধ্যায়ে বেশীর ভাগ তিনি তাওহীদ, শির্ক ও ঈমানের ওপর আলোচনা করেছেন। তাছাড়া নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং তার সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান নিয়েও আলোচনা করেছেন। বিশেষতঃ, এগুলোর রহস্য ও তত্ত্ববিশ্লেষণ করেন। পরিশেষে পাপের স্তরভেদ, পাপের ক্ষতি- সমূহ, বিশেষতঃ পাপ কি করে কোন ব্যক্তি বা সমাজকে ধ্বংস করে তা তিনি সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেন। তেমনি তুলে ধরেছেন পুণ্য কি ব্যক্তি ও সমাজকে ইহলোক ও পরলোকের শান্তি ও সুখের পথ খুলে দেয়;

ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি জাতীয় রাজনীতির ওপর আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়টিকে তিনি একুশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। দ্বীন ও মিল্লাতের বিভিন্ন ব্যাপারে জাতির পথপ্রদর্শক সম্প্রদায়, অতীতের ধর্মসমূহ, ইসলাম ও জাহেলী যুগের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করেন। তাছাড়া এতে শরয়ী ও রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থার বিভিন্ন রহস্য ও তত্ত্বকথা তিনি তুলে ধরেছেন।

সপ্তম বা শেষ অধ্যায়টিকে তিনি এগারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। তাতে নবুয়তী জ্ঞানসমূহ, হাদীস সংকলনাদি, সাহাবা, তাবেঈন ও ফকীহদের মতভেদ ও মতামতের ওপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। শেষভাগে তিনি তাহারাত ও সালাত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এভাবেই পয়লা খন্ড সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় খন্ড

শাহ সাহেব (রঃ) তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার দ্বিতীয় খন্ডে ইবাদত, সামাজিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। সর্বাগ্রে তিনি নামায, রোযা ও হজ্জের পরিচ্ছেদ কায়েম করেছেন। এ খন্ডকে তিনি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করেননি, বরং প্রত্যেকটি আলোচনা স্বতন্ত্র শিরোনাম দিয়েছেন। কায়িক আত্মিক ইবাদত সম্পর্কে আলোচনার পর ব্যবসা-বাণিজ্য, রুজীরুটি উপার্জনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। কারণ, ইবাদত কবুলের ভিত্তিই হল হালাল রুজী। এ কারণেই ব্যবসায়ের রীতিনীতি ও অর্থোপার্জনের উপায়-উপকরণকে ইসলামী পদ্ধতিতে পরিচালনাই ইবাদত কবুলের চাবিকাঠি। এরপর পারিবারিক ব্যবস্থার পরিচ্ছেদ দাঁড় করিয়েছেন। বিয়ে, তালাক, স্ত্রীর অধিকার, সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির ওপর সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। অতঃপর দেশ ও জাতি সম্পর্কিত ব্যাপারগুলো আলোচনা করেছেন। খেলাফত, বিচার পদ্ধতি, দন্ডবিধি, সমরনীতি ও অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন। তাঁর এ আলোচনা এতই পান্ডিত্যপূর্ণ যে, এ কালের পন্ডিতরাও দেখে অবাক হয়ে যায়।

অবশেষে শাহ সাহেব জনসাধারণের সাধারণ জীবন যাপনের বিভিন্ন রীতিনীতি আলোচনা করেছেন। আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাকার ব্যাপারে তিনি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অবশেষে সাহাবায়ে কেরামের চারিত্রিক গুণাবলী তুলে ধরে তিনি তাঁর এ অমূল্য গ্রন্থটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ প্রাক-প্রারম্ভিকা ॥

সব ধরনের প্রশংসাস্তুতি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তিনিই ইসলাম ও হেদায়েতকে মানুষের প্রকৃতিগত করে দিয়েছেন। তাদের জন্য তিনি সত্য ধর্ম সহজ, সুস্পষ্ট ও সুলভ করে রেখেছেন। অথচ মানুষ নিজ থেকে মূর্খতা ও পাপাচারের আশ্রয় নিল। তথাপি তিনি অত্যন্ত দয়া দেখালেন। মানুষকে আঁধার থেকে আলোয় ও সংকীর্ণতা থেকে প্রসারতায় নিয়ে আসার জন্য নবীদের পাঠালেন। নবীদের আনুগত্যকেই তিনি তাঁর আনুগত্য বলে স্থির করলেন। এটা কত বড় গৌরব ও মর্যাদার কথা।

তারপর তিনি নবীদের কোন কোন উম্মতকে জ্ঞানবান হতে ও তাঁর বিধি- বিধানের রহস্য জানতে শক্তি জোগালেন। এমনকি তাঁদের এক একজন এভাবে হাজার দরবেশের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেন। ফেরেশতার জগতেও তাঁদের বিরাট মর্যাদার পর্যালোচনা চলল। আল্লাহ্র সৃষ্টি জগতের সব কিছুই এমনকি নদীর মাছ পর্যন্ত তাঁদের জন্য দোয়া করতে লাগল। আল্লাহ্ পাক নবীদের ও তাঁদের অনুসারীদের ওপর অহরহ অনুগ্রহ বর্ষণ করে চলুন। বিশেষত খোলাখুলি মুজিযা নিয়ে আবির্ভূত আমাদের মহানবীকে (সঃ) তিনি তাঁর অনুগ্রহ ও জ্যোতির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন করুন। মহানবীর (সঃ) বংশধর ও সহচরদের নিজ দয়ায় ধন্য করুন এবং উত্তম পারিতোষিক দিন।

অতএব আল্লাহ পাকের অনুগ্রহপ্রার্থী ফকীর আহমদ ওয়ালিউল্লাহ ইবনে আবদুর রহীমের বক্তব্য হল এই, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও কার্য-কলাপ সম্পর্কিত সব বিদ্যা ও তার বিষয়গুলোর ভেতরে সর্বোত্তম ও শীর্ষস্থানীয় হল হাদীস শাস্ত্র। তাতে রয়েছে নবীকুল শিরোমণি মহানবীর (সঃ) কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণী। তাই তা হল আঁধারের দীপশিখা ও পথের দিশারী। এ যেন দুনিয়াজোড়া দ্যুতিবিচ্ছুরক পূর্ণিমার চাঁদ। যে ব্যক্তি তা স্মৃতিস্থ করে কার্যকর করল, পথ পেয়ে অভীষ্ট অর্জন করল। যে ব্যক্তি উপেক্ষা করল, জীবন বরবাদ করল। কারণ, মহানবী (সঃ) বিধি-নিষেধ ও

তার ভাল-মন্দ সম্পর্কিত সবকিছুই বর্ণনা করেছেন। বক্তৃতা, উপদেশ, উপমা, উদাহরণ সবকিছু দিয়েই তিনি বুঝিয়ে গেছেন। সে সব হাদীসের কলেবর কুরআনের সমান কিংবা তারও বেশি।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, এ শাস্ত্রের বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং তার অনুসারীদেরও স্তরভেদ রয়েছে। এ বিদ্যার যেমন মগজ ও খুলি রয়েছে, তেমনি রয়েছে ভেতর ও বাইর। এর অধিকাংশ বিষয় আলেমগণ নিজ নিজ গ্রন্থে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিধৃত করেছেন। সে সব থেকে বড় বড় জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়ের সমাধান ও তাৎপর্য সহজলভ্য রয়েছে।

হাদীস শাস্ত্রে কয়েকটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তার বাহ্যিক বিষয়গুলোর একটিতে রয়েছে সহী, জঈফ, মুস্তাফীজ, গরীব ইত্যাকার হাদীসের শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কিত আলোচনা। প্রাথমিক যুগের হাদীসবেত্তা ও হাদীসের হাফেজরা বিষয়টির ওপর অনেক কিছু লিখে গেছেন। দ্বিতীয় বিষয়টিতে রয়েছে কঠিন ও দুর্লভ হাদীসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা। এ বিষয়ের ওপর আরবী বিষয়টিতে পাই হাদীসের বাক্য থেকে শরীয়তের বিধান উদ্ভাবন, তার তাৎপর্য অনুধাবন ও শাখা-প্রশাখা নিরূপণ সম্পর্কিত আলোচনা। এ বিষয়টিতে হাদীসের পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মনসুখ, মুহকাম, মরজুহ ও মুবরাম হাদীসের পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণ আলেমদের কাছে বিষয়টি হাদীস শাস্ত্রের সারবস্তু ও সব বিষয়ের সেরা বিষয় বলে বিবেচিত। মুহাক্কিক ফিকাহবিদগণ বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছেন। এতো গেল একদিক।

আমার কাছে হাদীস শাস্ত্রের বিষয়গুলোর ভেতর শীর্ষস্থানীয় ও সূক্ষ্মতম, এমনকি সেগুলোর মূল ভিত্তি হল দ্বীনের রহস্যজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়টি। তাতে শরীয়তের বিধি-নিষেধের দর্শন, বিধানের বৈশিষ্ট্য ও যৌক্তিকতা এবং তত্ত্ব ও রহস্য বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্র কসম, এটা এমন এক বিষয় যা নিয়ে আল্লাহ্র সহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ফরজ ইবাদত সেরে অবশিষ্ট সম্পূর্ণ সময়টুকু গবেষণায় নিয়োজিত রাখে এবং এটাকেই নিজ পারলৌকিক সম্বল বলে মনে করে। কারণ, এ বিষয়ের বদৌলতেই মানুষ শরীয়তের রহস্যাবলী সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হয় এবং শরীয়তের বিষয়বস্তুর সাথে তাঁর ঠিক কবিতার সাথে কবির, যুক্তি-প্রমাণের সাথে তর্ক শাস্ত্রবিদের, ব্যাকরণ

অলংকারের সাথে ভাষাবিদের, ফিকাহ্র শাখা- প্রশাখার সাথে অসূলবিদদের মতই গভীর ও নিবিড়তম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ বিদ্যার সহায়তাই মানুষ কুহকী আলেয়া ও মায়া মরীচিকার হাতছানি থেকে রেহাই পায়। এ বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি বিকারগ্রস্ত উটের মত বাঁকা চলন চলে না আর অন্ধ ঘোড়ায় চড়ে পথে-বিপথে ছুটে বেড়ায় না। কোন রোগীকে ডাক্তার সেব খেতে বলায় সে মাকালের সাথে তার সাদৃশ্য দেখে সেব ছেড়ে মাকাল খেলে যেরূপ মূর্খতা হয়, এ বিষয়ে অনভিজ্ঞরা তেমনি মূর্খ।

তেমনি এ বিদ্যার বদৌলতে আল্লাহ্র ফজলে ঈমানদার ব্যক্তির দিব্যদৃষ্টি লাভ ঘটে। তার অবস্থা দাঁড়ায় এই, কোন বিজ্ঞ ডাক্তার যেন তাকে মৃত্যুদায়ক বিষ খেতে নিষেধ করায় সে তা এ কারণে মেনে নিল যে, তার ভেতরে অতিমাত্রায় তেজ ও শুষ্কতা থাকায় স্বভাবতঃই মানুষের জন্য তা মৃত্যুদায়ক বলে নিজেই সে জানে। এখন মনে করুন, বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে তার আস্থা কত বেড়ে গেল।

মহানবীর (সঃ) হাদীস এ বিষয়ের মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করে দিয়েছে। তাবেঈন ও সাহাবাদের কথা ও কাজের ভেতর দিয়ে সংক্ষেপে ও সবিস্তারে প্রকাশ পেয়েছে। মুজতাহিদরা শরীয়তের প্রতিটি অধ্যায়ে তন্নিহিত কল্যাণকর রহস্যগুলো বর্ণনা করে আসছেন। তারপর তাঁদের অনুসারী মুহাক্কিকরা তার বিভিন্ন গূঢ়তত্ত্ব ও সুন্দর সুন্দর রহস্যের বিবরণী দিয়েছেন। এ কারণেই এ বিষয়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা ইজমায়ে উম্মতের বিরোধী এবং এটা আদৌ কোন নতুন বিষয় নয়।

তথাপি এ বিষয়ের উপর খুব কম লোকই গ্রন্থ রচনা করে গেছেন কিংবা এর মূলনীতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। তাই এর কোন নীতি পদ্ধতি বা মূলনীতি কেউ রচনা করেননি কিংবা এমন কোন কিছু রেখে যাননি যা থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জিত হতে পারে এবং জ্ঞান পিপাসুদের পিপাসা মিটতে পারে। মশহুর প্রবাদ রয়েছে, 'তুমি যখন বাঘের পিঠে সোয়ার হবে, কে তোমার সঙ্গী হবে?'

তা হবেই বা না কেন? যে বিদ্যার পিঠে সোয়ার হতে গেলে শরীয়ত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সামগ্রিক জ্ঞান প্রয়োজন, বক্ষদেশ হতে হয় ইলমে লাদুন্নীতে (আল্লাহ্রদত্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান) পরিপূর্ণ, অন্তর হতে হয় আল্লাহ্রদত্ত

আলোকে ভরপুর আর তার সাথে স্বভাবে তেজস্বীতা ও মস্তিষ্কে প্রত্যুৎপন্নমতি তত্ত্ব থাকতে হয় এবং বক্তৃতা রচনায় সুদক্ষ ও বাক্যের ব্যাখ্যা বিন্যাসে অতুলনীয় হতে হয়, সে বিদ্যায় সঙ্গী আসবে কোথেকে? তাকে তো এ বিদ্যার নতুন করে রীতি-নীতি ও মৌলভিত্তি রচনা করতে এবং তা থেকে শাখা-প্রশাখা উদ্ভাবনের বর্ণনামূলক ও বুদ্ধিগত দলীল-প্রমাণ বিন্যস্ত করতে হবে।

আমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ অশেষ। তিনি সে বিদ্যার কিছুটা দ্যুতি আমাকে দান করেছেন। অথচ নিজকে আমি অত্যন্ত নগণ্য ও ত্রুটিপূর্ণ বলে স্বীকার করি এবং নিজকে কখনও নির্ভুল ও নিষ্কলুষ ভাবিনা। কারণ, প্রবৃত্তি সতত খারাপ কথার দিকেই উস্কানী দিচ্ছে। 'আমি একদিন আসরের নামাযের পর মুরাকাবায় বসলাম। হঠাৎ মহানবীর (সঃ) পবিত্র আত্মা দেখা দিল ও আমার উপর কাপড়ের মত একটা কিছু ঢেকে দেয়া হল। সংগে সংগে আমার ধারণা জন্মিল, আল্লাহর দ্বীনকে বিশেষ এক পদ্ধতিতে তুলে ধরার জন্য আমাকে ইংগিত দেয়া হল। তখন থেকেই আমার অন্তরে ক্রমবর্ধমান এক জ্যোতির বিকাশ অনুভব করলাম।'

কিছুদিন পর ইলহাম (ঐশী ইংগিত) পেলাম এ বিরাট কাজে উদ্যোগী হবার জন্য। আমার ভাগ্যে বিশেষ একটি দিনও নির্ধারিত হয়ে এল। তখন এরূপ মনে হল, গোটা দুনিয়া আমার প্রভুর জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে গেল। এ যেন অস্তমান সূর্যের রক্তিম ছটায় পৃথিবী উদ্ভাসিত। তাই সময় এসে গেল মহানবীর (সঃ) প্রচারিত দ্বীনকে যুক্তি-প্রমাণের নবীন সাজে সজ্জিত করে ময়দানে হাজির করার।

তারপর আমি স্বপ্নে ইমাম হাসান-হুসায়েন (রাঃ)-কে মক্কায় এভাবে দেখতে পেলাম যে, তাঁরা আমাকে একটি কলম দিয়ে বললেন, এ কলমটি আমাদের নানা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সঃ)। বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিলাম, বিষয়টির ওপর এমন একখানা গ্রন্থ লিখব যার কল্যাণ সাধারণ-অসাধারণ ও উপস্থিত- অনুপস্থিত সবাই সমানভাবে পেতে পারে। মজলিসের সবাই যেন তা থেকে উপকৃত হয়। কিন্তু আমি একটা কথা ভেবে খুবই দ্বিধান্বিত ছিলাম যে, আশে- পাশে এমন কোন আলেম নেই

যার সাথে এ ব্যাপারে জটিলতা দেখা দিলে পরামর্শ করতে পারি। আমার নিজের বিদ্যা-বুদ্ধিও তথৈবচ। যুগের মানুষের মূর্খতা ও সংকীর্ণতা এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ ত্রুটিপূর্ণ মত নিয়ে লক্ষঝক্ষ আমাকে আরও দুর্বল করেছে। তাছাড়া সমসাময়িকদের ভেতর বিরূপতার শিকড় থেকেই যায়। তেমনি পুস্তক প্রণেতা স্বভাবতঃই সমালোচনার শিকার হয়।

এরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভেতর যখন কাটাচ্ছিলাম, তখন আমার বন্ধু প্রতিম ভাই মিয়া মুহাম্মদ সালমা ওরফে আশেক* এ বিষয়ের মর্যাদা বুঝতে পেলেন। তিনি এও উপলব্ধি করলেন, এ বিদ্যা ব্যতীত পূর্ণ সৌভাগ্য লাভ সম্ভব নয়। তিনি আরও জানলেন, সন্দেহ সংশয় নিয়ে আত্মোৎসর্গী সাধনা ও মতভেদ সমালোচনার ঘাত-প্রতিঘাত ছাড়া এ বিদ্যা অর্জিত হতে পারে না। তিনি বুঝতে পারলেন, এ বিদ্যার যিনি দ্বার উদঘাটন করলেন এবং যার সামনে এর সব জটিলতা পানি হয়ে গেল, তাঁর সহায়তা ছাড়া এ নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনাও চলেনা। তাই তিনি সেই লোকের সন্ধানে সম্ভাব্য সব শহরেই ঘুরে বেড়ালেন এবং যার থেকেই কিছু পেতে পারেন বলে ভাবলেন, তাদের সবার সাথেই আলাপ করলেন। ভাল-মন্দ সবাইকে তিনি এভাবে পরীক্ষা করে চললেন। কিন্তু কারো থেকে কিছু পেলেন না এবং কাউকে এমন পেলেন না যাঁর সাথে এ ব্যাপারে কিছুটা ফলপ্রসূ জ্ঞান বিনিময় হতে পারে।

অবশেষে তিনি আমার কাছে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি তখন থেকে আমার পেছনে লেগে রইলেন এবং যখনই আমি কিছু আলোচনা করতাম, বারংবার আমাকে 'লাগামের হাদীস' শোনাতেন। (হাদীসটির মর্ম এই, কারো কাছে কেউ কোন জ্ঞানের বিষয় জানতে চাইলে তা যদি সে গোপন করে তাহলে কেয়ামতের পর তার গলায় আগুনের লাগাম জুড়ে দেয়া হবে।) এমন কি তিনি আমার কোন ওজর-আপত্তিও শুনতেন না। আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে এ ব্যাপারে কিছু করতে বাধ্য করলেন। তখন আমি বুঝলাম, ইলহামে যে নির্ধারিত দিনটির কথা বলা হয়েছিল তা অত্যাসন্ন।

*শাহ মুহাম্মদ আশেক হলেন শাহ ওয়ালিউল্লার (রঃ) একান্ত শিষ্য ও মামাত ভাই। শরীয়তের রহস্য উদঘাটনের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত উন্মুখ ছিলেন।

যেহেতু এ কাজ আমার পূর্ব নির্ধারিত এবং প্রতিটি অধ্যায়ে আল্লাহ্র মদদ কামনার জন্য আমি আদিষ্ট, তাই তাঁর দিকে মনোনিবেশ করলাম। ইস্তেখারা করে আল্লাহ্র সহায়তা প্রার্থনা করলাম। নিজ শক্তি ও যোগ্যতার কোন দখল দিলাম না। গোসলদাতার হাতের লাশের মতই আল্লাহ্র হাতে আমি নিজকে সমর্পণ করলাম। তারপর তিনি আমার কাছ থেকে যা পেতে চাইলেন তা শুরু করলাম। সবিনয়ে আল্লাহ্র কাছে এ কামনা করলাম, বাজে কথা থেকে যেন তিনি আমাকে ফিরিয়ে রাখেন এবং প্রত্যেক বস্তুর সঠিক রহস্য সম্পর্কে তিনি যেন আমাকে অবহিত করেন। অন্তর যেন নিষ্ঠাপূর্ণ, ভাষা অলংকারপূর্ণ ও বাক্য সততাপূর্ণ করেন। আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য যেন সহায়তা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দার অতি কাছে থাকেন এবং ডাকের সংগে সংগে সাড়া দেন।

তথাপি আমি সেই ভাইটিকে শুরুতেই বলেছিলাম, আলোচনার মজলিসের আমি হলাম বোবা ব্যক্তি এবং দ্রুতগামী ঘোড়ার রেসে আমি খোঁড়া ঘোড়া। বিদ্যার পুঁজি আমার হারিয়ে গেছে। দানের হাড্ডিই আমার সম্বল। অন্তর আমার দুর্ভাবনায় আচ্ছন্ন ও ব্যতিব্যস্ত। তাই কিতাবের পৃষ্ঠায় চোখ বুলানো ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার শক্তি আমার এখন নেই। কারো কথা মনে রাখার এবং যথাস্থানে উদ্ধৃতি দেয়ার মত স্মৃতি শক্তিও আমার এখন বেঁচে নেই। আমি যতটুকু করছি, নিজেই করছি। নিজের ধূলামাটি নিজেই একত্র করছি। আমি আমার জন্য নির্ধারিত সময়ের অনুবর্তী দাস। আমার অদৃষ্টের আমি শিষ্য। আমাকে যা বুঝানো হচ্ছে তাই বলছি, অন্তরে যা ঠাঁই পাচ্ছে সেটাই ভাল ভাবছি। তাই এতটুকু যে যথেষ্ট মনে করে, তার জন্য এটুকু হাজির রয়েছে। কিন্তু যারা আরও কিছু চায়, তারা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে।

আল্লাহ্ পাকের শরীয়তের বিধি-নিষেধ বান্দার জন্য তাঁর অনুগ্রহ ও পথ নির্দেশনা বৈ নয়। কুরআনের "ফালিল্লাহিল হুজ্জাতুল বালিগাহ্" (পূর্ণ দলীল প্রমাণ আল্লাহর সপক্ষে রয়েছে) আয়াতটি তো এ ইংগিতই দিচ্ছে। এ গ্রন্থখানি যখন সেই ইংগিতের তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে চায় এবং শরীয়তের সেই দিগন্তের সমুজ্জ্বল চন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে, তাই এর নাম 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্' রাখা যায়। আল্লাহ্র আশ্রয়ই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি উত্তম কারিগর। সেই মহান সর্বোন্নত সত্তার সহায়তা ছাড়া কোন শক্তিই শক্তি নয়, কোন দক্ষতাও দক্ষতা নয়।

॥ প্রারম্ভিকা ॥

অনেকের ধারণা, শরীয়তের বিধি-নিষেধ কোন যুক্তি কল্যাণের ধার ধারে না। তেমনি এর কর্ম ও কর্মফলের ভেতর সাজুয্য খোঁজা নিরর্থক। যেমন কোন প্রভু তার ভৃত্যের আনুগত্য পরীক্ষার জন্য কোন পাথর তুলতে কিংবা কোন গাছ ছুঁতে বলেন এবং ভৃত্য তা করলে প্রভু পুরস্কার দেন, না করলে তিরস্কার করেন, এও তেমনি ব্যাপার।

অথচ এ ধারণা ভুল। রাসূলের (সঃ) সুন্নাত ও সাহাবাদের (রাঃ) ঐকমত্য এর বিপরীত কথা বলে। এ কথা কে না জানে, নিয়তগুণে কাজের বরকত আর প্রকৃতি অনুসারে কাজের কদর হয়। রাসূল (সঃ) বলেন, কাজের মূল্যায়ণ উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ পাকও বলেন, কুরবানীর রক্ত-মাংস পাইনা আমি, আমি পাই খোদাভক্তি।

তেমনি আল্লাহ্কে স্মরণে রাখা ও তাঁরই কাছে দাবী আব্দার তোলার জন্য নামাযের প্রবর্তনা। আল্লাহ্ বলেন, আমাকে স্মরণে রাখার জন্য নামায আদায় কর। নামাযের অপর উদ্দেশ্য হল, পরকালে আল্লাহ্র দীদারের মাধ্যমে তাঁর সৌন্দর্য অবলোকনের সামর্থ্য অর্জন। রাসূল (সঃ) বলেন, অচিরে তোমরা ঠিক চাঁদ দেখার মতই তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে। তাঁর দর্শন লাভের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয় পোষণ করো না। তাই ফজর ও আসরে যেন (শয়তানের কাছে) পরাভূত না হও।

যাকাতের উদ্দেশ্য হল অন্তর থেকে কার্পণ্য ও সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করা। যেমন আল্লাহ পাক যাকাত বিরোধীদের সম্পর্কে বলেন, "যাদের আল্লাহ্ কিছু দিয়েছেন তারা যেন কার্পণ্যকে নিজেদের কল্যাণকর না ভাবে; বরং তাদের জন্য তা পরম অকল্যাণকর। পরকালে কার্পণ্য সঞ্চিত ধন আগুনের বেড়ী হয়ে কৃপণদের গলা জড়িয়ে থাকবে।" রাসূলে পাক (সঃ) মা'আজ বিন গানামকে (রাঃ) বলেছিলেন, 'ইয়েমেনবাসীকে বলে দিও, আল্লাহ্ তোমাদের ধনীদের সম্পদ দিয়ে দরিদ্রের অভাব দূর করার জন্য যাকাত ফরজ করেছেন।'

রোযা ফরজ হয়েছে প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণের জন্য। যেমন রাসূল (সঃ) বলেন, কামনার ক্ষেত্রে রোযা রাখা খোঁজা হওয়ারই নামান্তর।

আল্লাহ্র স্মৃতি জড়িত স্থানগুলোকে মর্যাদা দেয়ার জন্য হজ্ব ফরজ করা হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ্ বলেন, 'নিশ্চয় মক্কার ঘরটি দুনিয়ার মানুষের (ইবাদতের) জন্য নির্ধারিত প্রথম ঘর। ঘরটি তাই বরকতপূর্ণ ও পথের দিশারী। তাতে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "সাফা-মারওয়া পাহাড় দুটো আল্লাহ্র নিদর্শন বৈ নয়।"

এভাবে হত্যা বন্ধ করার জন্য প্রাণদণ্ডের বিধান প্রদান করা হয়েছে। তাই আল্লাহ্ বলেন, ' হে জ্ঞানীবৃন্দ! এ প্রাণদণ্ডের ভেতর তোমাদের জীবনের নিরাপত্তা রয়েছে।' তেমনি পাপাচার বন্ধের জন্য দণ্ডবিধি জারী করা হয়েছে। তাই আল্লাহ্ বলেন, 'এর মাধ্যমে যেন (চোর) দুষ্কর্মের পরিণতি ভোগ করে ও পথ পায়।'

আল্লাহ্র বাণীকে বিজয়ী করার ও পাপীদের পাপাচারের মূলোৎপাটনের জন্য জিহাদ ফরজ হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, 'ততক্ষণ সংগ্রাম চালিয়ে যাও যতক্ষণ না পাপাচারের বিলুপ্তি ঘটে ও আল্লাহ্র দ্বীন সর্বত্র বিজয়ী হয়।'

লেনদেন ও বিয়ে-তালাক ইত্যাদির বিধান রাখা হয়েছে সামাজিক ইনসাফ ও সততা প্রতিষ্ঠার জন্য। এ ছাড়া আরও অনেক বিধি-বিধান সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী ও রাসূলের হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। যুগে যুগে ধর্মবেত্তাগণ তা বর্ণনা করে আসছেন। তবে এ সব যার কিছু জানা নেই, তার এ ব্যাপারে কিছু বলারও অধিকার নেই। কিংবা জানা কিছু থাকলেও তা যদি সমুদ্রে সূঁচ ডুবিয়ে পানি মাপার মত হয়, তার থেকেই বা কি আশা করা যায়? তার তো উচিত নিজ জ্ঞানের দৈন্যের জন্য অনুতপ্ত হওয়া ও কান্নাকাটি করা।

আমি আবার বলছি, স্বয়ং মহানবী (সঃ) বিভিন্ন ওয়াক্তের রহস্য বর্ণনা করেছেন। যেমন, যুহরের পয়লা চার রাকা'আত সম্পর্কে বলেন, "তখন আকাশের দুয়ার খোলা হয় এবং আমি চাই, তখন আমার কিছু পুণ্য কাজ সেখানে প্রবেশ করুক।" ইয়াওমে আশুরার রোযা সম্পর্কে তিনি বলেন, ' সেদিন মূসা (আঃ) ও তাঁর জাতি (বনী ইসরাইল) ফেরাউনের হাত থেকে

মুক্তি পেয়েছে।' সুতরাং বিধানটি আমরা পালন করছি মূসার (আঃ) সুন্নতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্যে।

মহানবী (সঃ) বিভিন্ন বিধি-বিধানেরও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। যেমন দেখুন, যে ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগল, তাকে তিনি হাত ধুতে বললেন। তার কারণ হিসেবে তিনি বলে দিলেন, নিদ্রিত ব্যক্তির জানা নেই তার হাত কোথা থেকে কোথায় ফিরেছে। নাকে পানি দেয়া ও নাক ঝাড়া সম্পর্কে তিনি বললেন, মানুষের নাসিকায় রাতভর শয়তানের অবস্থিতি ঘটে অর্থাৎ তরল নোংরা পদার্থ প্রবহমান থাকে। নিদ্রায় ওজু ভংগ হবার কারণ সম্পর্কে তিনি বললেন, নিদ্রাবস্থায় মানুষের সব বাঁধন শিথিল হয়ে যায় অর্থাৎ পায়খানা-প্রস্রাবের পথে হাওয়া বা তরল পদার্থাদি নির্গমনের সম্ভাবনা থাকে।

তেমনি (হজ্বের সময়ে) পাথর নিক্ষেপ সম্পর্কে তিনি বললেন, এ কাজে আল্লাহ্র স্মরণ হয়। কারো ঘরে দৃষ্টি না দেয়ার বিধান সম্পর্কে বললেন, অনুমতি প্রার্থনার উদ্দেশ্য হল, হঠাৎ নজর ফেলে কাউকে যেন কেউ অপ্রস্তুত অবস্থায় না দেখে। বিড়ালের ঝুটার পবিত্রতা বর্ণনা করতে গিয়ে কারণ দেখালেন, বিড়াল সচরাচর ঘুরে-ফিরে বেড়ায় বলে তার ঝুটা থেকে পরিত্রাণ সম্ভব নয়।

কোন কোন বিধান সম্পর্কে তিনি বলেন, এগুলো ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য হয়েছে। যেমন স্তন্য দানের সময়গুলোয় স্ত্রী সহবাস এ জন্য নিষিদ্ধ ছিল, তাতে সন্তানের ক্ষতি হয়। এভাবে অবিশ্বাসীদের থেকে বিশ্বাসীদের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির জন্য সূর্যোদয়ের সময়ে নামায নিষিদ্ধ হল। তিনি বললেন, অবিশ্বাসীরা সূর্যোদয়ের সময়ে পূজা করে এবং সূর্য শয়তানের মাথার ওপর থেকে বেরিসে আসে। তেমনি দ্বীনকে বিকৃতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বিধান এসেছে। যেমন, যে ব্যক্তি নফলকে ফরজের সাথে মিলিয়ে পড়তে চেয়েছিল, হযরত উমর (রাঃ) তাকে বললেন, "অতীতের উম্মতরা ফরজ নফলের তারতম্য না করেই ধ্বংস হয়েছে।" তখন মহানবী (সঃ) বললেন, ইবনে খাত্তাব! আল্লাহ্ তোমাকে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন করেছেন। তুমি ঠিক কথাই বলেছ। কোন বিধান মানুষকে দোষমুক্ত করার জন্য হয়েছে। যেমন, তিনি একজনকে এক কাপড়ে নামায বৈধ জানিয়ে বললেন-সবার কাছেই

কি দুপ্রস্থ কাপড় রয়েছে? তেমনি স্বয়ং আল্লাহ পাক রমজানের রাতে স্ত্রী সহবাস বৈধ করতে গিয়ে বললেন, "জানতাম তোমরা নিষিদ্ধ করার বিধান মনে-প্রাণে পালন করতে পারছিলে না। এখন আল্লাহ্ তোমাদের উপর দয়ার্দ্র হয়ে কৃত পাপ মাফ করলেন। তাই এখন থেকে তোমরা রমজানের রাত্রে স্ত্রীর সান্নিধ্য নিতে পার।"

কখনও তিনি উৎসাহ ও ভীতি সম্পর্কিত বিধানের উল্লেখ করলে সাহাবাগণ সন্দিহান হয়ে প্রশ্ন তুলতেন। তিনি তার রহস্য জানিয়ে সন্দেহের নিরসন ঘটাতেন। যেমন তিনি বললেন, ঘরে বা দোকানে একা নামায আদায়ের চাইতে মসজিদে জামাতে নামায আদায় করলে পঁচিশগুণ ছওয়াব বেশী পাওয়া যায়। এবং তা এ কারণে যে, কখনও কেউ ভাল ভাবে ওজু করে জামাতের জন্য মসজিদের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তার প্রতি পদক্ষেপে একটা পাপ মুছে যায় ও একটা পুণ্য লিখা হয়। অন্যত্র তিনি বলেন, স্ত্রী সহবাসেও পুণ্য মিলে। জনৈক সাহাবা প্রশ্ন তুললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেটা তো কামনার আনুগত্য হল, তাতে পুণ্য মিলবে কেন? তিনি জবাব দিলেন, যদি তা সে হারাম পথে করত, তা হলে পাপ হত না? তাই যখন সে হালাল পথে তা করল পুণ্য লাভ করল।

অন্য এক মজলিসে তিনি বললেন, দুজন মুসলমান যখন সশস্ত্র দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তখন নিহত ও হন্তা দু'জনই জাহান্নামী হয়। সাহাবারা প্রশ্ন তুললেন, হন্তার জন্য জাহান্নাম ঠিকই, কিন্তু নিহত মুসলিম কেন জাহান্নামে যাবে? তিনি জবাব দিলেন, সেও হন্তাকে হত্যার জন্য সচেষ্ট ছিল। এরূপ অসংখ্য স্থানে সাহাবাদের সংশয় নিরসনের জন্য বিধান ব্যাখ্যাত হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস জুমআর দিন গোসল করার কল্যাণময়তা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। যায়েদ ইবনে ছাবেত ফল পুষ্ট হবার আগে তা কেটে বাজারে বিক্রয় নিষিদ্ধ করণের কারণ বর্ণনা করেছেন। ইবনে উমর কাবা ঘর তাওয়াফের সময় শুধু দুটো রুকন চুমু খাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। তারপর তাবেঈন ও মুজতাহিদীন বিধি-নিষেধের উদ্দেশ্য ও কারণ উপলব্ধি করে এসেছেন। প্রত্যেকটি সরাসরি আদেশ ও নিষেধের তারা কারণ দেখিয়েছেন। হয় তা কল্যাণ লাভের জন্য, নয়তো অকল্যাণ রোধের জন্য এসেছে। তাঁদের গ্রন্থাবলীতে সেগুলোর সবিস্তার বর্ণনা

রয়েছে। ইমাম গাজ্জালী, ইমাম খাত্তাবী ও ইবনে আবদুস সালাম প্রমুখ শরীয়তের বিধি-নিষেধের অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রহস্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন। আল্লাহ্ তাঁদের এ সাধনার পুরস্কার দিন।

কিন্তু, এ সব বাদ দিলেও শরীয়তের বিধি-বিধান ওয়াজিব ও হারাম হওয়ার জন্য আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধ হওয়াটাও একটা বড় কারণ। তাই তা প্রতিপালনকারী পুরস্কার পাবে এবং অমান্যকারী শাস্তি পাবে। এটা ঠিক নয় যে, কর্মের ভাল বা মন্দ কর্তার শাস্তি বা পুরস্কার লাভের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা নেহাৎ খেয়ালী ব্যাপার। শরীয়তের শুধু এ কাজও নয়, কোন্ বিধানের কি দোষ গুণ তা বর্ণনা করেই ছেড়ে দেবে এবং কোনটি হালাল বা হারাম তা বলে দেবে না। তা হবে যেন কোন ডাক্তার শুধু ওষুধের গুণাগুণ আর রোগের বিভিন্ন নাম বলেই কর্তব্য শেষ করল। শরীয়ত সম্পর্কে কোন কোন লোকের ধারণা সেরূপ। অথচ তা সম্পূর্ণ ভুল। ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে দেখলেও এ ধারণা ছুঁড়ে ফেলতে হয় এবং মেনে নেয়া যায়না কিছুতেই। তা হবেই বা না কেন? দেখুন, মহানবী (সঃ) তারাবীর নামাযে অংশ গ্রহণ না করার কারণ সম্পর্কে বললেন, আমার ভয় হয়, তা হলে এ নামায তাদের জন্য ফরজ হয়ে যাবে। আরও বললেন, সব চাইতে পাপী মুসলমান সে, প্রশ্ন তোলার কারণে যার মুবাহ বস্তু হারাম হয়ে যায়।

এ ছাড়াও অনুরূপ অনেক হাদীস আছে যদি এ ধারণাই সত্য হত যে, কারণ ছাড়া কোন বিধান হতেই পারে না, তা হলে যে মুকীমের ঠিক মুসাফীরের মতই অসুবিধা ও কষ্ট দেখা দিত, তার জন্যও রোযা ভংগ করা সংগত হত। যে কষ্টের কারণে রোযা ভংগ বৈধ হল, সে কারণ উভয়ের ভেতরেই সমানে বিদ্যমান। তেমনি মুসাফির মুকীমের বিধানের বেলায়ও এ সত্য প্রযোজ্য। তাই কোন আদেশ-নিষেধ যদি দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে তা বাস্তবায়নের জন্য যুক্তির অপেক্ষায় থাকা চলেনা। কারণ, সীমিত জ্ঞানের মানুষ অধিকাংশ বিশেষ বিশেষ বিধানের সূক্ষ্ম যুক্তি-প্রমাণ উপলব্ধি নাও করতে পারে। অথচ শরীয়ত তা পালন করা ওয়াজিব করে দিয়েছে। মহানবীর (সঃ) জ্ঞান আমাদের সকলের জ্ঞানের চাইতে নিঃসন্দেহে বেশী নির্ভরযোগ্য। তাই যুক্তি-জ্ঞান অযোগ্যের জন্য অনুপযোগী মনে করা হয়েছে। এবং কুরআনের তাফসীরের জন্য যে সব

শর্ত আরোপ হয়েছে, এ জ্ঞান অর্জনের জন্যও তা করা হয়েছে। মহানবী (সঃ) সুন্নাহর সমর্থন ছাড়া শুধুমাত্র যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা কোন মীমাংসা খোঁজা হারাম করা হয়েছে।

আমার আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, সঠিক কথা হল এই, শরীয়তের অনুসরণের জন্য তা আল্লাহ্‌-রাসূলের বিধি-নিষেধ হিসেবে প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট। উপমা স্বরূপ বলা যায়, কোন মালিকের কতিপয় ভৃত্য অসুস্থ হয়ে পড়ল। মালিক তাদের ওষুধ খাওয়াবার জন্য বিশেষ একজন লোক নিযুক্ত করলেন। এখন যদি ভৃত্যরা সেই ব্যক্তির ব্যবস্থা মতে ওষুধ খেতে থাকে, তা হলেই তাদের প্রভুর আনুগত্য প্রকাশ করা হল। প্রভুও তাতে খুশী হবেন, তারাও রোগমুক্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি তারা সে ব্যক্তির কথা না শোনে, তা হলে মূলতঃ তারা মালিকের নির্দেশ অমান্য করল। ফলে তারা যেমন সুস্থ হবেনা, তেমনি পুরস্কৃতও হবে না; বরং তিরস্কৃতই হবে। এমনকি রোগ তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে।

মহানবী (সঃ) বলেন, ফেরেশতারা বলাবলি করছেন, এ ব্যক্তির (মহানবীর) অবস্থা হল এই, কেউ একটি ঘর তৈরী করে সেখানে নানা ধরনের খানাপিনা সাজিয়ে রেখে কাউকে দাওয়াত দিতে বলল। যারা তার দাওয়াত গ্রহণ করল, তারা ঘরে এল ও খানাপিনা পেয়ে গেল। পক্ষান্তরে যারা তা করল না, তারা ঘরেও এল না এবং খানাপিনাও পেল না।

আমার বক্তব্যের সাথে মহানবীর (সঃ) এ হাসীদের মিল রয়েছে। মহানবীর (সঃ) নিম্ন বক্তব্যের তাৎপর্যও তাই ঃ

"আমার ও আল্লাহ্‌ যা দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন, তার উপমা হচ্ছে এই, কোন ব্যক্তি কোন জাতিকে এসে বলল, আমি নিজ চোখে শত্রু সৈন্য দেখে এসে তোমাদের সতর্ক হতে বলছি এবং এখান থেকে পালাতে বলছি। যারা তার কথা শুনে সংগে সংগে পালাল, তারা শত্রু সৈন্যের হামলা থেকে বেঁচে গেল। পক্ষান্তরে যারা তার কথা মিথ্যা ভাবল এবং অলস নিদ্রায় রাত কাটাল, ভোর হওয়ামাত্র শত্রু সৈন্যের হামলায় তারা নিহত হল।

তাছাড়া মহানবী (সঃ) আল্লাহ পাক থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক বলেছেন, তোমাদের কর্মফলই তোমাদের দেয়া হবে। আমি বলছি, আসল

সত্য এ দুটো চরম মতের মাঝখানে রয়েছে এবং সেটাই কেবল উভয় মতের ভেতর সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে। কর্ম ও আল্লাহ্র মর্জী এ দুটোই শাস্তি ও পুরস্কার দানের ক্ষেত্রে সমানে সক্রিয়। তাই শরীয়ত শুধু বিধি-নিষেধের উল্লেখ ও গুণাগুণ বর্ণনায় সীমিত থাকেনা, তাকে বৈধ-অবৈধ করারও ক্ষমতা রাখে। এটাই মধ্যবর্তী মতবাদ। জাহেলী জীবনের পাপের শাস্তি ইসলাম গ্রহণের পর হবে কি হবে না এ উভয় মতেরও সমাধান মধ্যবর্তী মতের ভেতর রয়েছে।*

একদল লোক মোটামুটি ভাবে জানেন যে, বিধি-বিধানের মহৎ উদ্দেশ্যাবলী ও যুক্তি রয়েছে এবং তার কর্মের জন্য যে পুরস্কার ও শাস্তি রাখা হয়েছে তা মনস্তাত্বিক কারণে। অর্থাৎ সুফলের আশা ও কুফলের ভয়ে মানুষ সঠিক পথ অবলম্বন করে। যেমন নবী করীম (সঃ) বলেন, 'সাবধান! মানবদেহে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে। যতক্ষণ তা বিশুদ্ধ থাকে, গোটা দেহ ঠিক থাকে। যখন সেটা খারাপ হয়, গোট দেহ খারাপ হয়ে যায়। সেটাই হল অন্তর।'

কিন্তু সংগে সংগে তারা এ কথাও বলেন, 'এ নিয়ে একটা পৃথক বিষয় রচনা ও তার শাখা-প্রশাখা নির্ণয় করা নিষিদ্ধ। এর যুক্তি সংগত কারণ তো এই, বিষয়টি খুবই সূক্ষ্ম ও জটিল। শরীয়ত সংগত কারণ হল এই, মহানবীর (সঃ) সময়ের পূর্বসূরীরা তাঁর জ্ঞানালোকের আভায় উজ্জ্বল থেকেও এ বিষয়ে কোন গ্রন্থ্ রচনা করে যাননি। ফলে এ বিষয়ে এড়িয়ে চলার ওপরেই যেন মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথবা এ কথাও বলা চলে যে, সেটাকে একটা পৃথক বিষয় হিসেবে দাঁড় করানোর ভেতর কোন দীর্ঘ মেয়াদী কল্যাণ নেই। কারণ, শরীয়ত পালনের জন্য তার উদ্দেশ্য ও যুক্তি জানার প্রয়োজন হয় না।

---

*মধ্য পথ অনুসারে শরিয়ত যেমন যুক্তি নির্ভর নয়, তেমনি যুক্তি বর্জিতও নয়। এটাই গ্রন্থ্কারের মত। ফলে ইসলাম গ্রহণ করলে জাহেলী জীবনের শুধু শিরকের জন্য জবাবদিহি হবে, আহকামের জন্য নয়। কারণ, শিরক ছেড়ে তওহীদ নেবার জন্য জ্ঞানই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে আহকাম জ্ঞানের মুখাপেক্ষি নয়। অথচ একদল ফিকাহবিদ জাহেলী জীবনের সব পাপের জবাবদিহির কথা বলেন। অন্যদল সবই ক্ষমা পাবে বলে জানেন।

উক্ত দলের এ ধারণাও ভুল। তাঁরা যে বলেছেন, বিষয়টি সূক্ষ্ম ও জটিল বলে তা নিয়ে পৃথক বিষয় রচনা অসম্ভব, এ কথা ঠিক নয়। কারণ কোন বিষয় কঠিন বলে তা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করতে অসুবিধা হয় না। দেখুন, ইলমে তাওহীদ (একত্ববাদ তত্ত্ব) এর চাইতেও সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়। তা উপলব্ধি ও আয়ত্ত করা খুবই কঠিন কাজ। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ যাঁকে তওফিক দিয়েছেন, তিনি তা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তেমনি বিভিন্ন বস্তুগত শিক্ষাও পর্যালোচনা এবং আয়ত্ত করা কম কঠিন নয়। কিন্তু যখন তার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে মাথা ঘামানো হয় ও তার পটভূমি আস্তে আস্তে উদ্ঘাটিত হয়, তখন তাতেও দক্ষতা অর্জিত হয়। তার নিয়ম-কানুন ও শাখা-প্রশাখা উদ্ভাবন করা সহজ হয়ে যায়। যদি তাঁদের বক্তব্যের তাৎপর্য এই হয় যে, বিষয়টি বেশ কঠিন, তা হলে তা সমর্থনযোগ্য। কিন্তু, একেবারে অসম্ভব বললে বলতে হয়, বিদ্বানের ওপরেও বিদ্বান রয়েছে। অভীষ্ট তো মানুষকে কষ্ট ও শ্রম দ্বারাই অর্জন করতে হয়। বিদ্যার পৃষ্ঠে তো মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে ও মেধাকে সতেজ করেই আরোহণ করতে পারে।

তারপর তারা যে বললেন, 'পূর্বসূরীরা রচনা করে যাননি এটাও কোন যুক্তি নয়। কারণ, নতুন করে রচনার পথে তা অন্তরায় হয় না। মহানবী (সঃ) নীতি নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন। আইনজ্ঞ সাহাবা যথা আমীরুল মুমিনীন উমর (রাঃ), আলী (কঃ), যায়েদ (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ তাঁর নীতি অনুসরণ করে বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা ও গবেষণা চালিয়ে সবগুলোর কার্যকারণ বলে গেছেন। তারপর যুগে যুগে দ্বীনের পতাকাবাহী মনীষীরা সে ব্যাপারে সংশয় ও জটিলতা সৃষ্টি হলেই, আল্লাহ্দত্ত জ্ঞান থেকে প্রয়োজনীয় কথা প্রকাশ ও প্রচার করতেন। তাঁরা বিতর্ক ও বহাসের তরবারি দিয়ে বিদআতের সৈনিকদের টুকরা টুকরা করে ফেলতেন। তেমনি ধর্মহীনতাকেও তাঁরা নাস্তানাবুদ করে ছাড়তেন।

আমি এখন পর্যন্ত এটাই যথাযথ মনে করি যে, বিভিন্ন মতের উদ্ধৃতি সহ উক্ত বিষয়ের ওপর রচনার প্রয়োজন এ কারণে ছিলনা যে, তাঁরা মহানবীর (সঃ) কাছাকাছি সময়ের এবং তাঁর সংস্রব ও প্রত্যক্ষ প্রেরণা লাভের সৌভাগ্য তাঁদের হয়েছিল। এ কারণেই তাঁদের ভেতর মতভেদও

কম ছিল। আকীদাও (ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা) তাদের সুস্পষ্ট ছিল। সব রকমের মানসিক স্বস্তি ও স্থিরতা তাদের ছিল। কারণ, তাঁরা মহানবী (সঃ) থেকে কোন কথা প্রমাণিত হলেই পালন করতেন এবং বেশী জিজ্ঞাসাবাদ ও খোঁজাখুঁজি চালাতেন না। প্রমাণিত বর্ণনাকে তাঁরা যুক্তির মানদণ্ডে বিচারের প্রয়োজনীয়তা ভাবতেন না। তা ছাড়া বিরাট ও গভীর জ্ঞানের বিষয় নিয়ে তাঁরা নির্ভরযোগ্য জ্ঞানীদের কাছে আলোচনা করতে পারতেন। এ সব কারণেই তাঁরা উক্ত বিষয়টি এত নিষ্প্রয়োজন ভাবতে পেরেছেন।

শুধু তাই নয়। যেহেতু তাঁরা প্রাথমিক যুগের লোক, হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। কোন জটিলতা দেখা দিলে সংগে সংগে জেনে নেবার সুযোগ ছিল। মতভেদ কম ছিল এবং মনগড়া হাদীস বর্ণনার আশংকা ছিল না। তাই হাদীস শাস্ত্রের ওপরও গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা ভাবেন নি। যেমন 'গরীব হাদীসের ব্যাখ্যা, হাদীস বর্ণনাকারীদের পরিচিতি, হাদীসের জটিলতা, হাদীসের বিভিন্নতা, সহীহ, জঈফ, হাসান ও মওজু হাদীসের পার্থক্য-জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের ওপর কোন গ্রন্থই তাঁরা রচনা করে যাননি। তা হয়েছে তাঁদের অনেক পরে। এর মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা তখনই নির্ধারিত হয়েছে, মুসলমানদের যখন সে সবের তীব্র প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং এগুলোর করার ভেতরেই ইসলামের কল্যাণ প্রতীয়মান হয়েছে।

তারপর ফকীহদের ভেতর বিধি-বিধানের কারণ নির্ণয়ে মতভেদ দেখা দেয়ায় রূপরেখাতেও যথেষ্ট মতভেদ সৃষ্টি হল। এমনকি এরূপ প্রশ্নও দেখা দিল যে, এর পেছনে স্বতন্ত্র কোন কল্যাণের উদ্দেশ্য আদৌ রয়েছে কিনা? যদি থেকে থাকে তো শরীয়তের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য কল্যাণময়তা কি করে হাসিল করা যায়?

অবশেষে নেহাৎ ধর্মীয় ব্যাপারেও যুক্তি-বুদ্ধির আশ্রয় শুরু হল। ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও মসআলায় সন্দেহ সৃষ্টি হতে লাগল। তারপর অবস্থা এই দাঁড়াল, প্রমাণিত বর্ণনাকেও যুক্তি-বুদ্ধির সাথে খাপ খাওয়ানো শুরু হল এবং শোনা ব্যাপারকে নিজ নিজ বুঝের সাথে মিলিয়ে নিতে লাগল। এমনকি এটাকেই তারা দ্বীনের পূর্ণ সহায়তা ও খেদমত ভাবতে লাগল। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের মতভেদ দূর করার জন্য এটা চমৎকার পন্থা ও আল্লাহ্র পরম ইবাদত বলে বিবেচিত হয়ে চলল।

শরীয়তের রহস্য উপেক্ষাকারীদের "এটাকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে দাঁড় করাতে কোন উপকার নেই" বক্তব্যটিও ভুল। আমি বলছি, তাতে বিরাট বিরাট কল্যাণ রয়েছে। তার কয়েকটি এখানে বলছি।

এক, এতে মহানবীর (সঃ) বিরাট এক মু'জেযা প্রকাশ পায়। কারণ, তাঁর ওপর যে কুরআন অবতীর্ণ হয়, তৎকালীন ভাষালংকারিকরা তার সামনে মাথা নত করেছিলেন। তার যে কোন একটি সূরার সমকক্ষতা তারা সবাই মিলেও করতে পারেননি। তারপর যখন তৎকালীন আরবী ভাষাবিদরা অতীত হলেন এবং কুরআনের ভাষা ও অলংকারের অতিমানবীয় গুণ সম্পর্কে মানুষ বেখেয়াল হয়ে চলল, তখন উম্মতের শিক্ষাবিদরা সেটা তুলে ধরার জন্য উদ্যোগী হলেন। মহানবীর মু'জিযা সবার সামনে তুলে ধরাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য।

তেমনি মহানবীর (সঃ) ওপর পূর্ণ শরীয়ত এসেছে। অন্যান্য নবীর বেলায় ছিল অপূর্ণ। তাই তার ভেতরে এমন সব সূক্ষ্ম কল্যাণ রয়েছে যা সাধারণের উপলব্ধির বহির্ভূত ব্যাপার। সে সবের তত্ত্ব ও সৌন্দর্য তো তাঁর সমসাময়িক কালের লোকেরা প্রত্যক্ষ সংযোগ ও প্রেরণার মাধ্যমে পেয়ে যেতেন। তাঁদের কথা ও বক্তৃতায় তা প্রকাশও পেয়েছে। কিন্তু তাঁদের অন্তর্ধানের পর সে সব তত্ত্ব ও সৌন্দর্য তুলে ধরা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাহলে সবাই সহজেই বুঝতে পাবে, তার শরীয়ত ঐশী ও পূর্ণাংগ শরীয়ত এবং কোন মানুষ কিছুতেই এটা রচনা করতে পারে না।

দুই, এর ফলে পরিপূর্ণ মানসিক স্বস্তি অর্জিত হয়। যেমন ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন, প্রভু! মৃতকে তুমি জীবিত করতে পার সে বিশ্বাস আমার রয়েছে। তথাপি স্বচক্ষে তা আবার দেখতে চাই শুধু মনটাকে পরিপূর্ণ স্বস্তি দানের জন্য। মূলত দলীল-প্রমাণের আধিক্য ও বিশ্বাস সৃষ্টির অন্যান্য পন্থা প্রয়োগ দ্বারা অন্তর মজবুত হয় এবং মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নির্মূল হয়।

তিন, কল্যাণপ্রার্থীরা যখন পুণ্য অর্জনের জন্য প্রয়াসী হয় ও কোন্ বিধানে কি কি কল্যাণ তাও ভালভাবে জানতে পায় এবং তার আনুষংগিক দাবীগুলোর প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখে, তখন তার সামান্য পুণ্য কাজও অশেষ ফল দান করে। শরীয়ত সে দেখে-শুনে পাকা হয়ে ভালভাবে পালন করে, অন্ধভাবে মানেনা। এ কারণেই ইমাম গাজ্জালী (রঃ) তাঁর ব্যবহারিক

গ্রন্থগুলোর ইবাদতের বিধি-নিষেধের রহস্যাবলী অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন।

চার, ফিকাহবিদদের ভেতর বিধি-বিধানের প্রশ্নে এ কারণেই মতভেদ দেখা দিয়েছে যে, বিধানের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কে তাঁদের মতভেদ ছিল। কিয়াসের জন্য কোন কারণটি গ্রহণযোগ্য ও উপযোগী তা নির্ণয়ে তাঁরা মতৈক্যে পৌছতে পারেন নি। সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য বিষয়টির উদ্দেশ্য ও কারণসমূহ জানা অত্যাবশ্যক।

পাঁচ, বিদ'আতিরা দ্বীনের অনেক ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করে দিয়েছে। তারা কোন কোন বিধান সম্পর্কে বলছে, এটা যুক্তি বহির্ভূত কথা। বুদ্ধি যা সমর্থন করেনা, হয় তা বর্জন করতে নয় তার বুদ্ধিসম্মত কোন ব্যাখ্যা বের করতে হবে। সেমতে কবর আজাবকে তারা অযৌক্তিক বলে থাকে। তেমনি হিসেব-নিকেশ, পুলসিরাত ও মীযান সম্পর্কে বিতর্ক তুলে তারা বিকৃত ব্যাখ্যা দান করে থাকে। এভাবে একদল লোক (ইসমাইলিয়া) দুনিয়াময় সন্দেহের ধুম্রজাল সৃষ্টি করেছে। তারা বলছে, রমযানের শেষ দিন রোযা ফরজ আর শওয়ালের প্রথম দিন রোযা হারাম হওয়ার যৌক্তিকতা কি? এ ধরনের আরও অনেক তর্ক সৃষ্টি করেছে তারা। ছওয়াব ও আজাব নিয়ে তারা হাসি-তামাশা করে। তাদের মতে সেগুলো শুধু ভয় ও লালসা দেখিয়ে কাজ আদায়ের ব্যবস্থা। আসলে ওসব কিছু নেই। এমনকি যুগের এক সেরা নরাধম উদ্দেশ্যমূলক হাদীস তৈরী করে মুসলমানদের ওপর এ অপবাদ চাপাল, তাদের ভেতর ভাল ও মন্দের কোন তারতম্য নেই।

এখন বলুন, এ সব দলের সৃষ্ট সংশয়গুলো দূর করার জন্য সব কিছুর উদ্দেশ্য ও রহস্য বর্ণনা এবং এ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণী গ্রন্থ রচনা ছাড়া উপায় কি? যে ভাবে ইহুদী, নাসারা ও নাস্তিক প্রভৃতির মোকাবিলার জন্য করা হয়েছে, তেমনি বিভ্রান্ত মুসমানদের জন্যও করতে হবে।

ছয়, ফিকাহবিদদের একটি দল রায় দিয়েছেন, জ্ঞান বিরোধী সব হাদীসই অগ্রাহ্য করা হবে। ফলে অনেক সহী হাদীসও বাদ পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। মুসার্রাহ ও কিল্লাতাইনের হাদীস দুটো তার উদাহরণ।* এ ক্ষেত্রে হাদীসবেত্তাদের জন্য এ সব হাদীসের যুক্তি ও কল্যাণের দিগগুলো বর্ণনা না করে উপায় আছে কি?

---

*দুগ্ধবতী উট, গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাচ্চাকে ঠেকিয়ে স্তন ফাঁপিয়ে ক্রেতা ফাঁকী দেবার মাসআলা এসেছে মুসার হাদীস থেকে। পক্ষান্তরে দু'মশকের বেশী পানি হলে নাপাক হয়না মাসআলাটির মূলে হল কিল্লাতাইনের হাদীস। দুটো হাদীসই সিয়া সিত্তায় ঠাঁই পেয়েছে।

শরীয়তের যুক্তি-কল্যাণ ব্যাখ্যাত হওয়ার বিষয়টির এ সব ছাড়াও বহু গুরুত্ব রয়েছে। তাই দেখতে পাবেন, কিছু বর্ণনা করতে কিংবা কোন নীতি নির্ধারণ করতে যেখানে আমি অগ্রসর হব, সেখানেই এমন সব কিছু মাঝে মাঝে বলব যা কোন তর্ক শাস্ত্রবিদ কিংবা কালাম শাস্ত্রবিদ বলেননি। যেমন, হাশর ময়দানে আল্লাহ্ পাকের বিভিন্ন জ্যোতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ। তা হবে বস্তু জগতের ঊর্ধ্বে এমন এক দুনিয়ায় যেখানে কর্ম ও তাৎপর্য নিজ নিজ যথাযোগ্য রূপ নিয়ে ধরা দেবে। পৃথিবীতে যত ঘটনা ও বিবর্তন দেখা দেয়, প্রথমে সেখানে (স্বরূপ জগত) জন্ম নেয়। সেখানে কর্মের সাথে কর্তার মানসিকতাও রূপ নিয়ে ধরা দেবে। জীবনে ও মরণে এ স্বরূপের ভিত্তিতেই ফলাফল দেয়া হবে। আমার সে বর্ণনায় তকদীর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত অনড় ও তার বাস্তবায়ন অপরিহার্য কিনা তার রহস্যও আলোচিত হবে।

আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত, এ সব রহস্য উদ্ঘাটনের সিদ্ধান্ত আমি তখনই নিয়েছি, যখন কুরআন, হাদীস ও 'আছার'-এর সমর্থন ও সহায়তায় পেয়েছি। এমনকি আহলে সুন্নতের যে সব বিশিষ্ট মনীষীর আল্লাহ্দত্ত জ্ঞান (ইলমে লাদুন্নী) প্রাপ্তি ঘটেছে, তাঁদেরও সমর্থন দেখতে পেয়েছি। তাঁরা অনেক রীতি-নীতির বর্ণনা প্রদান করতে গিয়ে এর ওপর ভিত্তি করেছেন।

আহলে সুন্নত মূলতঃ বিশেষ এক মজহাবের নাম নয়। বরং ইসলামের অনুসারীরা দ্বীনের জরুরী বিষয়গুলোর ঐকমত্য রেখেই কোন কোন শাখা-প্রশাখায় গিয়ে মত পার্থক্যের শিকার হয়েছেন। দু'ধরনের মতভেদের মস'আলা-মাসায়েল রয়েছে। এক, কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত ও সহী হাদীস থেকে যা প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রাথমিক যুগের ধর্মবেত্তা সাহাবা ও তাবেঈনরা যা মেনে নিয়েছেন। পরবর্তী কালে ফিকাহবিদরা নিজ নিজ বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে মস'আলা তৈরী শুরু করলে একদল লোক সেগুলো আঁকড়ে থাকেন। তারা বুদ্ধি- গ্রাহ্য রীতি-নীতির কোন তোয়াক্কা করলেন না। তাঁরা কোথাও যদি যুক্তির আশ্রয় নেন তো নেহাৎ বিরোধিতা ঠেকানো ও আত্মতুষ্টি লাভের জন্য করেন। তার উদ্দেশ্য থাকে নিজেদের আকিদা সুপ্রমাণিত করা। এ দলের নাম আহলে সুন্নত আল জামা'ত।

কিন্তু, একদল যেখানে যা কিছু নিজ বিবেক বুদ্ধির বিপরীত দেখেছেন,

ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করে তার প্রকাশ্য অর্থ থেকে অন্যত্র চলে গেছেন। কবরের জিজ্ঞাসাবাদ, আমলের ওজন দেয়া, পুলসিরাতে আরোহণ, আল্লাহর দীদার, আওলিয়ার কেরামত ইত্যাকার ব্যাপার কুরআন-হাদীস থেকে সুপ্রমাণিত হয়েছে এবং প্রাথমিক যুগের সাহাবা ও তাবেঈনরা এগুলো মেনে গেছেন। কিন্তু একদল লোকের জ্ঞান এগুলোর নাগাল পেলনা। তাই তারা এগুলো ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে মোটামুটি অস্বীকার করে চলল। অন্য একদল বলল, যদিও আমরা সেগুলো বুঝতে পারছিনা, তথাপি সেগুলোর ওপর ঈমান রাখছি। এক্ষেত্রে আমার কথা এই, সেগুলোর ওপর শুধু ঈমানই রাখছিনা, তত্ত্বও জানি।

দ্বিতীয় ধরনের মস'আলা হল এই, কুরআন, হাদীস কিংবা সাহাবাদের 'আছার' থেকে তার প্রমাণ মিলেনা, সবকিছুই সে ব্যাপারে নীরব। পরবর্তীকালে একদল লোক জন্ম নিল সে ব্যাপারে জ্ঞানলব্ধ রায় দিতে। যেমন ফেরেশতার ওপর নবীদের মর্যাদা দান, হযরত ফাতিমার (রাঃ) ওপর হযরত আয়েশার (রাঃ) মর্যাদা দান ইত্যাদি। অথবা কুরআন-সুন্নাহ থেকে সুপ্রমাণিত মস'আলার আনুষংগিক কোন ব্যাপারে মস'আলা দাঁড় করা। যেমন পার্থিব সাধারণ কার্যকলাপ কিংবা পার্থিব উপাদান উপকরণ সম্পর্কে মস'আলা। পৃথিবী লয়শীল প্রমাণ করার জন্য 'অংশ হয়না এমন অংশ নেই' ও 'ধ্বংস হয়না এমন উপাদান নেই' সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠিত করা তার অন্যতম উদাহরণ। তেমনি ' আল্লাহ্ পাক কোন বস্তুর মাধ্যম ছাড়াই সমগ্র জগত সৃষ্টি করেছেন' এ বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিজ্ঞানীদের 'এক বস্তু থেকে শুধু এক বস্তুই জন্ম নিতে বা প্রকাশ পেতে পারে' যুক্তি খণ্ডনের মস'আলা। তেমনি 'মু'জিযা' প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুক্তি শাস্ত্রবিদদের 'কার্য কারণের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক' যুক্তিটি ভ্রান্ত প্রমাণের মস'আলা। তেমনি হাশর ময়দানে 'সশরীরে উত্থান' প্রমাণ করার জন্য 'লয়প্রাপ্তের পুনরাগমন অসম্ভব' যুক্তির অসারতা সম্পর্কিত মস'আলা। এরূপ আরও বহু মস'আলা গ্রন্থের পর গ্রন্থ পূর্ণ করে রেখেছেন।

অথবা কুরআন-সুন্নাহ থেকে সুপ্রমাণিত মস'আলার মৌলিক ব্যাপারে একমত থাকলেও তার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় মতভেদ দেখা দিয়েছে। যেমন আল্লাহ্ পাক দেখেন ও শুনেন এ ব্যাপারে কারো মতভেদ নেই। কিন্তু

কিভাবে দেখেন ও শুনেন তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে মতভেদ দেখা দিয়েছে। একদল তো বললেন, তাঁর দেখা-শোনার অর্থ জানা। অর্থাৎ মানুষ দেখে-শুনে যা জানে তা তিনি না দেখে-শুনেই জানেন। আরেক দল বলছেন, তা নয়। দেখা-শোনা ও জানা দুটো পৃথক ও স্বতন্ত্র গুণ। তেমনি আল্লাহ্র 'চিরঞ্জীব' 'সর্বজ্ঞ' 'ইচ্ছাময়' 'সর্বশক্তিমান' 'শ্রেষ্ঠতম বাগ্মী' হওয়ার কারো মতভেদ নেই। তবে একদল তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললেন, এগুলোর বাহ্যিক অর্থ নেয়া যাবেনা; বরং এ সব থেকে তাঁর অস্তিত্বের পরিধি, প্রভাব, কার্যকলাপ ইত্যাদির আভাস নিতে হবে। উক্ত সাতটি গুণের সাথে তাঁর দয়া, ক্রোধ, দানশীলতার কোন পার্থক্য নেই। এমনকি কোন হাদীস থেকেও তার সমর্থনে কোন প্রমাণ মিলেনা। অথচ অন্য দল বলছেন, তা নয়। এসব তাঁর মৌল সত্তায়ই বিদ্যমান রয়েছে।

তেমনি আল্লাহ্র 'তখতে আসীন হওয়া' কিংবা তাঁর 'মুখমণ্ডল' অথবা 'হাসি' সম্পর্কে মোটামুটি সবার ঐকমত্য রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। একদল বলছেন, এগুলোর বাহ্যিক অর্থের বদলে তাৎপর্য গ্রহণ করতে হবে। 'তখতে আসীন হওয়া' অর্থ দখল, বিজয় বা শাসন ক্ষমতা। তেমনি 'মুখমণ্ডল' বলতে তাঁর মৌল সত্তা বুঝানো হয়েছে। অন্যদল এর আলোচনাই বাদ দিয়ে বলছেন, এসবের অর্থ বা তাৎপর্য কোনটিই আমাদের জানা নেই।

আমি এ দু'দলের কোন এক দলকে আহলে সুন্নত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্য দলের ওপর প্রাধান্য দিতে পারিনা। কারণ, নিছক সুন্নত অনুসরণ করা যদি উদ্দেশ্য হয়, তা হলে এ সব ব্যাপারে আদৌ মাথা ঘামানো উচিত নয়। প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা তা করে যান নি। কিন্তু, যদি সবিস্তার বর্ণনার প্রয়োজন দেখা দেয়, তা হলে তাঁরা কিতাব ও সুন্নাহ থেকে যা কিছু বের করেছেন শুধু সেগুলোই ঠিক ভাবতে হবে এবং যে সব ব্যাপারে কিছু বলে যাননি, সেগুলোর ক্ষেত্রে নীরব থাকতে হবে, এটা আদৌ জরুরী নয়। তাঁরা যেটাকে ঠিক ভেবেছেন সেটাই ঠিক, যেটাকে অন্যায় ভেবেছেন সেটাই অন্যায়, যেটাকে কঠিন ভেবেছেন সেটাই কঠিন, যেটার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন ভেবেছেন, সেটাই নিষ্প্রয়োজন, যেটার যা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছেন, সেটাই নির্ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, এ সব ধারণা ভুল।

আমি আগেই বলে এসেছি, মতভেদের দ্বিবিধ মস'আলার প্রথম ধরনের মস'আলায় সুন্নী হওয়া প্রয়োজন বটে, দ্বিতীয় ধরনের সুন্নীদের ভেতরেও যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। যেমন আশআরীয়া ও মাতুরিদিয়ার মতভেদ। এ কারণেই আপনি যুগে যুগে বড় আলেম ও ধর্মবেত্তাদের দেখতে পাবেন, তাঁরা যে কোন ধরনের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম রহস্য উদ্ঘাটন করতে দ্বিধান্বিত হননি। সুন্নতের সরাসরি বিরোধী কিছু না হলে তা তারা এড়াবার চেষ্টাও করেন নি। যদিও মুতাকাদ্দেমীন (পূর্বসূরীরা) সে ব্যাপারে কিছুই বলে যাননি।

যেখানে মতভেদ রয়েছে, সেখানে আমি সম্পষ্ট ও উজ্জ্বল পথ বেছে নেব, অন্য কোন দিকে তাকাব না। এমনকি কিনারা ধরে চলার বদলে মাঝ পথ দিয়েই চলব। অন্যান্যের মতামতেরও তোয়াক্কা করব না।

এটাও লক্ষ্য করুন, প্রত্যেক বিষয়ের বৈশিষ্ট্য ও প্রত্যেকটি স্থানের একটি চাহিদা রয়েছে। 'গরীব' হাদীস নিয়ে যারা মাথা ঘামায়, তাদের সহী ও জইফ হাদীসের ওপর মন্তব্য করা ঠিক নয়। হাদীসের হাফেজের জন্য ফিকাহ্র কোন্ মতটি প্রাধান্য পাবে ও গ্রহণযোগ্য হবে তা বলা অশোভন। তেমনি হাদীসের রহস্য ও কথা বলার লোকের জন্যও ফিকাহর সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাবা ঠিক নয়। তার তো লক্ষ্য ও সীমারেখা হবে মহানবীর (সঃ) বাণীর সে সব রহস্য ও তত্ত্ব উদ্ঘাটন কর যা স্বয়ং মহানবী (সঃ) বিবেচনা করে গেছেন। হোক সে বাণী মুহকাম কিংবা মনসুখ, তার বিরোধী অন্য কোন দলীল থাক বা না থাক এবং ফকীহরা সেটাকে প্রাধান্য দিক বা না দিক।

হ্যাঁ কোন বিষয়ের প্রবর্তকের সে বিষয়ের সাথে সাদৃশ্য রাখে এমন বিষয়ও আলোচনা না করে উপায় থাকে না। হাদীস শাস্ত্রের জন্যও এটা উপযোগী যে, তাতে বিভিন্ন শহরে সংকলিত হাদীস গ্রন্থ প্রকাশের ও ফকীহদের কার্যকলাপের পর যে সব হাদীস অন্তর্ভূক্ত হয়েছে তা বলে দেয়া। তাতে যদি প্রাসংগিক কোন ইজতিহাদী মসআলা কিংবা কোন সত্য অনুসন্ধানের প্রয়াস থাকে, সেটা যে কোন শাস্ত্রবিদের জন্য কোন নতুন কথা নয় এবং তার জন্য তাঁদের নিন্দা করা চলে না।

আমি তো যতখানি সম্ভব সংস্কার চাই। এখন তাতে সাফল্য অর্জন করা বা না করা আল্লাহ্র মদদের ওপর নির্ভর করছে। আমি তাঁর ওপরই ভরসা

করি এবং তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করেছি। তাই এক্ষেত্রে আমার থেকে যদি কুরআন-হাদীসের, উত্তম যুগের মুসলমানের, অধিকাংশ গবেষকের কিংবা বৃহত্তম মুসলিম দলের বিরোধী কিছু প্রকাশ পায়, সেজন্য আমি দায়ী হবনা তা জানি। তথাপি যদি আমার কাছ থেকে এমন কোন কথা বেরোয় সেটাকে ভুল-ভ্রান্তি বলেই ধরে নেবেন। যদি কেউ আমাকে সেই ভ্রান্তির মোহ থেকে মুক্ত করেন কিংবা আমার ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক করেন, আল্লাহ্ পাক তাকে কল্যাণকর প্রতিদান দেবেন। পক্ষান্তরে যারা প্রারম্ভিক ধর্মবেত্তাদের কথা চুরি করে তর্ক-বিতর্কের ঝড় তোলে এবং নিজেদের বিরাট তার্কিক বলে জাহির করে, তাদের প্রতিটি কথা মেনে নেয়া এবং তা অনুসরণ করে চলা আমার জন্য অপরিহার্য নয়। তাঁরাও মানুষ ছিলেন, আমরাও মানুষ। কোন বিষয়ে তাদের পাল্লা ভারী, কোন বিষয়ে আমাদের পাল্লা ভারী।

আমি এ গ্রন্থটিকে দু'খণ্ডে বিভক্ত করেছি। প্রথম খণ্ডে আমি শরীয়তের বিধানগুলোর গূঢ় রহস্য সম্পর্কিত মহানবীর (সঃ) যুগের সর্বমতের বিশেষজ্ঞদের সর্ববাদী সম্মত মূলনীতিসমূহ তুলে ধরেছি। সাহাবাদের এগুলো জিজ্ঞেস করে জানতে হয়নি। মহানবী (সঃ) নিজেই এগুলো বলে দিতেন। কোন মসআলার শাখা-প্রাশাখা বলতে গিয়ে শুধু তার মূলনীতির দিকে ইংগিত দেয়ার মতই ছিল তা। উদ্দেশ্য হল, প্রয়োজনীয় মুহূর্তে শ্রোতারা যেন সে মূলনীতির ভিত্তিতে শাখা-প্রশাখা তৈরী করে নিতে পারে। সে যুগে মিল্লাতে ইসমাইলিয়া নামধারী আরব, ইহুদী আরব ও নাসারা আরবরা এ ধরনের যা কিছু করত, সাহাবাদের তা দৃষ্টিতে ছিল। তাই তাঁরা এ বিষয়ে পারদর্শী হয়েছিলেন। যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন তাঁরা এ ব্যাপারে।

আমি দেখলাম, যদি গোটা শরীয়তের গূঢ় তত্ত্বের সবকিছুর ওপর চিন্তা-ভাবনা করা হয়, তাহলে সেগুলো দুটো ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে প্রতীয়মান হয়। এক পাপ-পুণ্যের পর্যালোচনা। দুই, মিল্লাত ও জাতির রাজনৈতিক সমস্যাবলীর পর্যালোচনা। তারপর এটাও জানা গেল, পাপ-পুণ্যের তত্ত্বকথা তখনই জানা যেতে পারে, যখন কর্মের বিনিময়, কল্যাণ লাভের পন্থাসমূহ ও সৌভাগ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

এটাও জানা গেল, এ বিষয়টি যে কয়েকটি মস'আলার ওপর নির্ভরশীল, এ বিদ্যায় সেগুলো গোড়াতেই স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ের ভেতর তার তত্ত্বালোচনা এ জন্য মিলেনা যে, প্রত্যেকেই আপনা থেকে সেগুলোকে সব মজহাবের স্বীকৃত সত্য বলে মেনে নিয়েছে। এমনকি সেগুলোকে সর্বজনবিদিত বলেও মানা হয়েছে। এ বিদ্যার শিক্ষাদাতাদের বিচক্ষণতার প্রতি ভাল ধারণা নিয়েও তা বাদ দেয়া হতে পারে। এও হতে পারে, এর চাইতেও কোন উন্নত ইলমের ভেতরের দলীলগুলো আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি কলেবর বেড়ে যাবার ভযে এ গ্রন্থে প্রাণ ও মনের অস্তিত্ব প্রমাণ ও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর সেগুলোর সুখ বা দুঃখ পাওয়া সম্পর্কে সবিস্তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন ভাবিনি। কারণ, অন্যান্য গ্রন্থে এর ওপর বহু আলোচনা হয়ে গেছে। অবশ্য সে গ্রন্থে এ ব্যাপারে যে কথা বাদ পড়েছে কিংবা যেদিক আলোচিত হয়নি, আমি নিজ তওফীক অনুসারে সেটুকুই এ গ্রন্থে আলোচনা করেছি। সর্বজন স্বীকৃত বিষয়গুলোরও আমি শুধু সেটুকু আলোচনা করেছি যা পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোয় করা হয়নি। আমার পর্য্যালোচনায় বর্ণনার উদ্ধৃতি এবং মূল দলীল-প্রমাণও নেহাৎ কম রয়েছে।

এ সব কারণেই আমি প্রথম খণ্ডে প্রথমে সে ব্যাপারই আলোচনা করব যা বিনা প্রশ্নে ও উদ্দেশ্যে এ বিষয়ের ভেতর অন্তর্ভুক্ত হওয়া অপরিহার্য। এরপর আসবে কর্ম ফলের অবস্থা পর্যালোচনা। তারপর আসবে বনি আদমের প্রকৃতিগত কল্যাণ কামনা সফলের সেই পন্থা যা আগে আর কেউ এভাবে দেখায়নি, দেখাবার কথা ভাবতেও পারেনি। তারপর মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এবং পারলৌকিক মংগলের রহস্য বলা হয়েছে। তারপর মহানবীর (সঃ) বাণী থেকে শরীয়তের বিধান উদ্ভাবনের পন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কিত হাদীসগুলোর তত্ত্ব ও রহস্য ব্যাখ্যাত হয়েছে। এক, ঈমান। দুই, ইলম। তিন, তাহারাত। চার, সালাত। পাঁচ, যাকাত। ছয়, সওম। সাত, হজ্ব। আট, ইহসান। নয়, মুআমিলাত। দশ, তদবীরে মানাযেল। এগার, সিয়াসাতে মুল্ক। বার, আদাবে মাঈশাত। তের, বিবিধ (সীরাত, ফিতনা, মানাকেব)।

এক্ষণে উদ্দেশ্য বর্ণনার সময় এসে গেছে। সব ধরনের স্তুতি প্রশংসা শুধু আল্লাহ পাকের জন্য নিবেদিত। আল্লাহ্‌র স্তুতি দিয়ে গ্রন্থের শুরু এবং তার স্তুতি দিয়েই এর সমাপ্তি।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

এ খণ্ডে শরীয়তের বিধি-নিষেধের রহস্যাবলী তথা কল্যাণকর তত্ত্বগুলো উদ্ঘাটিত হবে। সেগুলো সাতটি পর্যায়ে ও সত্তরটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হবে। প্রথম অধ্যায়ে শরীয়ত অনুসরণ ও তার প্রতিদান সম্পর্কে আলোচিত হবে। তার প্রথম পরিচ্ছেদে থাকবে আদি সৃষ্টি, সৃষ্টি থেকে সৃষ্টি ও কার্যকারণ রীতির সৃষ্টি সম্পর্কিত পর্যালোচনা।

জানা প্রয়োজন, আল্লাহ্ তা'য়ালা গোটা সৃষ্ট জগত সৃষ্টির ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে তিনটি পন্থা অবলম্বন করেছেন। প্রথমে তিনি অনস্তিত্ব থেকে বস্তুর অস্তিত্ব দান করেছেন। মানে, কোন উপাদান ছাড়াই শূন্যতা থেকে বস্তুকে পূর্ণতা দান করেছেন। সৃষ্টির আদি সম্পর্কে মহানবীর (সঃ) কাছে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করায় তিনি জবাব দিলেন, আদিতে স্রষ্টাই ছিলেন, অন্য কিছু ছিল না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে তিনি এক সৃষ্টি থেকে অন্য সৃষ্টির পত্তন করলেন। যেমন আদমকে মাটি ও জীনকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন। দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি-বুদ্ধির মিলিত সিদ্ধান্ত হল এই, গোটা সৃষ্টি জগতকে আল্লাহ পাক কয়েকটি শ্রেণী ও জাতিতে সুবিন্যস্ত করে রূপ দিয়েছেন। তারপর সেই জাতি ও শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য সুনির্দিষ্ট করেছেন। যেমন, মানুষের বৈশিষ্ট্য হল বাকবিন্যাস, মসৃণ চর্ম, সরল আকৃতি ও যুক্তি- বুদ্ধি। পক্ষান্তরে অশ্বের বৈশিষ্ট্য হল হ্রেষারব, লোমশ চর্ম, বংকিম আকৃতি ও যুক্তি-বুদ্ধিহীনতা। তেমনি বিষের বৈশিষ্ট্য হল নিধন শক্তি, আদার বৈশিষ্ট্য ঝাঁঝ ও শুষ্কতা এবং কর্পূরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোমলতা ও শীতলতা। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় খনিজ দ্রব্য, গাছ-পালা, জীবজন্তু এবং অন্যান্য শ্রেণী ও জাতির সৃষ্টিতেও।

আল্লাহ্র বিধানের বিশেষত্ব এটাই, কোন বস্তু তার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা গুণ থেকে পৃথক হতে পারেনা। একই মানুষের প্রত্যেকেই যেভাবে নিজ বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র হয়ে আছে। ঠিক এ অবস্থাই প্রতিটি বস্তুর গুণাগুণ ও

প্রভাবের। বিশেষ-অবিশেষ সব কিছুর ভেতরেই সাধারণতঃ তার পরিচয় মিলে। কোথাও বিশেষ ভাবে তা প্রতিভাত হয়ে থাকে। বস্তু, উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানুষ সবার ভেতরেই সাধারণ কিছু গুণাগুণ ও প্রভাবাদি রয়েছে। তেমনি বিশেষ গুণাগুণ ও প্রভাবাদিও বিশেষ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। সাধারণের দৃষ্টিতে এ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধরা দেয়না। সব কিছুকে তারা সাধারণ বৈশিষ্ট্য একাকার দেখতে পায়। গভীর জ্ঞানই শুধু সেই সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে সঠিক প্রভাবাদির সাথে তার সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ। মহানবী (সঃ) অনেক বস্তুর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে তার সঠিক প্রভাব নির্ধারণ করে গেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'তালবীবা (খাদ্য বিশেষ) রোগীর জন্য আনন্দ ও শক্তিবর্ধক। কালিজিরা মৃত্যুব্যাধি ছাড়া সব রোগেরই প্রতিষেধক। উটের দুধ ও প্রস্রাব দুটোই হজমের দাওয়াই। শিরাম (বিশেষ বীজ) ঝাঁঝ বিশিষ্ট।'

তৃতীয় পর্যায়ে পাই কার্য-কারণ রীতির সৃষ্টি। এ রীতিতে প্রতিটি তাঁর প্রবর্তিত প্রাকৃতিক নিয়মে দেখা দেয় এবং যে সৃষ্টি থেকে তিনি যে উদ্দেশ্য সাধন করতে চান তা সে গুণ নিয়েই দেখা দেয়। যেমন মেঘ থেকে তিনি বারিপাত ঘটান। তা থেকে মাটি সজীব করে ফসল ফলান। সে ফসল দ্বারা জীবজন্তু ও মানুষ প্রতিপালন করেন। আবার দেখি, ইবরাহীম (আঃ) আগুনে নিক্ষিপ্ত হলে তাঁকে বাঁচাবার জন্য তিনি আগুনকে প্রয়োজনীয় শীতলতা দান করলেন। তেমনি আইউবের (আঃ) দেহে রোগ জীবাণু পূর্ণ করে অবশেষে তা নির্মূল করার জন্য একটি প্রস্রবণ সৃষ্টি করলেন।

এভাবে দেখি, আল্লাহ্ পাক দুনিয়াবাসীর দিকে একবার দৃষ্টি দিলেন। তাদের পাপাচার দেখে ক্ষুব্ধ হলেন। তারপর ওহীর মারফৎ এক নবী মনোনীত করে তাঁকে দায়িত্ব দিলেন আল্লাহর শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যাপারে তাদের সচেতন করার। অবশেষে তাঁকে নির্দেশ দিলেন শক্তি প্রয়োগের (জেহাদের) মাধ্যমে তাদের পাপের আঁধারপুরী থেকে উদ্ধার করে পুণ্যালোকে উদ্ভাসিত করতে।

কার্য-কারণ রীতিতে সৃষ্টির ভেতরেই যে সৃজনী শক্তি দিয়ে দেয়া হয় তা যখন পরস্পর সন্নিহিত হয়ে সংঘাতে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় তা থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়াজাত জিনিস আত্ম প্রকাশ করে। তার

ভেতরে কিছু হয় মৌলিক ও কিছু থাকে কৃত্রিম। কৃত্রিমগুলোর ভেতর থাকে কোন প্রাণীর প্রক্রিয়া কিংবা ইচ্ছা অথবা এ দুয়ের ব্যতিক্রমে অন্য কিছু। তাই এ সব প্রতিক্রিয়াজাত জিনিস ও তার ধরনের ভেতরে কার্যকারণ রীতির ব্যতিক্রম বা বিপরীত কিছু দেখা দেয়াটা অন্যায় নয়।

এটা তো সাধারণ রীতি যে, কোন কিছুর অস্তিত্ব লাভের কারণ ও উদ্দেশ্য নিয়ে যদি গবেষণা করা হয় তা হলে নিঃসন্দেহে তা ভাল ও কল্যাণকর প্রতীয়মান হবে। দেখুন, লোহা কাটবে এটাই তার উদ্দেশ্য, তাই তা ভাল। তবে যে মানুষটিকে কাটবে সে মানুষটির জীবন খতম হয়ে যাবে, এ দৃষ্টিতে লোহার কাটবার শক্তিটা নিন্দনীয় হতে পারে। হ্যাঁ, প্রতিক্রিয়া ও প্রকৃতিতে আরও দু'ধরনের মন্দ দেখা দিতে পারে। এক, যে কল্যাণের উদ্দেশ্যে তার সৃষ্টি তাতে শূন্যতা দেখা দেয়া। দুই, কোন কল্যাণকর প্রভাবের আদৌ অনুপস্থিতি। যখন এ ধরনের মন্দ দেখা দেবার কারণ তৈরী হয়, তখন আল্লাহর অপার করুণা, পরিপূর্ণ ক্ষমতা, সর্বব্যাপী জ্ঞানের দাবী সেই সৃজনী শক্তিগুলোর ও বস্তুনীচয়ের ওপর কবজ, বাসাত, ইহালা ও ইলহামের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করেন এবং সেগুলোকে উদ্দেশ্য অনুসারে পরিচালিত করান।

'কবজ' অর্থ হরণ। তার উদাহরণ এই, হাদীসে আছে, দাজ্জাল ঈমানদার ব্যক্তিটিকে দ্বিতীয়বার হত্যার প্রয়াস পাবে। কিন্তু আল্লাহ তার হত্যা করার শক্তি হরণ করবেন। যদিও হত্যার সব হাতিয়ার ও উপকরণ তার বহাল থাকবে।

বাসাত অর্থ অস্বাভাবিক। তার উদাহরণ এই, হযরত আইউবের (আঃ) আরোগ্য লাভের জন্য ফেরেশতারা চঞ্চুর ঘায়ে প্রস্রবণ তৈরী করলেন। অথচ কার্যকারণের স্বাভাবিক রীতিতে তা হয় না। তেমনি কোন কোন প্রেমিক বান্দা দ্বারা আল্লাহ জেহাদের ময়দানে এমন কাজ করান যা তার মত লোকের কিংবা তার মত কয়েকজনের পক্ষে আদৌ স্বাভাবিক নয়।

ইহালা অর্থ অসম্ভব বা অলৌকিক। যেমন, হযরত ইবরাহীম (আঃ) আগুনে নিক্ষিপ্ত হলে আগুন ঠাণ্ডা হয়ে তাঁকে শান্তিতে বাঁচিয়ে রাখল।

ইলহাম অর্থ দিব্যজ্ঞান বা অবতীর্ণ জ্ঞান। হযরত খিজির (আঃ) ও মূসার (আঃ) ভ্রমণ বৃত্তান্তটি তার উদাহরণ। নৌকাগুলো ভেংগে দেয়া,

ছেলেটি হত্যা করা ও দেয়াল সংস্কার করে দেয়ার কাজ খিজির (আঃ) দিব্যজ্ঞানের নির্দেশে করেছেন। নবীদের ওপর গ্রন্থ ও বিধি-বিধান অবতীর্ণ হওয়াও ইলহামের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তি বিশেষেরও প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তা হাসিল হতে পারে। কখনও প্রয়োজনীয় ব্যক্তি সম্পর্কে অন্যের ইলহাম অর্জিত হতে পারে।

কুরআন পাকে কার্যকারণ রীতির এত সব শ্রেণী ও ধরনের বর্ণনা রয়েছে যা অতিক্রম করা কখনও কারও পক্ষে সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আলম-ই-মিছাল

(স্বরূপ জগত)

জানা প্রয়োজন, অনেক হাদীসই প্রমাণ করেছে, এ রূপ জগতের পশ্চাতে এক স্বরূপ জগত রয়েছে। সেখানে মানুষের দোষ-গুণ ইত্যাদি নিজরূপে অস্তিত্ব ধারণ করে। বস্তু জগতে যতকিছু দেখা দেয় আগে তা সেই কর্ম জগতে রূপ পায়। এখানে যা পাই তা ঠিক ওখানের মতই। সাধারণের চোখে অনেক বস্তুর অস্তিত্ব ধরা দেয়না। সেগুলো সেখানে শরীরী হয়ে বিচরণ করে। মহানবী (সঃ) বলেন, 'আল্লাহ যখন মায়া-মমতা সৃষ্টি করলেন, তখন সে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বিচ্ছেদের ব্যাপারে তোমাকে ভয় করবে এবং তোমার আশ্রয় চাইবে, সে আমার কাছে ঠাঁই পাবে।' তিনি আরও বলেন, 'সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান কেয়ামতের দিন দু'খণ্ড মেঘ বা দুটো ছাতা কিংবা দু'ঝাঁক পাখীর মত ছায়া হয়ে আসবে এবং তারা তাদের পাঠকদের পক্ষ হয়ে কথা বলবে।' তিনি এও বলেন, ' কেয়ামতের দিন সব কৃতকর্ম হাজির হবে। প্রথমে আসবে নামায। তারপর সদ্‌কা, তারপর রোজা ইত্যাদি।' অন্যত্র তিনি বলেন, হাশরের মাঠে পাপ ও পুণ্য দেহ ধারণ করে দাঁড়িয়ে যাবে। পুণ্যবানকে সুসংবাদ শুনাবে পুণ্য এবং পাপ পাপীকে বলবে, পালাও, পালাও। কিন্তু পাপী তখন পালাবার পথ পাবেনা।' আর এক স্থানে তিনি বলেন, 'কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার অন্যান্য দিনগুলো যথাযথভাবে উপস্থিত করবেন। কিন্তু জুম'আর দিনটিকে অত্যন্ত

শান-শওকতের সাথে হাজির করবেন।' অন্যত্র তিনি বলেন, 'কেয়ামতের দিন পৃথিবীকে আল্লাহ নীল রংয়ের দাঁত এবং কুৎসীত ও প্রশস্ত মুখবিশিষ্ট এক অতি বৃদ্ধারূপে দাঁড় করাবেন।'

একবার তিনি বললেন, 'হে মানবমণ্ডলী! আমি যা দেখছি তা কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ? আমি তো তোমাদের ঘরে ঘরে বৃষ্টির মত ফেতনা-ফাসাদ বর্ষিত হতে দেখছি।' মি'রাজ সম্পর্কিত হাদীসে তিনি বলেন, 'হঠাৎ আমার সামনে চারটি প্রস্রবণ দেখা দিল। দু'টি আত্মিক ও দুটি বাহ্যিক। আমি প্রশ্ন করলাম, হে জিব্রাঈল! এ সব কি? তিনি জবাব দিলেন, আত্মিক দুটো জান্নাতের ও বাহ্যিক দুটো হল নীল ও ফোরাতের স্রোত।' সূর্য গ্রহণের হাদীস প্রসংগে তিনি বললেন, 'আমাকে জান্নাত ও জাহান্নামের রূপ দেখানো হয়েছে।' অন্য বর্ণনা মতে তিনি বললেন, ' কেবলাস্থিত দেয়াল ও আমার মাঝখানে বেহেশত ও দোযখ স্বরূপে দেখানো হলো।' এ হাদীসে এ কথাও বলা হয়েছে, তিনি বেহেশতের ফলের একটি গুচ্ছ নেবার জন্য হাত বাড়ালেন। তাতে এও আছে, 'তিনি দোযখের আগুনের তেজে উহ্ উহ্ করে পিছিয়ে এলেন এবং সে আগুনে হাজীদের জিনিসপত্রের চোরকে ও বিড়াল উপোসে মারার মহিলাকে দেখতে পেলেন। তেমনি জান্নাতে তিনি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়ে বাঁচাবার গণিকাটিকে দেখতে পেলেন। এটা সুস্পষ্ট যে, মহানবী (সঃ) ও মসজিদের মেহরাবের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ জায়গায় বেহেশত-দোযখের যে পরিধি সবার জানা রয়েছে তা বাহ্যত কিছুতেই ঠাঁই পেতে পারে না। অথচ অন্যত্র তিনি বলেছেন, দেখলাম, 'জান্নাত এত কণ্টকাকীর্ণ যে প্রবৃত্তির তা অসহ মনে হয়, এবং জাহান্নাম এত কুসুমাস্তীর্ণ যে, প্রবৃত্তির তা খুবই পছন্দনীয়। তারপর জিব্রাঈল বললেন, নিন, এখন দেখে নিন তাদের।'

অন্যত্র তিনি বলেন, যখন বিপদ অবতীর্ণ হয়, তখন দোয়া তার সাথে লড়াই করে এবং ঠেকিয়ে রাখে। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ জ্ঞান সৃষ্টি করে বললেন, কাছে এস। সে কাছে এল। তারপর বললেন, চলে যাও। তখন সে চলে গেল।

একস্থানে তিনি বলেছেন, 'এ পুস্তক দুটো আল্লাহর তরফ থেকে পাঠানো হল।' তিনি আরও বলেন, 'মৃত্যুকে দুম্বারূপ দিয়ে বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে জবাই করা হবে।'

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, 'আমি মরিয়মের কাছে এক ফেরেশতা পাঠালাম, সে এক যুবকরূপে তার সামনে দেখা দিল।' হাদীসে প্রমাণ মিলে, জিব্রাঈল যখন মহানবীর কাছে আসতেন, তিনি তাঁকে দেখতে পেতেন এবং তাঁর সাথে কথা বলতেন। অথচ উপস্থিত অন্য সবাই দেখতে পেতেন না। এও প্রমাণিত হয়েছে, মু'মিনের কবর দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সত্তর গজ প্রশস্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে কাফেরের কবর সংকীর্ণ হতে হতে তার পাঁজরের হাড় এদিক থেকে ওদিকে নিয়ে যায়। হাদীসে এও রয়েছে, কবরে ফেরেশতা এসে মৃতের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তার কৃতকর্ম বিশেষ এক রূপ নিয়ে দেখা দেয়। এও আছে, মরণ কালে যে ফেরেশতা প্রাণ বয়ে নিতে আসে তার হাতে হয় রেশমী বস্ত্র, নয় তো চট থাকে। আরও আছে, কবরে মৃত ব্যক্তিকে (কাফের) ফেরেশতারা গুর্জ ও হাতুড়ি পেটা করবে। তখন তার চীৎকার জীন ও মানুষ ছাড়া চতুর্দিকে সবাই শুনতে পাবে। অন্যত্র আছে, প্রতিটি মৃত কাফেরের ওপর কবরে নিরানব্বইটি আজদাহা লেলিয়ে দেয়া হয়। কেয়ামত পর্যন্ত সেগুলো তাকে দংশন ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে থাকে।

তিনি আরও বলেন, 'মৃতকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন তার মনে হয়, সূর্য ডুবছে। তাই সে বসে চোখ ডলতে ডলতে ফেরেশতাদের বলে, আমাকে ছেড়ে দাওতো নামাযটা পড়ে নিই।' হাদীসে প্রমাণ মিলে, কেয়ামতের দিন হাশরে উপনীতদের আল্লাহতা'য়ালা বিভিন্ন রূপে নিজ জ্যোতি প্রদর্শন করাবেন। এও আছে, 'মহানবী (সঃ) যখন আল্লাহর সমীপে যাবেন, তখন তিনি কুরসির ওপর উপবিষ্ট থাকবেন।' আরও আছে, 'আল্লাহ পাক বনী-আদমের সাথে সামনা সামনি কথা বলবেন।' মোট কথা এ ধরনের অসংখ্য হাদীস রয়েছে।

এ সব হাদীস যারা দেখবে, তাদের তিনটি অবস্থার যে কোন একটি দেখা দেবেই। হয় কেউ এর প্রকাশ্য অর্থই গ্রহণ করবে। তাকে আমার বর্ণিত স্বরূপ জগতটি মেনে নিতে হবে। আহ্লে হাদীসের রীতি এটাই। আল্লামা জালালুদ্দিন সয়ূতী বলেন, আমি তো হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করি এবং এটাই আমার মজহাব।

কেউ হয়ত বলবে, আসলে এসবের কোন কিছুই অস্তিত্ব নেবেনা, শুধু খেয়ালী দৃষ্টিতেই তা পরিদৃষ্ট হবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আল্লাহর ' সেদিনের অপেক্ষা কর যেদিন আকাশ ধোঁয়াটে মনে হবে' এ বাণী ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, তাঁর সময়ে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এবং তখন অনশনক্লিষ্ট দেহ নিয়ে ওপরে তাকালে গোটা আকাশ ধোঁয়াটে মনে হত। ইবনে মাজেফু'ন থেকে বর্ণিত আছে, যে হাদীসেই কেয়ামতের দিন আল্লাহর চলাফিরার কিংবা দর্শন দানের কথা রয়েছে তার তাৎপর্য এই, আল্লাহ পাক সেদিন বান্দার দৃষ্টি এভাবে বদলে দেবেন যাতে করে তারা সেরূপ দেখতে পাবে। তারা দেখবে যেন তিনি এসে তাদের সাথে কথা বলছেন। অথচ না তিনি মূলত নিজ অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্র নড়ছেন, না কারো সাথে কথা বলছেন। বান্দার এ অবস্থা এজন্য ঘটানো হবে যেন তারা বুঝতে পায় আল্লাহ সব কিছুই করতে পারেন।

কেউ হয়তবা বলবে, এ সব হাদীসের অন্যরূপ তাৎপর্য রয়েছে। সে সব তাৎপর্যের জন্য এ সব রূপকের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। আমার বক্তব্য হল, এ তৃতীয় মতটি কোন সত্যানুসারীর নয়।

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) কবর আজাব সম্পর্কে বলতে দিয়ে এ তিনটি অবস্থা সম্পর্কেই ভালভাবে পর্যালোচনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"এ ধরনের হাদীসের বাহ্যিক অর্থ তো ঠিক, তবে তার অন্তর্নিহিত রহস্য রয়েছে। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের কাছে তা সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। যে ব্যক্তি এগুলোর রহস্য জানেনা এবং কোন কিছুর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব যার কাছে ধরা দেয়না, তার অন্তত প্রকাশ্য অর্থগুলো অস্বীকার করা উচিত নয়। বরং সত্য বলে সেগুলো মেনে নেয়া উচিত। কারণ, এটা ঈমানের ন্যূনতম দাবী।"

কেউ যদি বলে, আমি কাফেরের কবর উন্মুক্ত করে দেখেছি এবং বহুদিন পরে তার লাশ কবরে পড়ে থাকতে দেখেছি। কিন্তু বর্ণিত অবস্থাগুলো কখনও পরিদৃষ্ট হয়নি। তাই চোখে দেখা ব্যাপারের বিপরীত কথাকে কি করে সত্য বলে মেনে নেব?

তার জবাব হল এই, এ ধরনের কথা মানতে গেলে মানুষের তিনটি অবস্থা দেখা দেয়। প্রথম অবস্থাটি সব চাইতে বিশুদ্ধ, সুস্পষ্ট ও সমর্থনযোগ্য। তা হল এই, এসব কথা মূলত সত্য। নিঃসন্দেহে অজগর

সাপ মৃত কাফেরকে দংশন করে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করছে। তবে এ পার্থিব চোখে আপনি সেই অপার্থিব ব্যাপারটি দেখতে পাবেন কেন? পারলৌকিক সব ঘটনাই তো আত্মিক ও অপার্থিব। দেখুন, জিব্রাঈলের (আঃ) অবতরণ সম্পর্কে সাহাবারা (রাঃ) কিরূপ আস্থা রাখতেন। অথচ তাঁরা তাঁকে দেখতে পেতেন না। তথাপি তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, মহানবী (সঃ) যথার্থই জিব্রাঈলকে (আঃ) দেখতে পেতেন। এক্ষণে আপনারা যদি মহানবীর (সঃ) হাদীসগুলো অবাস্তব বলে মনে করেন তো তাঁর কাছে ফেরেশতার আগমন ও ওহী অবতীর্ণ হবার কথা কি করে বিশ্বাস করবেন?

সুতরাং প্রথমে আপনাদের ঈমানের নবায়ন ও সংস্কার প্রয়োজন। যদি আপনি এ ঈমান রাখেন যে, কিছু ব্যাপার মহানবী (সঃ) দেখতেন, কিন্তু উম্মতরা দেখার ক্ষমতা রাখেনা, তা'হলে মৃতের ব্যাপারে যা যা বলা হল তা মানতে দ্বিধা আসবে কেন? ফেরেশতা যেরূপ মানুষ ও জীব-জন্তুর মত নন, তেমনি মৃতকে দংশন করার অজগর ও বিচ্ছু পার্থিব অজগর ও বিচ্ছুর মত নয়। বরং সেই অপার্থিব অজগর অন্য কিছুর তৈরী সাপ। তাই, তা দেখতে অন্য ধরনের দৃষ্টি ও অনুভব শক্তি থাকা চাই।

দ্বিতীয় অবস্থার মানুষেরা বলেন, আপনারা নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নে সাপে কাটার কথা মনে করুন। স্বপ্নে সে দংশন জ্বালার তীব্রতাও অনুভব করে। সে জাগ্রতের মতই দংশন জ্বালায় চীৎকার করে উঠে ও ঘর্মাক্ত হয়। কখনও সে শয়নস্থল থেকে লাফিয়ে ওঠে। এ সবই সে ব্যক্তি দেখে ও অনুভব করে। কিন্তু বাহ্যত আপনি নিদ্রিতকে চুপচাপ পড়ে থাকতে দেখছেন। না তার কাছে সাপ দেখছেন, না ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ। অথচ স্বপ্নদ্রষ্টা তো সাপ-বিচ্ছু যেমন দেখছে, তেমনি তার দংশন জ্বালাও অনুভব করছে।

আপনাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এসব হল দৃষ্টি অগোচর ব্যাপার। তথাপি স্বপ্নের সাপের দংশন জ্বালা স্বপ্নমগ্নের জন্য যখন জাগ্রত সাপের দংশন জ্বালার মতই কষ্টদায়ক, তখন এ দু'সাপের ভেতর তারতম্য কোথায়?

তৃতীয় অবস্থাটা এই, আপনারা ভালভাবেই জানেন, সাপ স্বয়ং দুঃখ-কষ্ট নয়, দুঃখ-কষ্ট রয়েছে তার বিষে। এমনকি বিষও দুঃখ-কষ্ট নয়, দুঃখ-কষ্ট তার প্রভাবজাত জ্বালায়। এখন যদি বাস্তব বিষ ছাড়া অন্য কিছু থেকেও

সেই জ্বালা অনুভূত হয়, তাও তার থেকে আদৌ কম দুঃখদায়ক শাস্তি নয়। তবে সেই শাস্তির দুঃখকে সাধারণের উপলব্ধির উপযোগী করতে হলে বাস্তব কারণের উল্লেখ সম্ভব নয়। যেমন যৌন সুখ যদি কাউকে নারীর স্পর্শ ছাড়া উপলব্ধি করাতে হয় তা হলে নর-নারীর যৌন মিলনের উল্লেখ ছাড়া বুঝানো সম্ভব হয় না। এটা কার্যকারণ বুঝবার জন্য প্রয়োজন। যেন কারণ থেকে অনিবার্য কার্যের উপলব্ধি ঘটে। কার্যত যদিও কারণ অনুপস্থিত, তথাপি তার বর্ণনার মাধ্যমে কার্য জ্ঞাত করানোই উদ্দেশ্য। লক্ষ্যবস্তু কারণ নয়, কার্য।

বলা বাহুল্য, মানুষের এ জীবনের কু-অভ্যাসগুলোই মৃত্যুকালে তাকে দুঃখ-কষ্ট দেবার জন্য মওজুদ থাকে। সেগুলোর অনুশোচনা তাকে সাপের মতই দংশন করতে থাকে। যদিও তার অন্তরে সাপ উপস্থিত থাকে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মালা-ই-আলা

(সর্বোচ্চ পরিষদ)

আল্লাহর সর্বোচ্চ পরিষদের মহামান্য ফেরেশতাদের বর্ণনাই এ পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ পাক স্বয়ং বলছেনঃ

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا * رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ * رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ نِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ * وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ * وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ وَذَالِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ *

সূরা মুমিন ঃ আয়াত ঃ ৭-৯

"আরশ মু'আল্লার বাহক ও তা বেষ্টনকারী পরিষদ আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় নিরত থাকেন এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ প্রত্যয় নিয়ে ঈমানদার বান্দাদের জন্য ক্ষমা চাইতে থাকেন। তাঁরা বলতে থাকেন, হে আমাদের প্রভু! সব কিছুই ঘিরে আছে তোমার জ্ঞান ও করুণা (তুমি সবই জান ও সবার প্রতি তোমার সহৃদয় দৃষ্টি)। তাই যে বান্দারা তোমার দিকে মুখ ফিরিয়েছে ও তোমার দেখানো সরল পথ অনুসরণ করেছে, তাদের তুমি ক্ষমা কর। তাদের দোযখের আগুন থেকে রেহাই দাও। হে আল্লাহ! তাদের ও তাদের বাপ-মা, স্ত্রী-পুত্রদের যারা ঈমানদার তাদের সবাইকে চিরন্তর জান্নাতের বাসিন্দা কর। তাদের জান্নাত দানের তো তুমি ওয়াদা করেছ। তুমিই সর্বশক্তিমান ও শ্রেষ্ঠতম কুশলী। হে মা'বুদ! তাদের অকল্যাণ থেকে বাঁচাও। তুমি সেদিন যাদের অকল্যাণ থেকে বাঁচাবে, তার ওপর বড়ই দয়া দেখানো হবে। এটাই চরম সাফল্য, পরম অভীষ্ট লাভ।"

রাসূল (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা যখন আরশ থেকে কোন ফরমান জারী করেন, তখন ভয়ে ফেরেশতাদের পাখা ও পালক ঝড়পেটা হতে থাকে। তাতে পাথরে জিঞ্জীর আছড়ানোর মত ঝনৎকার শ্রুত হয়। তারপর যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় ও অস্থিরতা দূর হয়, তখন একে অপরকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ্ পাক কি নির্দেশ দিলেন? তখন কেউ বলে দেন, তিনি অমুক সত্যটি প্রকাশ করেছেন এবং তিনিই সর্বোন্নত ও শ্রেষ্ঠতম।

অন্য এক বর্ণনায় এরূপ বলা হয়েছে, আল্লাহ পাক যখন কোন নির্দেশ দেন, তখন আরশবাহী ফেরেশতারা তাঁর তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন। তারপর তা অনুসরণ করেন আরশের পার্শ্বস্থ মজলিস সদস্যরা। এ ভাবে

পর্যায়ক্রমে পার্শ্বস্থ্ নিম্নতর আকাশের, এমনকি দুনিয়ার ফেরেশতা পর্যন্ত তাসবীহ্ পাঠের অনুসরণ করে চলে। অবশেষে আরশের নিম্ন দিকের ফেরেশতারা আরশবাহী ফেরেশতাদের প্রশ্ন করেন, প্রভু তোমাদের কি নির্দেশ দিলেন? তখন তাঁরা প্রভুর নির্দেশ বলে দেন এবং তা আবার পর্যায়ক্রমে শ্রুত হয়ে সপ্ত আকাশ পেরিয়ে দুনিয়ার ফেরেশতাদের কাছে পৌঁছে যায়।

অন্যত্র তিনি বলেন, আমি তাহাজ্জুদের জন্যে জেগে উঠে ওজু সেরে আল্লাহ যতখানি তওফিক দিলেন নামায পড়লাম। নামাযের ভেতরেই তন্দ্রা এল এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হলাম, দেখতে পেলাম, আল্লাহ পাক অত্যন্ত পবিত্র রূপে জ্যোতির্ময় হয়েছেন। তিনি বলছেন, হে মুহাম্মদ! আমি জবাব দিলাম, হে আমার প্রতিপালক! আমি উপস্থিত রয়েছি। তিনি প্রশ্ন করলেন, সর্বোচ্চ পরিষদের ফেরেশতারা কোন সম্পর্কে আলোচনা করছে? আরজ করলাম, আমার তো জানা নেই। তিনি একে একে তিনবার একই প্রশ্ন করলেন এবং আমিও একই উত্তর দিলাম।

তারপর মহানবী (সঃ) বললেন, আমি দেখলাম, তিনি আমার কাঁধের ওপর হাত রাখলেন এবং আমি তাঁর আঙ্গুলের অগ্রভাগের শীতলতা অন্তর দিয়ে অনুভব করলাম। তারপর সে কথাগুলো আমার কাছে সুস্পষ্ট হল। তাঁর প্রশ্নের জবাবও আমার জানা হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহ পাক সম্বোধন করলেন, হে মুহাম্মদ! আমি জবাব দিলাম, হে আমার প্রভু! আমি হাজির আছি। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, হে মুহাম্মদ, উচ্চতম পরিষদ কোন ব্যাপারে আলোচনা করছে? আরজ করলাম, জামাতের (নামাযের) জন্য পথ চলা, নামাযের পর (ইবাদতের জন্য) মসজিদে বসে থাকা এবং কষ্টের ভেতরেও পুরোপুরি ওজু করা। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, এ ছাড়া আর কি আলোচনা করছে তারা? আরজ করলাম, মর্যাদার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে। প্রশ্ন করলেন, সেগুলো কি? আরজ করলাম, মিসকীন খাওয়ানো, সবিনয়ে কথা বলা এবং সবার ঘুমের সময়ে ইবাদত করা (তাহাজ্জুদ পড়া)।

অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন এবং বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন, তখন জিব্রাঈলকে ডেকে বলেন, আমি অমুককে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। সেমতে জিব্রাঈল তাকে

ভালবাসেন। তারপর আকাশমণ্ডলীতে ঘোষণা করে দেয়া হবে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু, তাকে সবাই ভালবাস। তাই আকাশের সবাই তাকে ভালবাসবেন। এভাবে তাকে পৃথিবীতেও জনপ্রিয় করা হয়। অর্থাৎ সবার অন্তরে তার ভালবাসা জন্ম নেয়। তেমনি আল্লাহ যখন কাউকে খারাপ জানেন, জিব্রাঈলকে ডেকে বলেন, অমুক ব্যক্তিকে আমি ঘৃণা করি, তুমিও ঘৃণা করতে থাক। সেমতে জিব্রাঈল তাকে ঘৃণা করবেন। তারপর আকাশ-মণ্ডলীর সবাইকে জানিয়ে দেয়া হবে, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক ঘৃণা করেন, তোমরাও তাকে ঘৃণা কর। তা শুনে সেখানে সবাই তাকে ঘৃণা করবে। অবশেষে সেই ঘৃণা পৃথিবীতেও দেখা দেবে।

মহানবী (সঃ) অন্যত্র বলেন, কেউ যদি নামাযের পর মসজিদে বসে থাকে, তাকে ফেরেশতারা ততক্ষণ দোয়া করেন যতক্ষণ না সে তাদের কষ্ট দেয় এবং অপবিত্র হয়। তাঁরা এ দোয়া করেন, হে আমার প্রভু! তাকে ক্ষমা কর। হে আমার প্রভু! তাকে দয়ার দৃষ্টিতে দেখ।

তিনি আরও বলেন, প্রতি ফজরে দু'জন ফেরেশতা নেমে আসেন। একজন বলেন, হে আমার প্রভু! দাতা ও (উদার হস্তে) খরচকারীকে তুমি প্রতিদানে আরও বাড়িয়ে দাও। দ্বিতীয় ফেরেশতা বলেন, হে আমার প্রভু! বখিলকে বাড়িয়ে দিও না এবং তার সম্পদ ধ্বংস কর।

উল্লেখ্য যে, শরীয়ত থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে, আল্লাহ পাকের কিছু উত্তম বান্দা রয়েছেন। তাঁরা হলেন উচ্চ মর্যাদার আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা। যে ব্যক্তি নিজকে পুণ্যবান রূপে গড়ে তোলেন এবং নিজকে সম্পূর্ণ নির্দোষ রেখে পূত চরিত্রের অধিকারী হন, এবং মানব সমাজের সংস্কার ও কল্যাণ সাধনে ব্রতী হন, সেই ফেরেশতারা তার জন্য সর্বদা দোয়া করতে থাকেন। ফলে তার ওপর রহমত ও বরকত নাযিল হয়। এ ফেরেশতারা আল্লাহর নাফরমান ও ফেতনা সৃষ্টিকারী বান্দাদের ওপর বদ-দোয়া ও অভিসম্পাত দিতে থাকেন। তাদের এ বদ-দোয়া ও অভিসম্পাতের কারণে পরিণামে নাফরমানদের অনুতপ্ত হতে হয়। আর সে কারণেই নিম্নতর আকাশের ও পৃথিবীর বাসিন্দাদের অন্তরে তাদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। খারাপ ব্যবহার করার জন্য ইলহামেও জানানো

হয়। তার ফলে পৃথিবীতেও তারা দুর্ব্যবহার পায়, নশ্বর দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হবার পরেও পায়।

এ ফেরেশতারা আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের ভেতর দূত হিসেবে কাজ করেন। তাঁরা বনি আদমের অন্তরে ভাল কথা জাগিয়ে দেন। তাঁরা যে কোন ভাবে অন্তরের ভাল ভাবগুলো জাগ্রত রাখার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ পাক যেভাবে তাঁদের যেখানে চান সমবেত করে মজলিস বসান। তাঁদের এ মর্যাদা ও অবস্থার জন্য পৃথক পৃথক নামে তাঁদের ডাকেন। কখনও 'রফীকুল আলা' (উঁচুস্তরের বন্ধু), কখনও 'নুদীউল আলা' (উর্ধতম মজলিস) ও কখনও মালা-ই-আলা (উচ্চতম পরিষদ) বলে আখ্যায়িত করেন। পুণ্যবান ও নৈকট্য লাভকারী লোকদের আত্মাও তাদের ভেতর শামিল হয়। আল্লাহ পাক বলেন,

يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِى فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ *

সূরা ফাজর ঃ আয়াত ২৮-৩০

'হে নিশ্চিন্ত আত্মাসমূহ! সানন্দে তোমাদের প্রভুর কাছে চলে এস ও আমার বান্দাদের সাথে গিয়ে মিলিত হও এবং আমার জান্নাতে এসে বাস কর।

রাসূল (সঃ) বলেন, আমি জাফর ইবনে আবু তালিবকে ফেরেশতা রূপে জান্নাতে অন্যান্য ফেরেশতার সাথে পাখায় ভর করে উড়তে দেখেছি।

আল্লাহর সব বিধি-বিধান ও সিদ্ধান্ত প্রথমে মালা-ই-আলায় অবতীর্ণ হয়। "দুনিয়ার যে সব কাজ তাৎপর্যময় ও কল্যাণধর্মী তা এই কদরের রাতে নির্ধারিত হয়" আল্লাহর এ বাণী সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলো উচ্চতম পরিষদে নির্ধারিত হয়ে থাকে। কোন না কোন ভাবে শরা-শরীয়ত এখানেই স্থিরিকৃত হয়।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, উচ্চতম পরিষদে তিন শ্রেণীর সদস্য রয়েছেন।

প্রথম শ্রেণীর দায়িত্বে রয়েছে আল্লাহর মংগলময় ব্যবস্থাবলী। মুসাকে (আঃ) পথ প্রদর্শনের জন্য যে নূর দ্বারা আল্লাহ আগুন সৃষ্টি করেছিলেন, তা থেকেই এ শ্রেণীর ফেরেশতাদের তৈরী করে তাতে পবিত্র আত্মাগুলোর সংযোগ ঘটানো হয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্ম হয়েছে মৌল উপাদানগুলোর সংঘাতসৃষ্ট সূক্ষ্মতম ও পরম হাল্কা এক বিশেষ তাপ ও দ্যুতি থেকে। তারপর তাকে এমন উঁচু পর্যায়ের আত্মার সংযোগ ঘটানো হয়েছে যা জীব জগতের পংকিল প্রাণ প্রবাহ থেকে স্পষ্টত স্বতন্ত্র হয়ে ধরা দেয়।

তৃতীয় শ্রেণীর সদস্য হলেন আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী মানবাত্মারা। তাঁরা জীবিতাবস্থায় পুণ্যব্রতের দ্বারা মালা-ই-আলার মর্যাদা পান। অবশেষে তাঁদের আত্মা থেকে দেহরূপ আবরণটুকু খসে পড়লে তাঁরা সেখানে গিয়ে শামিল হন। তখন থেকে তাঁরা মালা-ই-আলার সদস্যরূপে গণ্য হন।

মালা-ই-আলার আসল কাজ হল প্রতিনিয়ত নিজ প্রভুর দিকে নিবিষ্ট থাকা এবং অন্য কোন ব্যস্ততাকে সেই পথে অন্তরায় হতে না দেয়া। আল্লাহ পাক যে বলেছেন, "মালা-ই-আলা' সতত আল্লাহর স্তুতি গেয়ে ফিরে ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনায় মুখর থাকে এবং তাঁর ওপর সুদৃঢ় ঈমান রাখে" তার তাৎপর্য এটাই। তা ছাড়া তাঁদের অন্তরকে আল্লাহ খোদায়ী জীবন ব্যবস্থা পছন্দের ও গ্রহণের জন্য প্রস্তুত রাখেন। তেমনি তাঁরা আল্লাহ বিরোধী অন্যায় জীবন ব্যবস্থাকে খারাপ জানেন ও ঘৃণা করেন। "তারা ঈমানদারের পাপের জন্য ক্ষমা চাইতে থাকে?" আল্লাহর এ বাণীর তাৎপর্য এটাই।

উচ্চতম পরিষদের সর্বোচ্চ মর্যাদার ফেরেশতারা সেই পুণ্যাত্মার চার পাশে নূরের সমাবেশ ঘটান ও তাদের সাথে মেলামেশা করেন। তারপর এরা সবাই মিলে একাত্ম হয়ে যান এবং নাম পান 'হাজিরাতুল কুদুস' বা পবিত্র পার্লামেন্ট।

এ পবিত্র পার্লামেন্টে এরূপ পরামর্শ করা হয় যে, বনি আদমের পার্থিব ও অপার্থিব কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনার জন্য এবং তাদের সমস্যাবলী দূর করার জন্য কোন এক ব্যক্তিকে পূর্ণত্ব দেয়া ও তার নির্দেশ অন্য সবার ভেতরে প্রতিপাল্য করা প্রয়োজন। সে ব্যক্তিটি হবেন সেই যুগের উত্তম ব্যক্তি। এ পরামর্শ অনুসারেই যোগ্য লোকদের অন্তরে এ ইলহাম (কথা) ঢেলে দেয়া

হয় যে, সেই ব্যক্তির অনুগত হয়ে তারা এমন এক জাতিতে পরিণত হবে যারা গোটা বনি আদমের সেবায় আত্মনিয়োগের যোগ্যতা অর্জন করবে। এ পরামর্শের প্রেক্ষিতেই এমন বিদ্যার চর্চা বেড়ে যায় ও দীক্ষা চলতে থাকে যা থেকে জাতি সংশোধিত হয় এবং পথের দিশা পায়।

উক্ত ইলহাম কখনও ওহী হয়ে আসে, কখনও স্বপ্নে দেখতে পায়, কখনও গায়বী আওয়াজ শোনে, কখনও বা হাজিরাতুল কুদুসের প্রতিনিধি সেই ব্যক্তিটির (নবীর) সাথে দেখা করে সরাসরি বলে দেয়। এ কারণেই সেই ব্যক্তিত্বের সহচর ও অনুচররা তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকে। ফলে তাঁর সাফল্য ও মংগলের উপকরণ ও সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাঁর দুশমন ও আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারীর ওপর অভিসম্পাত বর্ষিত হয় এবং সেটা তাদের ব্যর্থতা ও দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মোট কথা, নবুয়তের অন্যান্য মূলনীতির এটা অন্যতম। এ ফেরেশতাদের এরূপ স্বতন্ত্র ও স্থায়ী সিদ্ধান্তকে বলা হয় 'তাঈদে রূহুল কুদুস' বা পবিত্র পার্লামেন্টের সহায়তা; এটা যাঁরা লাভ করেন তাঁরা নানারূপ অলৌকিক কাজ করেন ও মানুষের অসাধ্য কার্যাবলী সাধন করে থাকেন। এটাকেই বলে মু'জিযা।

এ দ্বিবিধ মালা-ই-আলার এক স্তর নীচে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি রয়েছেন। তারা উচ্চতম মর্যাদার অধিকারী না হলেও তাদের প্রেরণার সূক্ষ্ম ও হাল্কা তাপে সবার ভেতর এক সরল প্রকৃতি জন্ম নেয়। এ সরল প্রকৃতির সৃষ্টিরা শুধু প্রেরণা ও নির্দেশনা লাভের অপেক্ষায় থাকে। তারই প্রভাব স্রষ্টার যোগ্যতা ও প্রভাব গ্রহণের ক্ষমতার ভেতরে যখন সমতা স্থাপিত হয়, তখন তারা নিজ অস্তিত্ব ভুলে জান-মাল বাজী রেখে প্রভাবিত কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পশু-পাখী নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজনে যেভাবে ছুটে যায়, তেমনি ছুটে যায় তারা ওপরওলার ইংগিতে।

সুতরাং তাঁদের কাজই হচ্ছে মানুষ ও জীবজন্তুর ভেতর প্রভাব সৃষ্টি করা। সে সবের ধ্যান-ধারণা ও ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে তাঁরা নিজেদের অভিপ্রায় অনুসারে পরিচালিত করেন। যদি কোন পাথর নড়ে কিংবা চঞ্চল হয়, কোন বুজুর্গ ফেরেশতা সেটাকে চঞ্চল ও গতিশীল করেন। তেমনি কোন শিকারী যখন নদীতে জাল ফেলেন, তখন একদল ফেরেশতা কোন

কোন মাছের ভেতর জালে ফেঁসে যাবার ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং কোন মাছকে ভেগে যাবার ভাবনা দান করেন। সেমতে কোন ফেরেশতা রশি টেনে ধরে এবং কোন ফেরেশতা রশি ঢিল দেয়। মাছগুলোও জানে না তাদেরকে কি করছে ও কেন করছে। তাদের মনে যা ইলহাম হয় তা-ই তারা করে যায়। তেমনি দু'দল সৈন্য যখন লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তখন ফেরেশতারা এসে এক দলের প্রাণে সাহস ও অস্ত্র চালনার শক্তি যোগান এবং অন্য দলের প্রাণে দুর্বলতা ও হাতে শিথিলতা এনে দেন। তাদের উদ্দেশ্য থাকে যার কর্মে যে পরিণতি রয়েছে সেটাকে বাস্তবায়িত করে দেয়া। কখনও তাঁদের ওপর নির্দেশ আসে মানুষকে সুখ-শান্তি কিংবা দুঃখ-দুর্দশা পৌছে দেয়ার। তখন তারা সে কাজে আত্মনিয়োগ করে।

এ ফেরেশতাদের বিপরীত দিকে এমন একটি দল রয়েছে যাদের ভেতর রয়েছে খেলো প্রকৃতির রাগ ও পাপ প্রবণতা। তারা উত্তপ্ত আঁধার থেকে জন্ম নেয়। তাদের বলা হয় শয়তান। এ শয়তানরাই ফেরেশতাদের প্রয়াস ব্যর্থ করার জন্য পাল্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আল্লাহর অনড় বিধান

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا *

সূরা আহযাব ঃ ৬২

"আল্লাহর প্রকৃতিতে তুমি কোন পরিবর্তন দেখতে পাবেনা" কুরআনের এ আয়াতের ওপর এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, সৃষ্টি জগতে আল্লাহর কিছু কাজ তাঁর প্রবর্তিত কোন না কোন প্রাকৃতিক শক্তির ভিত্তিতে বিন্যস্ত হয়ে থাকে। উদ্ধৃতি ও যুক্তিবুদ্ধি উভয় থেকেই এর সমর্থন মিলে। মহানবী (সঃ) বলেন, আল্লাহ পাক গোটা দুনিয়ার এক মুষ্টি মাটি দিয়ে আদমকে তৈরী করেছেন। এ

কারণে আদম সন্তান লাল, কালো কিংবা দুয়ের মাঝামাঝি বর্ণের এবং নম্র বা রুক্ষ ও ভাল বা মন্দ প্রকৃতির হয়ে থাকে।

একবার আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাসূলুল্লাহকে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বাচ্চা কি ভাবে মা কিংবা বাপের অনুরূপ হয়? তিনি জবাব দিলেন, বাপের বীর্য যদি অগ্রগামী হয়, তা হলে বাপের অনুরূপ হয় এবং মায়ের বীর্য অগ্রগামী হলে মায়ের অনুরূপ হয়। তেমনি সবাই জানে, বিষ পানে কিংবা তরবারীর ঘায়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে। মায়ের জরায়ুতে বীর্য প্রবিষ্ট হলে সন্তান জন্ম নেয়। তরকারী ও গাছ পালা কর্ষণ ও পানি সিঞ্চনে উৎপন্ন হয়।

ঠিক এ শক্তির উপস্থিতির কারণেই মানুষকে (শরীয়তের) দায়িত্ব চাপানো হয়েছে। আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে তাদের পুরস্কার ও তিরস্কারের যোগ্য বিবেচনা করা হয়েছে।

আল্লাহার সৃষ্ট এ প্রাকৃতিক শক্তি কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। এক, যে শক্তি জড় উপাদানের গুণাগুণ (তাপ, শুষ্কতা, আর্দ্রতা ইত্যাদি) সৃষ্টি করে। দুই, রূপান্তর ও শ্রেণীভেদের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক যে শক্তিকে সক্রিয় রেখেছেন। তিন, যে শক্তি জড়জগতে আত্মপ্রকাশের পূর্বে ছায়া জগতে সব কিছুর বিকাশ ঘটায়। চার, পরিমার্জিত ও পুণ্য চরিত্রের মানুষের জন্য উচ্চতম পরিষদের মনে-প্রাণে দোয়া ও তাদের পরিপন্থীদের জন্য মনে-প্রাণে বদ দোয়া থেকে যে শক্তির উদ্ভব হয়। পাঁচ, শরীয়ত তথা আল্লাহর বিধি-নিষেধের শক্তি। যে শক্তির প্রভাবে তার অনুসারীরা সাফল্য অর্জন করে ও উপেক্ষাকারীরা ব্যর্থতার মুখ দেখে।

ছয়, যে শক্তি সৃষ্টির কারণ হয়ে আসে। আল্লাহ পাক কোন কিছু সৃষ্টি হওয়ার নির্দেশ জারী করলে তার কারণটি আগে সৃষ্টি হয়। এ কারণটি শক্তিরূপে সৃষ্টির কাজ দেয়। আল্লাহ চান সৃষ্টিজগতটি কার্যকারণ শৃংখলে আবদ্ধ থাক। অন্যথায় বিশৃংখল অবস্থা সৃষ্টিজগত ধ্বংস করে দেবে। এ ষষ্ঠ শক্তির উদাহরণ প্রসংগে নবীর (সঃ) এ বক্তব্য নেয়া যায়, 'আল্লাহ যদি চান

অমুক ব্যক্তির অমুক স্থানে মৃত্যু হোক, তখন তার সেখানে পৌছার একটি কারণ সৃষ্টি হয়ে যায়।

এ সব কথা হাদীস ও যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা সুপ্রমাণিত হয়ে আছে। (১)

জানা প্রয়োজন, যে সব মাধ্যম শক্তির ভিত্তিতে তিনি নিজ মর্জী ও নির্দেশ কার্যকরী করেন, কখনও সেগুলো পরস্পর বিরোধী সংঘাতে লিপ্ত হয়। তখন তিনি যে শক্তির প্রাধান্য লাভ অধিকতর মংগলদায়ক মনে করেন, সেটাকে জয়ী করেন। হাদীসে যে রয়েছে, দাঁড়ি পাল্লা আল্লাহর হাতে রয়েছে এবং যে পাল্লা ভারী করতে চান সেটাই ভারী হয় এবং আল্লাহ যে বলেছেন, স্রষ্টা সতত সৃজনশীল কাজে নিরত বা ব্যস্ত, এ দুটো বক্তব্যের তাৎপর্য এটাই।(২)

কখনও শক্তির প্রাধান্য হয় উপকরণের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে। কখনও তা হয় কল্যাণ-শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের কারণে। কখনও সৃষ্টিকে ব্যবস্থাপনার ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে শক্তির পারস্পরিক দ্বন্দ্বে একটির ওপর অপরটি প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

আমরা শক্তির দ্বন্দ্বের সময়ে ভালভাবে জানতে পাইনা, কোনটি এ ক্ষেত্রে সঠিক। তবে যেটা জয়ী হয়ে রূপলাভ করে, সেটাকে নিঃসন্দেহে সঠিক ভাবতে পারি। এর ভেতরেই কল্যাণ নিহিত। আমার এ বক্তব্যটি ভেবে-চিন্তে দেখলে এর থেকে অনেক সমস্যা ও জটিলতারই সমধান পাওয়া যাবে।

১। সব কথার সার কথা হল এই, আল্লাহ এ সব স্বনির্ধারিত প্রাকৃতিক রীতি বা শক্তির মাধ্যমে কাজ করে থাকেন। কেউ কাউকে তরবারীর আঘাত করলে তিনি মৃত্যু দান করেন। বীর্য ছাড়া সন্তান উৎপাদনের শক্তি আল্লাহর থাকা সত্ত্বেও সেটাকেই তিনি এ জগতে মানব জন্মের মাধ্যম করেছেন।

২। উক্ত শক্তি বা কারণ সম্পর্কে আরেকটি মত হল এই যে, (১) জড় উপাদানের গুণাগুণ। যেমন, আগুন তাপ দেয় ও পানি শীতল করে। স্মর্তব্য যে, তাপ দেয়া বা ঠাণ্ডা করা আল্লাহর কাজ এবং আগুন ও পানি আল্লাহর সৃষ্ট কারণ। (২) বায়ুর শুষ্ককরণ শক্তির মত বিভিন্ন উপাদানের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য (৩) কল্যাণ বা অকল্যাণ সৃষ্টিকারী উচ্চতম পরিষদের দোয়া ও বদদোয়া (৪) দুঃখ ও শান্তি সৃষ্টিকারী আল্লাহর শরীয়তের বিধি-নিষেধ।

গ্রহ-নক্ষত্রের শক্তি সম্পর্কে বলা চলে, এর গতিবিধি দ্বারা গরম-ঠাণ্ডা বা দিন-রাতের হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়ার মত সাধারণ কাজ অবশ্যই ঘটে থাকে। তেমনি জোয়ার ভাটাও দেখা দেয়। হাদীসে আছে, "যখন ভোরের তারা দেখা দেয়, সূর্য বিদায় নেয়।" অর্থাৎ এটাই রীতি। কিন্তু এ সবের প্রভাবে ধনী-গরীব হওয়া, দুঃখ-সুখ পাওয়া কিংবা দুর্ভিক্ষ-মহামারী দেখা দেয়ার কোন শরীয়ত সম্মত প্রমাণ নেই। মহানবী (সঃ) বরং এ সব নিয়ে মাথা ঘামাতেও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'জ্যোতিষী হওয়া ও যাদুকর হওয়া একই কথা' (হারাম পেশা)। আরবের জাহেলরা যে বলত, অমুক গ্রহ বা নক্ষত্রের উদয় বা অস্তের কারণে বৃষ্টি হয়েছে, তিনি তার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন।

এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই, মহানবীর (সঃ) শরীয়ত এ কথা কোথাও বলেনি যে, গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধির ভেতর আল্লাহ এমন কোন শক্তি রাখেননি যা প্রকৃতির বিবর্তনের লীলায় কোনই অংশ রাখেনা। তবে এটাও ঠিক যে, মহানবী (সঃ) জ্যোতিষী হতে নিষেধ করেছেন। জ্যোতিষী বা গণকদার জীনদের কাছে জিজ্ঞেস করে করে অজানা খবর জানত। তাই তিনি জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া ও তাদের কথার ওপর বিশ্বাস করাকে অত্যন্ত খারাপ জানতেন। জ্যোতিষীর কার্যকলাপ সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলতেন, ফেরেশতারা যখন আকাশে আল্লাহর কোন সিদ্ধান্ত আলোচনা করেন, শয়তান তখন সে খবর আড়ি পেতে শুনে নিয়ে পালায় এবং (ভক্ত) জ্যোতিষীদের তা শুনায়। জ্যোতিষী সেই একটি সত্যের সাথে একশ মিথ্যা মিলিয়ে লোকদের শুনায়।

আল্লাহতা'লা বলেন, হে ঈমানদার সমাজ! যারা কুফরী কাজ করল তাদের মত হয়োনা। আর তোমাদের সেই ভাইদের মত হয়োনা যারা তোমাদের ব্যাপারে বলল, যদি তারা অভিযানে গিয়ে যুদ্ধে অংশ না নিয়ে আমাদের কাছে থাকত, তা'হলে মারা যেতনা, নিহত হতনা।

মহানবী (সঃ) বলেন, তোমাদের ভাল কাজই শুধু তোমাদের জান্নাত দেবেনা (আল্লাহর দয়া ছাড়া)। তিনি আরও বলেন, তুমিই তো একমাত্র দয়ালু বন্ধু। তুমি তো দয়ার হাত বাড়িয়েই রয়েছ।

মোটকথা জ্যোতিষ শাস্ত্র নিষিদ্ধ করার ভেতর অজস্র কল্যাণকর উদ্দেশ্য রয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাণের রহস্য

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ * قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ * وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً *

সূরা বনিইস্রাঈল ঃ আয়াত ৮৫

"(হে মুহাম্মদ!) জনতা তোমার কাছে প্রাণের রহস্য জানতে চাইছে? তুমি বলে দাও, প্রাণ আল্লাহর নির্দেশ বৈ কিছুই নয় বরং তোমাদের খুব নগণ্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।" (১৭ ঃ ৮৫)

ইবনে মাসউদের বর্ণনায় তিনি اُوْتِيْتُمْ স্থলে وَاُتُوْ পাঠ করেছেন। তার অর্থ দাঁড়ায় 'তাদের নগণ্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে।' এই 'তাদের' থেকে বুঝা যায়, প্রশ্নকারীরা ইহুদী ছিল। তা ছাড়া এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলেনা যে, মুসলমানদের কেউ প্রাণের রহস্য জানতেন না। কিছু লোকের অবশ্য সেরূপ ধারণা রয়েছে। শরীয়ত প্রবর্তক যে ব্যাপারে চুপ ছিলেন, সে ব্যাপারে কারো কিছু জানা সম্ভবই নয়, এটা ভুল কথা। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে শরীয়ত দাতা এ জন্য নীরব ভূমিকা নিয়েছেন যে, সেরূপ সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয় দু'চারজনে বুঝলেও সর্ব সাধারণের বোধগম্য হবেনা।

আপনার জানা প্রয়োজন, প্রাণের রহস্য আপনি সর্বপ্রথম যতটুকু বুঝতে পারেন তা হল এই, প্রাণী জগতের আয়ুষ্কালের ভিত্তি ও উৎসই হল প্রাণ। যতক্ষণ তা যে প্রাণীর দেহে অবস্থান করে, সেটা জীবিত থাকে এবং যখনই প্রাণ দেহ ছেড়ে চলে যায়, প্রাণীটি মারা যায়।

আরও একটু গভীরে তলিয়ে দেখতে পাবেন, দেহের ভিতর সূক্ষ্ম ও হাল্কা উষ্ণতার অস্তিত্ব মিলে। রক্ত, পিত্ত, কফ ইত্যাকার দেহের চার

চীজের নিখুঁত ও নির্ভুল সংমিশ্রণে তা কলবের ভিতর জন্ম নেয়। তারপর তা অনুভূতি, গতি ও বোধ শক্তির ধারককে (দেহকে) রুজীর আহরণে বয়ে চলে এবং তাতে চিকিৎসাদিরও দখল থাকে।

অভিজ্ঞতা থেকে আরও জানা যায়, সেই উষ্ণ পিণ্ড হাল্কা ও ভারী এবং পরিচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন হওয়া নির্ভর করছে উপরি বর্ণিত শক্তিগুলোর ওপর। উক্ত শক্তিগুলো থেকে যে প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তার প্রতিক্রিয়া সেটার ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

এ জানা যায়, যখন সেই উষ্ণপিণ্ডের জন্ম ও রূপ লাভের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন অংগে কোন বিপত্তি দেখা দেয়, তখন উষ্ণপিণ্ডেও গোলযোগ দেখা দেয়। এও জানা যায় উষ্ণ পিণ্ডের জন্ম লাভ জীবনের ও মিটে যাওয়া মৃত্যুর কারণ হয়। ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে তো মনে হয় এ উষ্ণ পিণ্ডই প্রাণ। কিন্তু যদি গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যায়, তা'হলে বুঝা যায়, সেটা প্রাণের নিম্নতম স্তর মাত্র। ফুলের সাথে ঘ্রাণের যে সম্পর্ক কিংবা আগুনের সাথে কয়লার, শরীরের সাথে তার ততটুকু সম্পর্ক।

আরও গভীরে তলিয়ে দেখলে বুঝা যায়, এ উষ্ণপিণ্ড প্রাণ নয়, বরং মূল প্রাণের ধারক বা খোলস এবং শরীরের সাথে তার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম বস্তু। তার প্রমাণ হল এই, আমরা বারংবার দেখছি শিশু যুবক এবং যুবক বৃদ্ধ হয়। তেমনি তার শরীরের মৌল উপাদান রক্ত, কফ, পিত্ত ইত্যাদি পরিবর্তন হয়ে চলে। তাই তার সংমিশ্রণে যে প্রাণের অস্তিত্ব দেখতে পাই তা আগের চাইতে বহুগুণ বেড়ে যায়। আবার দেখি, শিশু ছোট থেকে বড় হয়, কালো কিংবা সাদা হয়, আলেম কিংবা জাহেল হয়। এভাবে তার অবস্থার বহুবিধ বিবর্তন ঘটে, অথচ ব্যক্তিত্বটি একই থেকে যায়।

এখানে যদি কেউ (তার অবস্থা পরিবর্তন হওয়া বা না হওয়া নিয়ে) তর্ক-বিতর্ক চালায় তো আমি জবাবে বলব, এ পরিবর্তনটি আমি ধরে নিয়েছি মাত্র। নইলে এতে তো সন্দেহ নেই যে, তার অবস্থার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হতেই থাকে। অথচ ব্যক্তিটি একই থেকে যায়। কিংবা এ ভাবে জবাব দেব যে, শিশুটির নিজ অবস্থানে বহাল থাকা তো মেনে নেব, কিন্তু তার অবস্থা নিজ অবস্থানে বহাল থাকতে পারেনা। এ থেকেই প্রমাণিত হল, শিশুটি আসল বস্তু ও তার অবস্থা নকল বস্তু।

সুতরাং এটাই সুপ্রমাণিত হল, যে বস্তুর অস্তিত্ব মানুষকে জীবিত রাখে তা উক্ত প্রাণ বা উষ্ণপিণ্ড নয়। তেমনি দেহ তো নয়ই। ব্যক্তিত্বটিও নয়, যা বাহ্যত মনে হয়। বরং প্রাণ হল সংমিশ্রণ মুক্ত একক ও স্বতন্ত্র এক জিনিস। তা হল এমন এক নূর বিন্দু বা আলোকপিণ্ড যা পরিবর্তনশীল অবস্থা কিংবা বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বতন্ত্র। এ আসল প্রাণ সত্তাটি ছোট ও বড়র, কালো ও সাদার ও অন্যান্য বিপরীত ধর্মী বিভিন্ন অবস্থার ভেতর একই রকম থাকে। কোনরূপ বিবর্তন বা বিভক্তি স্বীকার করেনা।

অবশ্য সেই আসল প্রাণ সত্তার সম্পর্ক (বাহ্য দৃষ্টির প্রাণ সত্তা) তাপপিণ্ডের সাথেই রয়েছে। সেটার কারণেই দেহের অস্তিত্ব বিরাজমান থাকে। কারণ, দেহ তো উষ্ণপিণ্ড সৃষ্টির চার উপাদান থেকেই অস্তিত্ববান। পক্ষান্তরে মূল প্রাণ জগতের এমন একটি খিড়কী যে পথে সে যে যে উপাদানে জড় প্রাণের সৃষ্টি তা সবই সেখান থেকে পেয়ে যায়। এখন থেকে গেল বিবর্তনের বিবরণী। পার্থিব উপাদানের সেটাই স্বভাব। দেখুন, রোদ ও রোদের তাপ ধোপার ধোয়া কাপড় শুকিয়ে সাদা করে, অথচ ধোপাকে পুড়ে কালো করে। এও তেমনি ব্যাপার।

আমার বিশুদ্ধ মন ও মননের এটাই সিদ্ধান্ত যে, দেহে যদি জড় প্রাণের উৎপাদন শক্তি না থাকে, তাহলে জড় প্রাণ সেখান থেকে বিদায় নেয়। এরই নাম মৃত্যু! জড় প্রাণ থেকে মূল প্রাণের বিচ্ছেদের নাম মৃত্যু নয়। তাই যখন ধ্বংসকারী ব্যাধিতে জড় প্রাণ তথা তাপপিণ্ড হাওয়া হয়ে যায়, তখনও আল্লাহর কৌশলগত কারণে মূল প্রাণ দেহের সাথে সম্পর্ক রেখে চলে। আপনি যদি কোন শিশির বায়ু ষোল আনা বের করে ফেলার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস চালান, এমনকি বায়ু আকর্ষণ করতে গিয়ে শিশি ভেংগে ফেলারও উপক্রম করেন, তথাপি তাতে কিছু না কিছু বায়ু থেকেই যাবে। তা আবার শিশিতে ছড়িয়ে জড়িয়ে যাবে। এটুকুই তো বায়ু প্রকৃতির গূঢ়তম রহস্য বা অপরিবর্তনীয় ও অখণ্ড সত্তা। তেমনি যৌগিক প্রাণের মূলেও এক রহস্যময় অপরিবর্তনীয় ও অবিভাজ্য সত্তা রয়েছে এবং সেটাই মৌলিক প্রাণ।

মৌলিক প্রাণের নির্ধারিত এক সীমা ও পরিমাপ রয়েছে। তার

ব্যতিক্রম হতে পারে না। মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার যৌগিক প্রাণ অন্যরূপ ধারণ করে। তখন মৌলিক প্রাণের কারণে তার যৌথ অনুভূতির যতটুকু অবশিষ্ট থাকে, ছায়া জগতের সাহায্যে তা এরূপ শক্তি অর্জন কর যে, দেখা, শোনা ও কথা বলার সব কাজই তাতে সম্ভব হয়। অর্থাৎ দেহ তখন এক অবচেতন মনের অধিকারী হয়।

নভোমণ্ডলীতে একই ধরনের শক্তি কাজ করছে। তাই যৌগিক প্রাণ ছায়াজগতের প্রভাবে আলো কিংবা আঁধারের পরিচ্ছদে ভূষিত হওয়ার ক্ষমতা লাভ করে। এ থেকে অন্তর্বর্তী জগতের (আলমে বরযখ) অদ্ভুত ঘটনাবলী সম্ভব হয়। তারপর যখন ইস্রাফীলের শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে (যেভাবে শিংগায় সুর ধ্বনি দিয়ে দেহজগতে প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়ে সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখার স্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়েছিল) তখন মৌলিক প্রাণের (আমরুল্লাহ) প্রভাবে সেটাকে দেহরূপ ভূষণ কিংবা ছায়া ও কায়াজগতের মাঝামাঝি ধরনের এক দেহে দান করা হবে।

তারপর থেকে শুরু হবে সত্য সংবাদ দাতার সংবাদগুলোর একের পর এক বাস্তবায়ন। যেহেতু যৌগিক প্রাণের সংযোগ রয়েছে মৌলিক প্রাণের সাথে, তাই এ প্রাণ ইহ ও পরকাল দুটোর প্রভাব লাভ করবে। আত্মিক জগতের সাথে সংযোগ তার ভেতর ফেরেশতাসুলভ স্বভাব জন্মাবে এবং জড় জগতের প্রভাব তার ভেতর পশুসুলভ স্বভাবের উদ্ভব ঘটাবে।

প্রাণ (রূহ) তত্ত্ব সম্পর্কে ভূমিকা আলোচনা করেই আমার ক্ষান্ত হওয়া উচিত। এ বিষয়ের এ মূল তত্ত্বটুটু মেনে নেয়ার পর এর শাখা-প্রশাখা বিন্যাস ও বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন। আর তা এর চাইতে কোন উন্নততর বিষয়ের আলোচনায় প্রসংগত এর সব রহস্যজাল ছিন্ন হবার আগেই হওয়া চাই।

॥ *দায়িত্ব তত্ত্ব* ॥

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا * لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا *

সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৭২-৭৩

"আমি নভঃমণ্ডলী, পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বতের সামনে আমার আমানত পেশ করলাম। তারা সে দায়িত্ব বহন করতে অস্বীকার করল। তারা ভয় পেয়ে গেল। অথচ মানুষ সে দায়িত্ব নিল। কারণ, তারা বড়ই জালিম ও জাহিল। এটা এ কারণেই ঘটল যে, আল্লাহ মুনাফিক ও মুশরিক নর-নারীকে শাস্তি দেবেন এবং মু'মিন নর-নারীকে অনুগ্রহীত করবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

ইমাম গাজ্জালী ও ইমাম বায়জাবী (রঃ) প্রমুখ এটা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ আয়াতের 'আমানত' অর্থ হল 'আল্লাহ দত্ত দায়িত্ব'। আকাশ ও পৃথিবীর অন্য সবাই সভয়ে এ দায়িত্ব পরিহার করেছে। মানুষ এ দায়িত্ব বুঝে নেয়ার কারণেই আল্লাহর আনুগত্যের জন্য যেমন পুরস্কার পাবে, তেমনি তাঁর নাফরমানির জন্য শাস্তিও পাবে। অন্যান্যের কাছে এ দায়িত্ব পেশ করার উদ্দেশ্য হল তাদের যোগ্যতা যাচাই করে নেয়া। তাদের অস্বীকার থেকে প্রমাণিত হয়, এত বড় গুরুদায়িত্ব বহনের শক্তি ও সাহস তাদের নেই। মানুষ তা গ্রহণ করে নিজেদের যোগ্যতম বলে প্রমাণ দিল।

এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই, এখানে আল্লাহ পাকের 'মানুষ বড়ই জালিম ও জাহিল' মন্তব্যটি মানুষের যোগ্যতার কারণ ইংগিত করেছে। জালিম তাকেই বলা হয়, ইনসাফ করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি জুলুম করে। তেমনি জাহিল তাকেই বলা যায়, জ্ঞানার্জনের যোগ্যতা নিয়ে যে ব্যক্তি মূর্খ থাকে। বস্তুত মানুষ ছাড়া সব সৃষ্টিই হয় শুধু আলিম ও

আদিল। তাদের ভেতর অত্যাচার ও মূর্খতার কোন স্থানই নেই। যেমন, ফেরেশতা। নয় তারা শুধুই জালিম ও জাহিল। ইলম্ ও আদ্লের কোন যোগ্যতাই তাদের নেই। যেমন, চতুষ্পদ জন্তু। সুতরাং উক্ত আমানত গ্রহণের যোগ্যতা কেবল তাদেরই থাকতে পারে যাদের ক্ষমতা প্রকৃতিজাত নয়, উপার্জনক্ষম। তারপর আয়াতে ليعذب শব্দের 'লাম' পরিণতি অর্থে এসেছে। অর্থাৎ দায়িত্ব গ্রহণের পরিণতি হল সুখ ও দুঃখ।

এক্ষণে যদি আপনি সঠিক ব্যাপার বুঝতে চান, তা হলে প্রথমে ফেরেশতার কথাই খেয়াল করুন। ফেরেশতাদের না আছে ক্ষুৎ-পিপাসা, না ভয়-ভাবনা। তেমনি জৈবিক লালসা, রাগ, অহংকার ইত্যাকার বলতে কিছুই নেই। তাদের রুজী রোজগার কিংবা স্বাস্থ্য রক্ষার বালাই নেই। এক কথায় জীবজগতের কোন প্রয়োজনেরই তাঁদের পরোয়া নেই। তারা সব প্রয়োজনের উর্ধে থেকে শুধু আসমানী ফরমান পালনের অপেক্ষায় থাকেন। তাই কোন বাঞ্ছিত বিধান প্রবর্তনের কিংবা বিরূপ বা অনুকূল মনোভাব গ্রহণের ঐশী নির্দেশ পাওয়া মাত্র সংগে সংগে তারা মনে-প্রাণে তা বাস্তবায়নের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন।

এবারে পশুদের কথা খেয়াল করুন। সেগুলোর অবস্থা কত শোচনীয়। কতশত মন্দ স্বভাবের পশুদের সাথে তারা আষ্টেপিষ্টে জড়িত। তারা জৈবিক আনন্দ ছাড়া কিছুই বুঝেনা। তাই বস্তুগত স্বার্থ, ভোগ-লালসা ও উত্তেজনার উত্তাল তরংগে তারা ডুবে থাকে।

অবশেষে মানুষের দিকে লক্ষ্য করুন। আল্লাহ পাক তাঁর পরিপূর্ণ কৌশল প্রয়োগ দ্বারা মানুষের ভেতর পরস্পর বিরোধী দুটো শক্তিরই সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

এক, ফেরেশতা প্রকৃতি (বিবেক)। এ প্রকৃতি মানুষের মৌলিক প্রাণ থেকে প্রেরণা পায় এবং সেই প্রাণ থেকে তার মৌলিক প্রাণকে অহরহ প্রেরণা যোগায় (যৌগিক প্রাণ মানুষের গোটা দেহে ছড়িয়ে থাকে)। মৌলিক প্রাণের প্রেরণা গ্রহণই ফেরেশতা প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এবং তার ওপরেই সে প্রেরণা প্রাধান্য বিস্তার করে।

দুই, পশু প্রকৃতি (প্রবৃত্তি) অন্য সব পশুর ভেতর যে জৈব প্রবৃত্তি রয়েছে

সেটাই মানুষের পশু প্রকৃতির ভিত্তি ও উৎস। যে চার উপাদানে মানুষের যৌগিক প্রাণের সৃষ্টি, এ প্রকৃতিতেও তা বর্তমান। পশু প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। মৌলিক প্রাণও তার নির্দেশ মেনে নেয়।

এও স্মরণ থাকা চাই, এ দুই শক্তির ভেতর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব চলে। কখনও বিবেক প্রবৃত্তিকে ওপরে টানতে চায়। কখনও আবার প্রবৃত্তি বিবেককে টেনে নিচে নামাতে চায়। সেক্ষেত্রে বিবেক পরাজিত হলে প্রবৃত্তির প্রভাব প্রকাশ পায় এবং প্রবৃত্তি পরাজিত হলে বিবেকের প্রভাব প্রকাশ পায়। আল্লাহ পাক তো দুটোই প্রকাশের সুযোগ দেন। উপার্জনকারী যেটাই উপার্জন করতে চায়, তিনি সাধারণত সেটা দেন। যদি কেউ পশু স্বভাবের প্রাধান্য দিতে চায়, আল্লাহ তার পথ খুলে দেন। পক্ষান্তরে কেউ যদি ফেরেশতা প্রকৃতির প্রাধান্য রাখতে চায়, আল্লাহ পাকও তাকে তার ব্যবস্থা করে দেন। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى * وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى * فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى *

সূরা লাইল ঃ ৫-১০

"আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি দান করে ও আল্লাহকে ভয় করে এবং ন্যায় কাজকে সমর্থন করে, আমি তার জন্য পুণ্য কাজ সহজ করে দেই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কার্পণ্য করে ও আল্লাহকে ভয় করেনা এবং সত্যপথকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করে, আমি তার জন্য পাপ কাজ সহজ করে দেই।"

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন ঃ

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ؕ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا *

সূরা বনী ইস্রাঈল ঃ ২০

"হে মুহাম্মদ! তোমার প্রভুর অবদানে আমি দলমত নির্বিশেষে ধন্য করে থাকি। এদলকেও দেই, ও দলকেও দেই। কারণ, তোমার প্রভু ইহলোকে তাঁর দান-দাক্ষিণ্য কারো জন্য বন্ধ রাখেন না।"

প্রত্যেক শক্তি বা প্রকৃতিতেই সুখ ও দুঃখ রয়েছে। নিজ প্রকৃতির অনুকূল ব্যাপারের অনুভূতিকে বলে সুখ এবং প্রতিকূল ব্যাপার সহ্য করার নাম দুঃখ। দেখুন, মানুষকে যখন অবশ (ক্লোরোফর্ম) করার মত কিছু প্রয়োগ করা হয়, তখন কোন কিছুই তাকে কষ্ট দিতে পারে না। যদি তার কোন অংগ আগুনে জ্বালানো হয় তা সে টের পাবেনা। কিন্তু যখন তার অবশ অবস্থা কেটে যায়, এবং পুনরায় অনুভূতি ফিরে আসে তখন কিরূপ কষ্ট দেখা দেয় তাও জানেন।

মানুষের অবস্থার সাথে গোলাপ ফুলের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। চিকিৎসকরা বলেছেন, তার ভেতর তিনটি শক্তি বিদ্যমান। এক, মৃত্তিকা প্রকৃতি। ঘষে দিয়ে গায়ে লাগালে তা প্রকাশ পায়। দুই, জলীয় প্রকৃতি । চিপে পান করলে তা জানা যায়। তিন, বায়বীয় প্রকৃতি। তার পরিচয় ঘ্রাণেই মিলে।

এ সব আলোচনা থেকে জানা গেল, মানুষের যোগ্যতাই দায়িত্ব দাবী করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের যে দায়িত্ব দিয়ে জবাবদিহির ব্যবস্থা করেছেন সেটা তাদের দাবীরই অনুকূল। তেমনি তাদের ভেতরকার ফেরেশতা প্রকৃতি (বিবেক) এ দাবীই জানায়, তার অনুকূল ও উপযোগী কাজগুলো তার জন্য ফরজ (অপরিহার্য) করা হোক এবং প্রতিকূল ও অনুপযোগী পশু প্রকৃতির কাজগুলো হারাম (অবৈধ) করা হোক। তা হলেই সে শাস্তি থেকে বেঁচে গিয়ে শান্তি লাভ করতে পারবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দায়িত্ব মানুষের বিধিলিপি

এ কথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্র এ সৃষ্টিজগতে এমন অজস্র নিদর্শন রয়েছে যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে বেশ বুঝা যায়, আল্লাহ্ পাক যে তাঁর বান্দাদের শরীয়তের বিধি-নিষেধ পালনের দায়িত্ব দিয়েছেন তার ভেতর বহু কল্যাণকর উদ্দেশ্য রয়েছে। তাঁর কাছে এর সমর্থনে সকল যুক্তি-প্রমাণও রয়েছে।

এখন একবার গাছের পাতা, ফুল ও ফলের দিকে তাকান। তা দেখে এবং স্বাদ ও গন্ধ নিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়, তার দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। দেখতে পাবেন, প্রত্যেক ধরনের পাতাকে আল্লাহ্ বিশেষ রূপ দিয়েছেন। প্রত্যেক জাতীয় ফুলকে দিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন রঙ ও ঘ্রাণ। প্রত্যেক প্রকারের ফলকে দিয়েছেন স্বতন্ত্র স্বাদ। এ থেকে কোন্‌টি কোন্ গাছের পাতা, কিসের ফুল ও কোন্ ফল তা সহজেই বলা যায়। এ সবগুলোই শ্রেণীরূপের অন্তর্গত। যে সূত্র থেকে যেভাবে শ্রেণী বিন্যাস হয়ে থাকে, এগুলো সেখান থেকেই একই ভাবে বিন্যস্ত হয়।

আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রত্যেক প্রকারের গাছের জন্য বিশেষ উপাদান নির্ধারিত হয়ে আছে। যেমন, খেজুর গাছের জন্য বিশেষ ধরনের মাটি তিনি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তারপর মোটামুটিভাবে বলে দিয়েছেন, এ উপাদান খেজুরের রূপ নিয়ে আত্ম প্রকাশ করবে। অবশেষে বিস্তারিত ফরমানে বলা হল, খেজুরের পাতা এরূপ, ফল ওরূপ ও বীচি সেরূপ হবে।

প্রত্যেক শ্রেণীর কিছু বৈশিষ্ট্য তো সামান্য বুদ্ধি যার রয়েছে সে-ই বলতে পারে। কিন্তু কিছু বৈশিষ্ট্য এরূপ সূক্ষ্ম হয় যা বিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া কেউ জানতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে ইয়াকুতের এক বিশেষ প্রভাবের কথা ধরে নিন। যার হাতে ইয়াকুত থাকে, অন্তরে তার আনন্দ ও সাহস বেড়ে যায়। ইয়াকুতের এ বৈশিষ্ট্যটি সাধারণতঃ কেউ দেখে না।

কোন কোন শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলো তার গোটা সত্তার ভেতর পাওয়া যায়। তা ঘটে উপাদানের উপযুক্ততার জন্য (উপাদানের দুর্বলতার কারণে একই শ্রেণীর ফলফুলের ভেতর তারতম্য ঘটে)। তেমনি কোন শ্রেণীর কিছু সত্তায় সব বৈশিষ্ট্য থাকে, কিছু অংশে থাকে না। হালীলা ফল মুঠোয় নিলে এ সত্যটি সহজ হয়ে ধরা দেয়।

খেজুর এরূপ কেন এ কথা বলতে পারেন না। এ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, সেটা যেরূপ আছে তা-ই থাকবে। এর কারণ জানতে চাওয়ার পালা নেই।

তারপর আপনি যদি পশুর শ্রেণীগুলোর দিকে দৃষ্টি দেন, সেখানেও মাছের মতই প্রতিটি শ্রেণীর পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য দেখতে পাবেন। সঙ্গে সঙ্গে এও দেখতে পাবেন, তাদের ভেতর এমন কতগুলো স্বতঃস্ফুর্ত ও প্রকৃতিগত ব্যাপার দেখা যায় যা থেকে সহজেই এক শ্রেণী হতে অপর শ্রেণীর পার্থক্য

সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। যেমন গৃহপালিত গরু, ছাগল ইত্যাদি ঘাস খায় ও চর্বিত চর্বন করে। অথচ ঘোড়া, খচ্চর ইত্যাদি তৃণজীবি হয়েও চর্বিত চর্বন করে না। হিংস্র জন্তুরা গোস্ত খেয়েই বাঁচে। পাখীরা উড়ে বেড়ায়। মাছ পানিতে সাঁতরায়। প্রত্যেক শ্রেণীর পশুর কণ্ঠস্বর ভিন্ন। সংগম ও দাম্পত্য পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন। বাচ্চা পালন ও ডিম প্রদানের রীতিও স্বতন্ত্র। এ সব সবিস্তারে বলতে গেলে গ্রন্থের কলেবর বেড়ে যাবে।

এরপর দেখি, প্রত্যেক শ্রেণীর ভেতর যতটুকু স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফুর্ত জ্ঞান রয়েছে যা তার একান্ত প্রয়োজন ও তার জন্য কল্যাণকর। এ সব হচ্ছে আল্লাহ্‌রদত্ত জ্ঞান। শ্রেণী বৈশিষ্ট্যের ছিদ্র পথে তার আগমন। ফুলের রঙ ও রূপ এবং ফলের স্বাদ ও ঘ্রাণ যেরূপ শ্রেণী বিশেষের সাথে জড়িয়েই আবির্ভূত হয়, এও তেমনি এসে থাকে।

কোন শ্রেণীতে শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যগুলোর সর্বত্র উপস্থিতি দেখা যায়। অথচ কোন শ্রেণীতে কিছু সংখ্যকের ভেতর পাওয়া যায় ও কিছু সংখ্যকের ভেতর পাওয়া যায় না। তার মূলে রয়েছে উপাদানের উপযোগিতা কিংবা দুর্বলতা। তবে শ্রেণী বিশেষের প্রত্যেকটি সত্তাই বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণের যোগ্যতা রাখে। বৈশিষ্ট্যে ব্যতিক্রমের অন্যতম উদাহরণ হল মধু মক্ষিকার রাজা ও গৃহপালিত তোতাপাখী। নিজ নিজ শ্রেণী থেকে তারা স্বতন্ত্র বৈশিস্ট্য পেয়ে থাকে।

মানুষের দিকে লক্ষ্য করলেও আপনি গাছপালা ও জীবজন্তুর মতই কতগুলো সাধারণ বৈশিস্ট্য সেখানে দেখতে পাবেন। যেমন, জন্ম নেয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, কাশী দেয়া, হাই তোলা, পায়খানা-প্রস্রাব করা, জন্ম নিয়ে মাতৃস্তন্য পান করা ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্যও পাবেন যেগুলো মানব জাতিকে অন্যান্য জাতীয় সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। যেমন, কথা বলা ও বুঝা, ভূমিকা বুঝেই বিষয়জ্ঞান অর্জন করা, সাধনা ও গবেষণা চালিয়ে বুদ্ধি-বিবেকের সাহায্যে গভীর তত্ত্বজ্ঞান হাসিল করা, বস্তুগত ধ্যান-ধারণার বাইরের বস্তুকে উন্নত জ্ঞানের সাহায্যে জেনে নেয়া (সভ্যতা ও দেশ, জাতি ও ব্যক্তি সংস্কার পদ্ধতি ইত্যাদি)। এ ব্যাপারগুলো যেহেতু মানুষের জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও জন্মগত উত্তরাধিকার, তাই জংগল বা পাহাড়ের চুড়ায় বসবাসকারী মানুষের কাছেও তার পরিচয় মিলে। এও

হচ্ছে আল্লাহ্র শ্রেণী বিন্যাসের জন্য নির্ধারিত বিশেষ উপাদানের বৈশিষ্ট্য। আসল তত্ত্ব হল এই, মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য বা স্বভাবের দাবী হল এই, তার রিপুর ওপরে অন্তরের ও অন্তরের ওপরে বুদ্ধির প্রাধান্য থাকা চাই।

তারপর লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্ পাক প্রতিটি শ্রেণী বিন্যাসে কত কলা-কৌশল ও অনুগ্রহ-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। গাছ-পালায় যেহেতু গতি ও অনুভূতির উপাদান অবর্তমান, তাই তার শিকড়কে এত শক্তি দান করেছেন যে, হাওয়া, মাটি, আলো ইত্যাদি সংযোগে সৃষ্ট প্রয়োজনীয় উপাদান সে সংগ্রহ করে তার শাখা-প্রশাখা শ্রেণীগত চাহিদা মোতাবেক বর্দ্ধন করে দেয়। পক্ষান্তরে জীব-জন্তু যেহেতু অনুভূতিশীল, মর্জী মাফিক তারা চলতেও পারে, তাই তাদের মাটি থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান চুষে খাবার শিকড় দেয়া হয় নি। বরং তাদের আল্লাহ্দত্ত জ্ঞান হল এই, ঘাস, পাতা ও পানি যেখানে পাবে, খুঁজে ফিরে খাবে। এ ভাবে তাদের অন্যান্য প্রয়োজন মিটাবার বুদ্ধিও দেয়া হল। যে সব শ্রেণী মাটি থেকে পোকার মত জন্ম নেয় না, তাদের আল্লাহ্ পাক সন্তান উৎপাদন, ধারণ প্রসব ও পালনের শক্তি দান করলেন। সন্তানদাত্রীর ভেতর এমন তরল পদার্থ দিলেন যা পেটের সন্তান পালনে ব্যয় হতে পারে। তারপর সেই তরল পদার্থকে দুধে পরিণত করা হল এবং বাচ্চাকে ইলহাম করা হল বুক চুষে তা পান করার জন্য। চোষার ফলে দুধ তার কণ্ঠনালী পেরিয়ে পাকস্থলীতে চলে গেল।

তেমনি মুরগীর ভেতর এমন তরল পদার্থ দেয়া হয়েছে যা থেকে ডিম তৈরি হতে পারে। ডিম দেয়া শেষ হলে দেহের তরল পদার্থ শুকিয়ে যায় এবং পেট শূন্য হয়ে যায়। তখন তার ভেতর এমন এক উন্মাদনা দেখা দেয় যে, অন্যান্য মোরগের সাথে মেলামেশা ভুলে সে ডিমে তা দিতে বসে থাকে। এর ফলে তার পেটের শূন্যতার অনুভূতি দূর হয়।

কবুতর জুটির ভেতর অদ্ভুত ভালবাসা দান করা হয়েছে। কবুতরীর পেটের খোলসটিকে ডিমে তা দেয়ার জন্য উপযোগী করে রাখা হয়েছে। তার ভেতরকার বাড়তি তরল পদার্থকে বমি আকারে বাচ্চার ওপর অনুগ্রহে পরিণত করা হয়েছে। বমির মাধ্যমে সে দানা-পানি বাচ্চার উপযোগী করে খাওয়ায় এবং কবুতরকেও আকৃষ্ট করে তার পথ অনুসরণ করে বাচ্চাকে খোরাক জোগাবার জন্য। তেমনি বাচ্চার প্রকৃতিতে তরল পদার্থ দিয়ে

পালক সৃষ্টির পথ করা হয়েছে। তার সাহায্যে যেন সে উড়তে পারে।

মানুষের যেহেতু গতি, অনুভূতি, জৈব তাড়না ও বুদ্ধি-বিবেকের প্রেরণা রয়েছে, এমন কি বাড়তি জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতাও তার রয়েছে, তাই তাকে চাষাবাদ করা, বৃক্ষ রোপন, লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সহজাত জ্ঞান দেয়া হল। কিছু লোককে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব সুলভ ও কিছু লোককে দাসত্ব-আনুগত্য সুলভ স্বভাব দান করা হল। এক দলকে রাজকীয় স্বভাবের ও অন্য দলকে প্রজাসুলভ স্বভাবের অধিকারী করা হল। কাউকে আল্লাহ্‌তত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র ও ব্যবহারিক শাস্ত্রের গভীর ও জটিল জ্ঞান দান করা হল। কাউকে আবার এমন নির্বোধ করা হয়েছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তির অনুসরণ করা ছাড়া তার নিজের কিছু বুঝবারই ক্ষমতা নেই। শহুরে হোক কিংবা গেঁয়ো, সবার ভেতরেই স্বভাবের ও ক্ষমতার এ বৈচিত্র্য বিদ্যমান।

যা কিছু আলোচিত হল সবই মানুষের জৈবিক জীবন ও জীবসুলভ শক্তি সম্পর্কিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ বৈ নয়। এখন তার ফেরেশতাসুলভ শক্তির দিকে চলুন। এটাও আপনি জানেন, মানুষ অন্যান্য জীবের মত নয়; বরং তাকে সকল জীবের চাইতে উত্তম পর্যায়ের জ্ঞান দান করা হয়েছে। তার সে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ভেতর যেটাকে সবার অনুসরণ করতে হয়, তা হচ্ছে তার জন্ম ও প্রতিপালনের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কিত জ্ঞান। তারা তখন এটাও জেনে ফেলে যে, সৃষ্টির এ বিশাল কারখানার একজন মহান পরিচালক রয়েছেন। তিনিই সবাইকে সৃষ্টি করেছেন এবং রুজী সরবরাহ করছেন। তাই তারা সবাই মিলে অন্তত হাবভাবে সেই মহান প্রতিপালক ও বিজ্ঞতম স্রষ্টার কাছে বিনয়াবনত থাকছে। এটাই হচ্ছে আল্লাহ্ পাকের নিম্ন আয়াতের তাৎপর্য ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ *

(সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ১৮)

"(হে মুহাম্মদ)! তুমি কি দেখছ না নভোমণ্ডলের বাসিন্দারা, পৃথিবীর অধিবাসী, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, পাহাড়, গাছপালা, চতুষ্পদ জন্তু এবং বহু সংখ্যক মানুষ আল্লাহ্‌র সমীপে বিনয়াবনত রয়েছে? তবে বহু লোক এমনও রয়েছে যাদের ভাগ্যে (নাফরমানীর কারণে) রয়েছে নির্ধারিত শাস্তি।"

লক্ষ্য করুন, গাছের প্রতিটি অংশ, শাখা, পাতা, ফুল তাদের বিজ্ঞতম স্রষ্টার সমীপে হাত পেতে রয়েছে। যদি সেগুলোর জ্ঞান থাকত, তা হলে স্রষ্টার প্রশংসায় মুখর থাকত এবং অধিক থেকে অধিকতর কৃতজ্ঞ হয়ে চলত। যদি কিছুটা বুঝ থাকত, তা হলে হাবভাবে প্রার্থনার বদলে কথা দিয়ে প্রার্থনা করত।

এ থেকে এটাও জানা গেল যে, মানুষ বড়ই বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। তাই তারা হাবভাবে প্রার্থনার বদলে জ্ঞানপূর্ণ প্রার্থনা জানায়। মানব শ্রেণীর এটাও একটা বৈশিষ্ট্য যে, তাদের ভেতরে কেউ না কেউ অবশ্যই সকল তত্ত্বজ্ঞানের উৎসের দিকে কায়মনে নিবিষ্ট থাকেন। সে ব্যক্তি সেই উৎস থেকে ওহী, দিব্যজ্ঞান কিংবা স্বপ্নের মাধ্যমে আসল জ্ঞান শিখে নেন। অন্যান্য লোক তাঁর ভেতর পথের আলো ও পুণ্যের প্রভাব দেখে আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধের প্রতি অনুগত হয়ে থাকে।

প্রত্যেকটি মানুষকে অদৃশ্য জগতের কথা জানার শক্তি দেয়া হয়েছে। হোক তা সে স্বপ্নের মাধ্যমে কিংবা দিব্যজ্ঞানের সাহায্যে অথবা গায়েবী আওয়াজ শুনে বা দূরদৃষ্টি প্রয়োগ করে জানুক। তবে এতটুকু তারতম্য অবশ্যই রয়েছে যে,কিছু লোক এ ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করেন এবং কিছু লোক অপূর্ণ থাকে। অপূর্ণদের তাই পূর্ণতা প্রাপ্তদের শরণাপন্ন হতে হয়। এ ছাড়াও মানুষের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্যান্য জীবের ভেতর নেই। যেমন, বিনয়, পবিত্রতা, ন্যায়পরায়ণতা, দানশীলতা, উদারতা, প্রার্থনালব্ধ ঐশী প্রভাব ইত্যাদি। এ ভাবের আরও কিছু অবস্থা রয়েছে। যেমন কারামত।

মোট কথা যে সব বৈশিষ্ট্য মানুষকে জীবজগতে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে তার সংখ্যা অনেক। তবে সবগুলোরই মূলে হল দুটি শক্তি। এক, জ্ঞান বা বোধিশক্তি। এর দুটো শাখা। একটি শাখার ঝোঁক থাকে মানবিক কল্যাণ ও তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলোর দিকে। অন্যটির ঝোঁক রয়েছে আল্লাহ্‌র

কাছ থেকে সরাসরি সব কিছু জানার দিকে। দুই, পূর্ণাঙ্গ কর্মশক্তি। এরও দুটো শাখা রয়েছে। একটির সাহায্যে মানুষ নিজের ইচ্ছানুসারে ভাল বা মন্দ কাজ করে থাকে। পক্ষান্তরে জীব-জন্তুর ইচ্ছা-অনিচ্ছার বালাই নেই। ভাল বা মন্দ কাজের ভাবনাও তাদের স্বভাবে নেই। ভাল বা মন্দ কাজ দ্বারা তারা প্রভাবিতও হয় না। তারা তো জৈবিক প্রাণের তাগাদায় চলে ও তার থেকেই শুধু প্রভাবিত হয়। তাই পশুরা এ ক্ষেত্রে বেপরোয়া। কিন্তু মানুষ যখন কোন কাজ করে, কাজ ফুরিয়ে গেলেও তার প্রাণ বা প্রভাব থেকে যায় এবং তা তার প্রবৃত্তির খোরাক হয়। ফলে হয় তা থেকে আত্মা আলোকময় হয় অথবা আঁধারের গ্লানিমায় আচ্ছাদিত হয়।

শরীয়ত মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে কাজ করার ক্ষেত্রেই শুধু জবাবদিহি করা হবে বলে শর্ত দিয়েছে। তার সাথে ডাক্তারের এ শর্তের মিল রয়েছে যে, বিষ পানের ক্ষতি ও আফিমের উপকার পেতে হলে তা গিলে পেটে পৌঁছাতে হবে। আমি বলেছি, মানুষের প্রবৃত্তি তার কাজের প্রভাব বা প্রাণশক্তি আহরণ করে এ বক্তব্যটি কোন না কোনরূপ আত্মিক সাধনা ও ইবাদতকে মানবকুলের সর্বসম্মত ভাবে ভাল বলে ঘোষণাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ, তাদের অনুসন্ধিৎসা এর আলোকময়তা সম্পর্কে জেনে ফেলেছে।

তেমনি মানুষ সর্বসম্মত ভাবেই পাপাচার ও নাফরমানীকে খারাপ বলে জানে। কারণ, তাদের অনুসন্ধিৎসা তার তমসা ও ক্ষতি দেখতে পেয়েছে। জীব জগতে মানবের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির দ্বিতীয় শক্তিটির দ্বিতীয় শাখা হল তার উন্নততর অবস্থা ও শ্রেষ্ঠতর মর্যাদা। এ অবস্থা ও মর্যাদা অন্যান্য জীবের নেই। যেমন, আল্লাহ্প্রীতি ও আল্লাহ্র নির্ভরতা।

প্রকাশ থাকে যে, পরিমিত স্বভাব মানুষের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। অবশ্য তা নিম্ন জিনিসগুলো ছাড়া পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এক, উন্নততর ও উত্তম ব্যক্তির অর্জিত যে বিদ্যাগুলো অন্যান্য মানুষ অনুসরণ করেছে, সে সব বিদ্যা অর্জন। দুই, আল্লাহ্র যে বিধি-বিধানে আল্লাহ্ পরিচিতি এবং কল্যাণময় ব্যবস্থাদি রয়েছে, সেই শরীয়ত। তিন, যে সব নীতিমালা মানুষের ইচ্ছাকৃত কার্য-কলাপ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের জন্য কার্যগুলোকে ফরজ, হারাম, মুস্তাহাব, মুবাহ্ ও মকরুহ এ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছে,

সেই নীতিশাস্ত্র। চার, মানবতার ও মানবিক সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটানোর উপায় উপকরণাদি।

আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ ও কলাকৌশল পবিত্র অদৃশ্য জগতে থেকে ব্যক্তি বিশেষকে সব চাইতে মেধাবী ব্যক্তির উপযোগী জ্ঞান দান করে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে। তখন তাঁর কাছ থেকে সে ব্যক্তি উপরোক্ত জ্ঞান অর্জন করে নেয়। তারপর অন্যান্য ব্যক্তিরা তাকে অনুসরণ করে। মধুমক্ষিকার ঝাঁক যেভাবে তাদের রাজ মক্ষিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এও তেমনি ব্যাপার। যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজ মক্ষিকাকে সেই শক্তি না দেয়া হত, তা হলে মধুমক্ষিকার ঝাঁকের এ গৌরবজনক কীর্তিকলাপ সম্ভব হত না।

সে ভাবে কেউ যখন দেখে যে, কোন জন্তু ঘাস ছাড়া বাঁচে না, তখন সে অবশ্যই বিশ্বাস করে, তার জন্য কোন না কোন চারণ ক্ষেত্র সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। ঠিক সেভাবেই আল্লাহ পাকের কলা-কৌশল নিয়ে যারা চিন্তা-ভাবনা করে, তারা অবশ্যই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ পাক নিশ্চয়ই এমন কতক বিদ্যা কোথাও না কোথাও দান করে রেখেছেন যার সাহায্যে মানুষ তার জ্ঞানগত অভাব অভিযোগ দূর করে পূর্ণত্ব লাভ করতে পারে।

মোটকথা এ সব বিদ্যার অন্যতম হল স্রষ্টার একত্ব ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান। এ বিদ্যাটি এরূপ সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষিত হওয়া উচিত যা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এরূপ জটিল ও অস্পষ্ট করে তা আলোচনা করা ঠিক নয় যা কারো পক্ষেই জানা ও বুঝা সম্ভব হয় না। তাই সে বিদ্যার বিশ্লেষণ আল্লাহ তা'লা তাঁর পরিচিতির মাধ্যমে দিয়েছেন।

যেমন তিনি বলেন ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ (আল্লাহ নিজ গুণাবলী নিয়ে পবিত্র রয়েছেন)। সুতরাং তিনি এমন গুণ নিয়ে রয়েছেন যা মানুষ জানে। তারা নিজেরা সেগুলো ব্যবহারও করে। যেমন, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি দেখেন, শুনেন, ক্ষমতা রাখেন, ইচ্ছা রাখেন', কথা বলেন, রাগ হন, অসন্তুষ্ট হন, দয়া দেখান, মালিকানা রাখেন, মুখাপেক্ষী হন না ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাঁর এ গুণাবলীর সমকক্ষতা করার ক্ষমতা কারো নেই। সুতরাং তাঁর জীবন, দেখা-শুনা, ক্ষমতা' ইচ্ছা, কথা বলা ইত্যাদি আমাদের কারো মত নয়। এ ভাবে তাঁর প্রত্যেকটি গুণই আমাদের থেকে স্বতন্ত্র ধরনের।

সেই অতুলনীয়তার ব্যাখ্যা হল এই, মরুভূমির বালু, বৃষ্টির বিন্দু কিংবা সব গাছপালার পাতা অথবা সকল জীবের শ্বাসপ্রশ্বাস গণনার মতই অসম্ভব ব্যাপার হল আল্লাহর গুণ আমাদের কারো ভেতরে পাওয়া। তিনি তো আঁধার রাতের গর্তের পিপীলিকার চাল-চলন দেখেন এবং বদ্ধকোঠায় লেপের নিচে কে কি ফিস ফাস করে তাও শোনেন। সব গুণের ক্ষেত্রেই তাঁর এ শ্রেষ্ঠত্ব ও অতুলনীয়তা।

এ বিদ্যার বিভিন্ন শাখার ভেতর রয়েছে, উপাসনা পদ্ধতি, জীবন ধারণ পদ্ধতি, আলোচনা ও সমালোচনা পদ্ধতি, সত্য ও ন্যায়ের পথে নিম্নস্তরের লোকের সন্দেহ সংশয় নিরসন বিদ্যা, ইতিহাস ও বর্ণনা শাস্ত্র (যে বিদ্যায় আল্লাহর অনুগ্রহ, অভিলাষ, কবর, হাশর ইত্যাদির বর্ণনা এবং একই মানুষকে বংশানুক্রমে যুগে যুগে আল্লাহ যে যোগ্যতা ও বিবেক-বুদ্ধির পূর্ণত্ব দান করেছেন তার বর্ণনা থাকে) এ সব বিদ্যা অদৃশ্য জগতের অদৃশ্যতম রহস্যের জ্ঞান সমৃদ্ধ মহাজ্ঞানীর ভেতরেই সীমিত ও সমন্বিত হয়েছিল। এ অবস্থাটিকে আশায়েরা সম্প্রদায় 'কালামে নফসী' বা আদি বাক্য আখ্যা দান করেছে। এটা হল জ্ঞান, ইচ্ছা ও শক্তি ভিন্ন অন্য কিছু। তারপর যখন ফেরেশতা সৃষ্টির মুহূর্ত এল, আল্লাহ পাক জানতে পেলেন, ফেরেশতা সৃষ্টি ছাড়া মানুষের কল্যাণের কাজ সুসম্পন্ন হবে না। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মতই ফেরেশতারা মানুষের ভেতর জড়িয়ে ও ছড়িয়ে থাকবে। সুতরাং ফেরেশতাদের তিনি মানুষের প্রতি রহমত হিসেবে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'কুন' (হয়ে যাও) বলা মাত্র হয়ে গেল। তখন তাদের ভেতর অদৃশ্য জগতের অদৃশ্যতম তত্ত্বজ্ঞানীর ভেতর সীমিত ও সমন্বিত জ্ঞানের কিছুটা ঝলকানী দেয়া হল। ফলে তারা আত্মিক জীব হয়ে আত্মপ্রকাশ করল। আল্লাহ পাক এদের ব্যাপারেই বললেন, 'আরশ বাহী ও তাদের পার্শ্বচররা' ইত্যাদি।

তারপর যখন শাস্ত্রীয়, ধর্মীয় ও জাতীয় পরিবর্তনের মুহূর্ত এল, তখন আল্লাহর কৌশলগত প্রয়োজন দেখা দিল কিছু আত্মিক জিনিসের অস্তিত্ব দানের। তখন সে সব জ্ঞান যুগের প্রয়োজন অনুসারে বিস্তারিত ও বিশ্লেষিত হয়ে প্রকাশ পেল। সে সম্পর্কেই আল্লাহ বললেন ঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ - فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ *

সূরা দুখান ঃ আয়াত ৩-৪

'আমি এ জ্ঞানভাণ্ডারকে (কুরআন) এক কল্যাণময় (শবে কদর) রাতে অবতীর্ণ করেছি। আমি সতর্ককারী (পূর্বাভাস দাতা) ছিলাম। এ রাতেই সব হিকমতপূর্ণ ব্যাপার আমার দরবার থেকে নির্দেশ (অর্ডিন্যান্স) আকারে মীমাংসিত ও বন্টিত হয়।'

তারপর আল্লাহর কৌশলগত প্রয়োজন এক পুণ্য ও পূত চরিত্রের ব্যক্তিকে নবী হিসেবে মনোনীত করল। তাকে ওহী ধারণের যোগ্যতাও দান করল। এ জন্য উচ্চ স্তর ও উন্নত মর্যাদা নির্দিষ্ট করা হল। যখন তা পাওয়া গেল, তখনই মনোনয়ন দেয়া হল এবং উদ্দেশ্য সফলের জন্য তাকে আল্লাহ মাধ্যম বানালেন। তার ওপর নিজ গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন। তাঁকে অনুসরণ করা মানুষের জন্য ফরজ করে দিলেন। হযরত মুসাকে (আঃ) লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'লা এ তথ্যই ব্যক্ত করেছেন ঃ "(হে মুসা!) আমি তোমাকে আমার (কাজের) জন্য মনোনীত করলাম।"

সুতরাং অদৃশ্য জগতের অদৃশ্যতম তত্ত্ব জ্ঞানীর মানুষের জন্য এ সব অমূল্য বিদ্যা নির্ধারিত করে রাখা মানুষের প্রতি তাঁর অপার অনুগ্রহের পরিচয় দেয়। তারপর মানুষের সেবার জন্য ফেরেশতা সৃষ্টি করা মানুষেরই যোগ্যতার প্রতি ইংগিত দান করে। মানুষেরই বিভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাই আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করে করে পূর্ণতা দান করেছে। ফলে মানুষের ওপর আল্লাহর (তরফের) দলীল-প্রমাণ, সুদৃঢ় ও বিজয়ী হল।

এরপর যদি কেউ প্রশ্ন করে, নামায কোত্থেকে ফরজ হল? রাসূলের আনুগত্য কি করে ওয়াজিব হল? চুরি ও ব্যভিচার কোথায় হারাম হল? জবাবে বলব, যেখান থেকে গরু ছাগলের ঘাস খাওয়া ফরজ ও মাংস খাওয়া হারাম করা হয়েছে এবং বাঘ-শিয়ালের জন্য মাংস খাওয়া ফরজ ও ঘাস খাওয়া হারাম করা হয়েছে, মানুষের ফরজ হারামও সেখান থেকে করা হয়েছে। তেমনি যেখান থেকে মক্ষিকার ঝাঁকের জন্য রাজ মক্ষিকাকে অনুসরণ করা ওয়াজিব করা হল, সেখান থেকেই মানুষের জন্য নবীকে অনুসরণ করা ওয়াজিব করা হয়েছে। হাঁ, তফাত এতটুকু যে, পশু-পাখীর জন্য ফরজ হারাম হয় প্রকৃতিগত ইলহামের দ্বারা এবং মানুষ সাধনা লব্ধ ওহীর ও দিব্যজ্ঞানের মাধ্যমে ফরজ হারামের সন্ধান পায়। তারপর অন্যান্যরা পায় ওহীপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুসরণের মাধ্যমে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দায়িত্বই প্রতিদান চায়

জেনে রাখুন, মানুষের জন্য রয়েছে যেমন কর্ম তেমন ফল। ভাল কর্মে তারা ভাল ফল পাবে, মন্দ কাজে পাবে মন্দ ফল। এ ক্ষেত্রে চারটি অবস্থা দেখা দেয়।

এক, জাতিগত স্বভাবের চাহিদা। যেমন গরু-ছাগল ঘাস খাবে ও বাঘ-শিয়াল মাংস খাবে। তা হলেই তাদের স্বভাব ঠিক থাকবে। তা না খেয়ে যদি বাঘ-শিয়াল ঘাস খায় ও গরু-ছাগল মাংস খায়, তখন তাদের স্বাভাব খারাপ হবেই।

মানুষও তেমনি। যদি তারা এমন সব কাজ করে যাতে আল্লাহর কাছে বিনয়, দেহের পাক-পবিত্রতা, মনের সারল্য ও খোদাভীরুতা, এবং বিবেকের ইনসাফ ও ন্যায়ানুগতা প্রকাশ পায়, তা হলেই তা তার ফেরেশতা স্বভাবের পরিপোষক হবে। পক্ষান্তরে যখন তার পরিপন্থী সব কাজ করবে, তখন তার স্বভাব নষ্ট হয়ে যায়। তারপর প্রাণ যখন তার দেহভার মুক্ত হবে, তখন ভাল কাজে সুখের প্রলেপ ও মন্দ কাজে দহন জ্বালা লাভ করবে।

দুই, মালা-ই আলার প্রভাবেও মানুষের দুঃখ বা সুখানুভূতি লাভ হয়। কারো পায়ের নীচে আগুন বা বরফ থাকলে তার অনুভূতি শক্তি যেরূপ প্রভাবিত হয়, উচ্চতম পরিষদের ফেরেশতাদের খুশী-অখুশী দ্বারাও সে তেমনি প্রভাবিত হয়। এ প্রভাব মূলত দেখা দেয় স্বরূপ জগতের আদি মানুষটির, তথা মানবের জাতিগত আদি সত্তার ভেতর। সেই সত্তার সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন ফেরেশতারা। মানব গোত্রের ওপর বিশষ অনুগ্রহ হিসেবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। কায়া মানব যেভাবে অনুভূতি ও উপলব্ধি শক্তি ছাড়া চলতে পারেনা তেমনি ছায়া মানব সেই ফেরেশতাদের ছাড়া চলতে পারেনা । কোন মানুষ যখন একটি ভাল কাজ করে, তখন সেবক ফেরেশতারা খুশী হয় এবং তা থেকে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। তেমনি

যদি কেউ কোন খারাপ কাজ করে, সেবক ফেরেশতারা অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয় এবং তা থেকে আঁধার এক ধোঁয়ার কুণ্ডলী নির্গত হয়। এ দুটোই সেই মানব সত্তাটিকে প্রভাবিত করে এবং তাকে সুখ কিংবা দুঃখ দান করে।

কখনও সেই রশ্মি বা ধোঁয়া কিছু ফেরেশতা এবং বিশেষ একদল লোকের স্বভাবে প্রবিষ্ট হয়। ফলে তার স্বভাবিক ইলহাম হয় ভাল কাজের মানুষটিকে ভালবাসার ও মন্দ কাজের মানুষটিকে ঘৃণা করার জন্য। সেই অনুসারে তারা সদ্ব্যবহার কিংবা দুর্ব্যবহার করে থাকে। এ অন্তর্লীন প্রভাবটির উদাহরণ এই, যখন কোন মানুষের পায়ের নীচে আগুন থাকে, তার অনুভূতি ঘটে দহন জ্বালার। এ অনুভূতি তার মগজ থেকে বিষাদময় ধোঁয়া নির্গত করে ও তা তার অন্তরকে আচ্ছাদিত করায় দুঃখানুভূতি দেখা দেয়। ফলে স্বভাবেও বিমর্ষতা ফুটে ওঠে। অনুভূতি ও উপলব্ধি শক্তিগুলো যেভাবে দেহকে প্রভাবিত করে, ঠিক তেমনি প্রভাবিত করে সেই ফেরেশতারা আমাদের মন-মানসকে। আমাদের কারো যদি দুঃখ বা লাঞ্ছনার আশংকা দেখা দেয়, তখন সে ভয়ে কাঁপে এবং তার দেহ বিবর্ণ ও অবসন্ন হয়। কখনও বা কামনা লোপ পেয়ে প্রস্রাব লাল হয়ে যায়। এমনকি পায়খানা-প্রস্রাবও বেরিয়ে আসে। এ সবই ঘটে তার স্বভাবের ওপর অনুভূতি ও উপলব্ধির প্রভাবের কারণে। এ প্রভাব তার মগজের মাধ্যমে মনে রেখাপাত করে। বনী আদমের সাথে নির্দিষ্ট ফেরেশতার ঠিক দেহের সাথে অনুভূতির সম্পর্কের মতই সংযোগ। তাদের তরফ থেকে মানুষের ও নিম্নস্তরের ফেরেশতাদের ওপর স্বভাবজাত প্রভাব ও প্রকৃতিগত বিবর্তন চলতেই থাকে।

তারপর যেভাবে ভালর আলো ও মন্দের আঁধার ওপর থেকে নীচে নেমে আসে, তেমনি নীচ থেকেও তা ওপরে উঠে এমনকি পবিত্র দরবারে পর্যন্ত পৌছে যায়। তার ফলে আল্লাহর জ্যোতিতে বিশেষ এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাকে রহমত বা গজব বলা হয়। আগুনের তাপে যেমন পানি উত্তপ্ত হয়, যুক্তিজাল বিন্যাসের পর সিদ্ধান্ত বের হয় এবং দোয়া করলে কবুলের কারণ সৃষ্টি হয়, এও ঠিক তেমনি ব্যাপার । বস্তুত আল্লাহর জ্যোতিতে উক্ত অবস্থা সৃষ্টির পর আত্মিক জগতে নতুন নতুন অবস্থা ও বিবর্তনের সৃষ্টি হয়।

কখনও ক্ষোভ ও আক্রোশ সৃষ্টি হয়। তওবা হলে তা আবার লোপ পায়। কখন আবার রহমত দেখা দেয়।রহমত আবার অপরাধ হলে আজাবে রূপান্তরিত হয়। স্বয়ং আল্লাহ পাক বলেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ *

সূরা রা'দ ঃ ১১

"নিশ্চয় আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্য বদলান না, যতক্ষণ তারা নিজেদের ভাগ্য নিজেরা না বদলায়।"

মহানবী (সঃ) বিভিন্ন হাদীসে বলেছেন, আদম সন্তানের যা কিছু কাজ ফেরেশতারা আল্লাহর সমীপে নিয়ে যান। কিংবা আল্লাহপাক ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের কি অবস্থায় রেখে এসেছ? অথবা আল্লাহর কাছে রাতের কার্যাবলীর আগে দিনের কার্যাবলী পৌছে থাকে। এ সব বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, জ্যোতির্ময় আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের ভেতর পবিত্র পরিষদের মাধ্যমে যে সম্পর্ক বিদ্যমান, ফেরেশতারা সে সম্পর্ক রক্ষার দায়িত্বই পালন করেন।

তিন, মানুষের ওপর যা কিছু অপরিহার্য করা হল তা শরীয়তেরই দাবী। এক জ্যোতির্বিদ যেমন জানেন, নক্ষত্রমণ্ডলীর যখন নিজ নিজ গতিপথ ও অবস্থানগুলোর বিশেষ এক স্থান লাভ ঘটে, তখন সেই স্থানের বিশেষ শক্তির প্রভাবে এক ধরনের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়। সে অবস্থাটি আকাশের কোথাও কেন্দ্রিভূত হয়ে ছায়ারূপ ধারণ করে। তারপর যখন আকাশের রীতিনীতির নিয়ন্তা জগৎ উদ্ভাসিনী পূর্ণ চন্দ্রের সেই আত্মিক কথা গ্রহণের অবস্থাটিকে পৃথিবীতে প্রতিভাত করেন, তখন পৃথিবীর মানুষ সেই শীতল চন্দ্রালোক দ্বারা আকৃষ্ট ও অভিভূত হয়।

ঠিক এভাবেই এক আল্লাহ্ প্রাপ্ত ব্যক্তি জানেন, বিশেষ এক সময় আসে যেটাকে লায়লাতুল কদর বা বরকতের রাত বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং যে সময়ে সমস্ত হিকমতপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত ও সেগুলো বন্টিত হয়, তখনও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত আত্মিক জগতে এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাই প্রয়োজন ও সময়ের চাহিদা মোতাবেক সেই যুগের উত্তম ও শ্রেষ্ঠ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে ইলহাম বা ওহী অবতীর্ণ হয়। তাঁর মাধ্যমে

সে সব ইলহাম পৌঁছানো হয় তাঁদের কাছে যাদের ব্যক্তিত্ব ও মেধা ঠিক তাঁরই কাছাকাছি রয়েছে। তারপর অন্যান্য সাধারণ লোকের অন্তরে এ ইলহাম পৌঁছানো হয় যে অবতীর্ণ ইলহামগুলোকে মেনে চলে এবং ভাল জানে । তারপর সে সব ইলহামের সমর্থক ও সহায়কদের সাহায্য করা হয়। পক্ষান্তরে সেগুলোর বিরোধীদের লাঞ্ছিত ও পরাভূত করা হয়। নিম্ন জগতের ফেরেশতাদের ইলহাম পৌঁছানো হয় অবতীর্ণ বিধানাবলীর অনুসারীদের সাথে সদ্ব্যবহার ও বিরোধীদের সাথে দুর্ব্যবহার চালাতে। তারপর এক ধরনের উজ্জ্বল দ্যুতি ও প্রভাব সাধারণ পরিষদ ও উচ্চতম পরিষদে পৌঁছে যায়। ফলে সেখান থেকে সন্তুষ্টি কিংবা অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়ে থাকে।

চার, নবীর আনুগত্য। আল্লাহ পাক যখন কাউকে মানুষের মাঝে নবী করে পাঠান এবং এ কাজের মাধ্যমে তিনি মানুষের কল্যাণ সাধন ও তাদের ওপর অনুগ্রহ বর্ষণ করতে চান, তখন মানুষের ওপর তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য করেন। তখন নবীর কাছে তাঁর যে সব ওহী আসে সেগুলো নির্দিষ্ট বিদ্যায় রূপ লাভ করে। সে বিদ্যা নবীর হিম্মৎ ও দোয়ার ফলে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলে। আল্লাহ পাকেরও নির্দেশ হয় তা সুপ্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারে সহায়তার জন্য।

যেমন কর্ম তেমন ফলের এ চার ধরনের প্রয়োজনের ভেতর প্রথম দু'ধরনের প্রয়োজন অর্থাৎ জাতিগত স্বাভাবিক চাহিদা ও উচ্চতম পরিষদের প্রভাবগত চাহিদা মানুষের সৃষ্টিগত প্রকৃতিরই চাহিদা মাত্র। যে প্রকৃতি দিয়ে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তা চির অপরিবর্তনীয়।

তবে পাপ ও পুণ্যের বিধান মানব প্রকৃতিতে সামগ্রিকভাবে বিধৃত রয়েছে, বিস্তারিত ভাবে নয়। এ প্রকৃতিগত মানবিক ধর্মটি কালোত্তীর্ণ ও সার্বজনীন। সব নবীই এ মৌলিক ধর্মের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন মতাবলম্বী। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً *

সূরা মু'মিনূন ঃ আয়াত ঃ ৫২

"এই হল তোমাদের উম্মতের পরিচয়, এ উম্মত সবাই এক।"

মহানবী (সঃ) বলেন, 'নবীরা সবাই বৈমাত্রেয় ভাই। বাপ তাদের এক, মা পৃথক।' এ প্রকৃতিগত মানব ধর্মটুকুর জন্য প্রতিটি মানুষকে জবাবদিহি করা হবে। নবী তাঁর কাছে আসুক বা না আসুক।

তৃতীয় ধরনের প্রতিদান দাবী (শরীয়তের চাহিদা) যুগের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয়ে চলে। এ জন্যেই যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন নবী ও রাসূল পাঠাতে হয়েছে। মহানবীর (সঃ) হাদীসে এর ইংগিত এ ভাবে রয়েছে, 'আমার ও আমার ওপর অবতীর্ণ বিধানের অবস্থা হল এই, কোন লোক যেন এক জাতির কাছে এসে বলল, হে জাতি! আমি নিজ চোখে শত্রু সৈন্য দেখে এলাম। তাই খোলাখুলি তোমাদের সাবধান করছি। তোমরা এক্ষুণি পালিয়ে প্রাণ বাঁচাও। তখন সেই জাতির একটি দল তার খবর শুনে মেনে নিল এবং শত্রু সৈন্য পৌঁছার আগেই ভোর না হতে পালিয়ে বাঁচল। অন্য দল তার খবরকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়ে সকাল পর্যন্ত আরামে নিদ্রা গেল এবং সকালেই শত্রু সেনারা এসে তাদের মেরে ফেলল। ঠিক তেমনি আমাকে যারা মানল ও আমার বিধানকে সত্য জানল, তারা বেঁচে গেল এবং যারা আমাকে মিথ্যা জানল ও আমার বিধানকে অমান্য করল, তারা মারা পড়ল।

এখন রইল চতুর্থ ধরনের প্রতিদান প্রকৃতি। সেটা হল নবী প্রেরণের চাহিদা। এ চাহিদা নবী প্রেরিত না হওয়া পর্যন্ত দেখা দেয় না। নবী এসে সবার কাছে সে বিধানগুলো পৌছে দেবার ও তাদের সব সংশয় সন্দেহ নিরসনের পর যারা জেনে শুনে বাঁচতে কিংবা ধ্বংস হতে চায়, তাদের বেলায় এ প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন আর এ প্রয়োজন অস্বীকার করার তাদের কোন অজুহাত অবশিষ্ট থাকেনা।

নবম পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন স্বভাবের বিচিত্র মানুষ

মানুষের স্বভাবের বিভিন্নতার কারণে তাদের কার্য-কলাপ, নৈতিকতা ও মর্যাদায় পার্থক্য দেখা দেয়। এর সপক্ষে পাই মহানবীর (সঃ) এ হাদীসটি "যদি তুমি শোন কোন পাহাড় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে

গেছে, তা হলে তুমি তা বিশ্বাস করলেও করতে পার। কিন্তু যদি শুনতে পাও অমুক ব্যক্তির স্বভাব প্রকৃতি বদলে গেছে, তাকে কখনও বিশ্বাস করোনা। কারণ, অবশেষে সে তার মূল স্বভাবেই ফিরে আসবে।" অন্যত্র তিনি বলেন, " দেখ, আদম সন্তানের বিভিন্ন প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের ভেতর কিছু লোক মু'মিন হিসেবে জন্ম নিয়েও কাফের হয়ে মারা যায় ইত্যাদি।" এ হাদীসটি পুরোপুরি বর্ণনার পর ক্ষোভ, অধিকার, ঋণ প্রকাশ ও আদায়ের ব্যাপারে বিভিন্ন স্বভাবের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উল্লেখ করেন। এক স্থানে তিনি বলেছেন, সোনা ও রূপার খনি যেমন পৃথক হয়, তেমনি (গোত্র ও ঈমানের বিচারে) মানুষ বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে জন্ম নেয়।

স্বয়ং আল্লাহপাক বলেন ঃ-

সূরা বনী ইস্রাইল ঃ আয়াত ঃ ৮৪

"(হে মুহাম্মদ) বলে দাও, প্রত্যেকেই যার যার স্বভাব মতে কাজ করে।"

উপরোক্ত হাদীসগুলোর যে অর্থ ও তাৎপর্য আমার কাছে ধরা দিয়েছে, যদি আপনিও তা হৃদয়ংগম করতে চান, তা হলে শুনে নিন, মানুষের ভেতরে দু'ধরনের ফেরেশতা খাসলাত পয়দা করা হয়েছে। তার ভেতর একটি উচ্চ পরিষদের অনুকূল ও উপযোগী। সেটার কাজ হল উত্তম নামাবলী ও গুণাবলীর জ্ঞানে পরিপুষ্ট থাকা, রহস্যময় স্রষ্টার গভীর ও সূক্ষ্ম রহস্যাবলীর খবর রাখা এবং নিখিল সৃষ্টির উত্তম ব্যবস্থাপনার রীতি-নীতি ভালভাবে আয়ত্ত করা। উদ্দেশ্য হল, সে সব জ্ঞান আয়ত্ত করে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য সেদিকে সর্ব প্রয়াসে নিয়োজিত থাকা। দ্বিতীয়টি নিম্ন পরিষদের অনুকূল ও উপয়োগী হয়। নিম্ন পরিষদের কাজই হল ওপরের হুকুম তামিল করা। তা আয়ত্তের চিন্তা করে না এবং সেদিকে সাহস ও প্রয়াস ব্যয় করে না, কেন্দ্রিভূতও করে না। তাই তারা সেগুলোর ব্যাপারে ওয়াকেফহাল থাকে না এবং আল্লাহর গুণাবলী ও নামাবলীর জ্ঞান থেকেও

তারা বঞ্চিত। অবশ্য তাদের ভেতরে নূরের দ্যুতি রয়েছে। ফলে জৈব স্বভাব থেকে তারা পবিত্র ও উন্নত থাকে।

তেমনি জৈব স্বভাবও দু'ধরনের। এক, প্রবল ও শক্ত স্বভাব। যেমন, অতি আদর-যত্নে পালিত ষাঁড়। তার যেমন বপু বিশাল, আওয়াজ বিকট, শক্তি বিপুল ও দেহ মেদুল হয়ে থাকে, তেমনি সে তীব্র কামপ্রবণ, ভীষণ হিংসুটে, প্রবল বিজয় বাসনা, কঠিন প্রতিশোধ স্পৃহা ও ভয়ানক বেপরোয়া প্রকৃতির হয়।

দুই, অত্যন্ত দুর্বল স্বভাব। তার উদাহরণ হল, জন্মগত ত্রুটিপূর্ণ কিংবা খাসী করা পশু। তা ছাড়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত, অনশনক্লিষ্ট ও অযত্নে পালিত জীব। তার বপু কৃশ, আওয়াজ ক্ষীণ, প্রকৃতি দুর্বল ও সে প্রতিশোধ স্পৃহা বা বিজয় কামনাহীন হয়ে থাকে। প্রত্যেক মানুষের ভেতর এর যে কোন একটি জৈব শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে। ফলে যার ভেতর যে শক্তি ঠাঁই পায়, সে লোকটি সেভাবেই চিহ্নিত পরিচিত হয়। ফেরেশতা কি পশু শক্তি উভয়ের বেলায়ই এ দু'টো স্তরের পরিচয় মিলবে।

মানুষ তার কার্যকলাপ দ্বারা এ সব অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক শক্তিকে অধিকতর শক্তিশালী বা দুর্বল হতে সহায়তা করে থাকে। ফেরেশতা ও পশু প্রবৃত্তির একই সংগে মানুষের ভেতরে অবস্থানের ফলে দুটো অবস্থা দেখা দেয়। এক, উভয় শক্তির ভেতরে টানা-পোড়েন চলতে থাকে। প্রত্যেকটি শক্তিই যখন নিজের দিকে মানুষটিকে টানতে থাকে ও তার দ্বারা নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে ও ইচ্ছা প্রতিফলিত করতে চায়, তখন এ টাগ-অফ-ওয়ার নিতান্তই স্বাভাবিক। এর যে শক্তিই বিজয়ী হোক অপর শক্তিটির প্রভাব মুছে ফেলবে। দ্বিতীয় অবস্থাটি হল, উভয়ের ভেতর সমঝোতা ও একতার। এ অবস্থায় ফেরেশতা প্রকৃতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহার করে তার দাবীর কাছাকাছি কিছু মেনে নিয়ে কোন মতে গা বাঁচিয়ে চলে। যেমন বিবেক, মহানুভবতা, উদারতা, নিঃস্বার্থপরতা, পবিত্রতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার থেকে কিছুটা শিথিলতা নিয়ে কাজ করা। পক্ষান্তরে পশু শক্তিও তার মূল অবস্থান থেকে কিছুটা উপরে উঠে এসে সাধারণের মতামতের সাথে মোটামুটি তাল মিলিয়ে চলে। এরূপ ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী মত দুটো দ্বন্দ্বের বদলে সন্ধি করে নেয়। এ সন্ধি অবস্থায় মূলত

উভয় প্রকৃতি মিলে গিয়ে এক তৃতীয় প্রকৃতির সৃষ্টি হয়। তারপর পশু শক্তি, ফেরেশতা শক্তি ও তৃতীয় মিশ্র শক্তির প্রত্যেকেরই দুটো চরম দিক ও একটি মধ্যপন্থা থাকে। তারপর চরমের কাছাকাছি, মধ্য পথের কাছাকাছি ইত্যাকার রূপে তিন প্রকৃতি বহু প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে হয়ে চলে। তার ভেতর প্রধান হল আটটি। এ আটটির পরিচয় পেলে তা থেকে অন্যান্যগুলোও জানা যায়। তার ভেতরে চারটি সৃষ্টি হয় মূল শক্তি দুটোর পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ থেকে।

এক, প্রবলতম ফেরেশতা খাসলাত ও প্রবলতম পশু স্বভাবের মিলনে এ শক্তির অভ্যুদয় ঘটে।

দুই, প্রবলতম ফেরেশতা শক্তি ও দুর্বলতম পশু শক্তির মিলনে উৎপত্তি।

তিন, দুর্বলতম ফেরেশতা স্বভাব ও প্রবলতম পশু স্বভাবের মিলনে এর জন্ম।

চার, দুর্বলতম ফেরেশতা শক্তি ও দুর্বলতম পশু শক্তির মিলনে এর উদ্ভব ঘটে।

এভাবে এগুলোর পারস্পরিক সন্ধি ও মিলন থেকে অপর চারটি প্রকৃতি জন্ম নেয়। সেগুলোও স্বতন্ত্র রীতি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং অপরিবর্তনীয়।

কেউ যদি এ সব স্বভাবের বৈশিষ্ট্য ও রীতি জানতে পায়, সে অনেক হয়রানি থেকে বেঁচে যায়। আমি শুধু এখানে সে সব ব্যাপারই বলব যা এ গ্রন্থে প্রয়োজন হবে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যার পশু শক্তি সবলতম, তাকে কঠিন আত্মিক সাধনায় লিপ্ত হতে হবে। বিশেষত যার ভেতর তৃতীয় বা মিশ্র শক্তির সমাবেশ রয়েছে, তার জন্য এ সাধনা অপরিহার্য। মানবতায় পূর্ণত্ব প্রাপ্তি তারই ঘটবে যার ভেতর ফেরেশতা শক্তি বা বিবেক বিজয়ী রয়েছে। মিলিত স্বভাবের লোক আচরণ ও কাজ-কর্মে সব চাইতে ভাল হয়। টানা-পোড়েন ক্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব যদি পশু শক্তি থেকে মুক্তি পায়, তা হলে ইলম ও মা'রেফতে উত্তম হয়। কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে উদাসীন হয়। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে তারই উৎসাহ থাকেনা যার ভেতর পশু শক্তি দুর্বল ভাবে সক্রিয়।

তেমনি প্রবল উন্নত (ফেরেশতা) স্বভাবের লোক সব কিছু ছেড়ে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করবে। দুর্বল উন্নত স্বভাবওয়ালা যদি সুযোগ মিলে ও পশু স্বভাব থেকে রেহাই পায়, আখেরাতের জন্যই পার্থিব কাজ-কর্ম ত্যাগ করবে, পার্থিব অলসতা বা আয়েশের জন্য নয়। বড় বড় কাজে সে ব্যক্তি দেহ-মন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে যার পশু প্রকৃতির প্রাবল্য রয়েছে। পক্ষান্তরে উন্নত প্রকৃতির লোকেরা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের কাজে বেশী আত্মনিয়োগ করবে। মিশ্র প্রকৃতির লোক সব ধরনের কাজেই লিপ্ত হয়। দুর্বল বিবেকের মানুষ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দাংগা-হাংগামার কাজে বেশী নিয়োজিত থাকে।

বিবেক ও প্রবৃত্তির টানা-পোড়েনে বিক্ষত ব্যক্তি যদি প্রবৃত্তির অনুসারী হয়, শুধুই পার্থিব কাজে লেগে যাবে এবং যদি বিবেকের অনুগত হয়, শুধুই অপার্থিব কাজ ও সাধনায় ডুবে থাকবে। আপোসমূলক স্বভাবের লোকেরা পার্থিব ও অপার্থিব উভয় কাজে সমানে অংশ রাখবে। একই সঙ্গে পাপ ও পুণ্য দুটোই চালাবে।

এ সব প্রকৃতির ভেতর বিবেক যাদের খুবই উন্নত হবে, সে পার্থিব ও অপার্থিব, উভয় নেতৃত্বের উপযোগী হবে। আল্লাহর মর্জীতে তারা সব সময় সে ক্ষেত্রে জেঁকে বসবে। সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যথা খেলাফত(রাষ্ট্রচালনা) ও ইমামত (জাতীয় নেতৃত্ব) তাদের হাতেই থাকবে। এ ধরনের লোকরাই নবী, নায়েবে নবী, ধর্মীয় দিকপাল, যুগনায়ক ও রাষ্ট্রনায়ক হয়ে থাকেন। যাদের জন্য আল্লাহর দ্বীন অনুসরণ অপরিহার্য করা হয়েছে, তারা মিশ্র স্বভাবের এবং ফেরেশতা প্রকৃতির জোর তাদের কিছুটা বেশী। পক্ষান্তরে মিশ্র প্রকৃতিতে ফেরেশতা প্রকৃতি যাদের অপেক্ষাকৃত দুর্বল, তারা উপরোক্ত দলের অত্যন্ত অনুগত হয়। কারণ, এ ধরনের লোক আল্লাহর রহস্য পুরোপুরি লাভ করে। এদের কিছুটা দূরে থাকে টানা-পোড়েন বা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দল। কারণ, এ দলটি সরাসরি প্রকৃতিগত আঁধারে হাবুডুবু খেয়ে সত্যের ওপর সঠিক ভাবে স্থির থাকতে পারে না। তবে এ দলের লোক যখন দ্বিধা কাটিয়ে ওঠে, তখন যদি উন্নত খেয়ালের লোক হয় তা হলে শরীয়তের রহস্য নিয়ে তারা গবেষণায় ডুবে থাকে। শরীয়তের বাহ্যিক রূপ ছেড়ে তারা সম্পূর্ণ শক্তি ও সাধনা ব্যয়

করবে মা'রেফতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য অবহিত হওয়ার ও সেই রঙে নিজকে রঞ্জিত করার জন্য। যদি তত উন্নতমনা না হয় তা হলে শুধু আধ্যাত্মিক সাধনায় কষ্ট-ক্লেশ করে কাশফ-ইশরাফ (অপরের মনের কথা জানা) ও দোয়া কবুলের মত ফেরেশতা স্বভাবের ঔজ্জ্বল্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। কিন্তু আল্লাহর আসল রহস্যাবলী তার অন্তরে ঠাঁই পাবে না। তা জানতে পারে শুধু প্রকৃতির ওপর জোর খাটিয়ে কিংবা প্রকৃতিগত আলোর আশ্রয় নিয়ে।

আমার প্রতিপালক আমাকে এ সব রীতি-নীতি জানিয়েছেন। এগুলো যারা গভীরভাবে অনুধাবন করবে, আল্লাহর প্রেমিকদের অবস্থাগুলো তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে এবং তাদেরকে কতটুকু কামেল তা জানতে পাবে। তাদের রীতি-নীতির মর্তবাও তারা জানতে পাবে।

এ বিদ্যা আল্লাহ তা'লা শুধু আমাকেই দেন নি, আরও অনেককেই এরূপ অনেক জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ দানের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।

দশম পরিচ্ছেদ

কর্ম প্রেরণার উৎস

জানা দরকার, মানুষের যে সব মনোগত ও মস্তিষ্ক প্রসূত ভাব তাদের বিভিন্ন কাজে উস্কানী দেয় ও অনুপ্রেরণা জোগায়, অবশ্যই সেগুলো উদয়ের পেছনে কোন না কোন কারণ রয়েছে। কারণ, সব কিছুই সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর কার্য কারণ রীতি সক্রিয় রয়েছে। প্রত্যক্ষ উদাহরণ, অভিজ্ঞতা ও সঠিক চিন্তা-ভাবনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় যে, সত্যিই সে সব মনোগত ভাবের পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে।

মোট কথা সে সব কারণের সেরা কারণ হল আল্লাহদত্ত মানব প্রকৃতি। এর আগে এ সম্পর্কিত একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে (পাহাড় টললেও স্বভাব টলেনা হাদীস)। তার ভেতরও মানুষের প্রকৃতিগত প্রবণতার কথা রয়েছে।

খানা-পিনার মত বিভিন্ন অবস্থার প্রভাবে সেগুলোর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে থাকে। তাই দেখি, ক্ষুধার্ত খেতে চায়, তৃষ্ণার্ত পানি চায়, কামাতুর নারী চায় ইত্যাদি। কখনও মানুষ এমন বস্তু খায় যা তার কাম প্রবণতা

বাড়িয়ে দেয়। ফলে সে স্ত্রী ঘেঁষা হয়ে যায়। তাই তার গোটা ভাবনা-চিন্তা নারী কেন্দ্রিক হয়ে যায়। এ থেকেই সে অনেক অঘটন ঘটিয়ে থাকে। কখনও এমন রূঢ় বস্তু খায় যা তার অন্তরে রূঢ়তা সৃষ্টি করে। ফলে সে মানুষকে হত্যা করার মত কঠিন কাজ করতেও দ্বিধান্বিত হয় না। এ স্বভাবের কারণে সে এমন সব সাধারণ ব্যাপারেও ক্ষেপে যায় যাতে অন্য সবাই ক্ষিপ্ত হবার চিন্তাও করে না।

এ দু'ধরনের লোক যখন নামায-রোযার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা চালায় কিংবা বেশ বৃদ্ধ হয়ে যায়, অথবা কঠিন পীড়াগ্রস্ত হয়, তখন তার আগের অবস্থা অনেকটা বদলে যায়। তার অন্তর নম্র এবং প্রকৃতি সরল হয়ে যায়। এ কারণেই যুবক ও বৃদ্ধের অবস্থার তারতম্য সুপ্রকট হয়ে থাকে। এ পার্থক্যের কারণেই মহানবী (সঃ) রোজা থাকা অবস্থায় বৃদ্ধদের স্ত্রীকে চুমু খাওয়া বৈধ করেছেন, অথচ তরুণদের বেলায় তা নিষিদ্ধ রেখেছেন।

মোট কথা কারো কোন কিছুর অভ্যেস হওয়ার বা কিছু ভাল লাগার পেছনে কারণ হল, সে সেটা বেশী করে করার ফলে মনের পাতায় তা চিচিত্র হয়ে যায়। ফলে অধিকাংশ সময়ই সেটার ভাবনা তাকে পেয়ে বসে।

কখনও মানবিক প্রবৃত্তি পশু প্রকৃতির খপ্পর থেকে বেরিয়ে গিয়ে উচ্চ পরিষদ থেকে সাধ্যানুসারে দ্যুতিময় হয়ে থাকে। তার ফলে ভাল কাজের প্রেরণা ও প্রীতি এবং মানসিক শান্তি ও স্বস্তি দেখা দেয়। এ থেকে কখনও কোন উন্নত মানের ভাল কাজ করার দৃঢ় সংকল্প দেখা দেয়।

কখনও জৈবিক প্রবৃত্তি শয়তানের সাহচর্যে পড়ে তারই রঙে রঞ্জিত হয়। তখন মন মগজে যে সব খেয়ালের উদ্ভব হয় তা থেকে মানুষের খারাপ কাজগুলো দেখা দেয়।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, স্বপ্নও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন-মগজের খেয়াল থেকে জন্ম নেয়। পার্থক্য শুধু এই, স্বপ্নের জন্য মন পরিষ্কার ও নির্ভেজাল থাকা চাই। তা হলেই তাতে স্বপ্নের কথাগুলো চিত্রিত ও রূপায়িত হতে পারে। (জাগরণে খেয়ালগুলো শতধা বিক্ষিপ্ত থাকে ও স্বপ্নে সেগুলো সুবিন্যস্ত হয়।) বিশেষত ইবনে সিরীন বলেন, স্বপ্ন তিন ধরনের। এক, অন্তরের স্বগতোক্তি। দুই, শয়তান ভীতি তিন, আল্লাহর সুসংবাদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

যার কাজ তার সাথেই থাকে

সংখ্যাও সুরক্ষিত হয়

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا * اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا *

সূরা বনী ইস্রাঈল ঃ আয়াত ঃ ১৩-১৪

"আমি প্রত্যেক মানুষের কাজ তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি। কিয়ামতের দিন সেগুলো গ্রন্থাকারে তাদের সামনে খুলে ধরব। তারপর বলব, পড়ে নাও তোমার কাজের ফিরিস্তি। এটাই তোমার হিসেবে-নিকেশের জন্য যথেষ্ট।"

মহানবী (সঃ) আল্লাহ পাক থেকে বর্ণনা করেন, "কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক বলবেন, এই হল তোমাদের আমলনামা। আমি এটা সযত্নে সুরক্ষিত রেখেছি।" এরই বিনিময় তুমি পাবে। তাই সুফল যে পাবে, আল্লাহর কাছে তার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কুফল যে পাবে, তার নিজেকেই ধিক্কার দেয়া উচিত।"

তিনি আরও বলেন, প্রবৃত্তিতে বাসনা-কামনা জাগে। অংগ-প্রত্যংগ হয় তা বাস্তবায়িত করে, নয় তো মিথ্যা করে দেয়।

জেনে রাখুন, মানুষ স্বেচ্ছায় যে কাজগুলো করে সেগুলো এবং তার ভেতর দানা বেঁধে থাকা অভ্যেস ও চরিত্রগুলো তার সব কিছুর উৎস ক্ষেত্র মানবিক প্রাণ থেকে নির্গত হয়ে সেখানেই আবার ফিরে এসে সঞ্চিত ও সুরক্ষিত হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন থেকে যায়, প্রাণ থেকে সেগুলোর সৃষ্টি হয় কি ভাবে? এর কারণগুলো আমি আগেই বলে এসেছি। তা এই, মানব দেহের অভ্যন্তরে ফেরেশতা প্রকৃতি ও পশু প্রকৃতির এবং এ দুয়ের সংঘাত

ও সংমিশ্রণে সৃষ্ট অন্যান্য প্রকৃতির প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মানুষের স্বভাবগত প্রবণতা, ফেরেশতা ও পশু প্রকৃতির প্রভাব এবং এ ধরনের যে সব কারণ মানুষের কাজের প্রেরণা জোগায়, সবগুলোই মানব প্রকৃতি থেকে আত্মপ্রকাশ করে এবং সেখানেই নিহিত থাকে। সুতরাং বুঝা গেল, মানুষের মূল প্রাণই সব কিছুর উৎসভূমি। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তার থেকেই সবার জন্ম।

এর জ্বলন্ত উদাহরণ নিন। শিশু যদি শুরুতেই খুব দুর্বল প্রকৃতির হয়' তা হলে যে কোন মনস্তত্ত্ববিদ সহজেই বলে দেবেন, যদি এ শিশু এখনকার প্রকৃতি নিয়ে যুবক হয়, তা হলে অবশ্যই তার নারী সুলভ স্বভাব, আচরণ ও কীর্তিকলাপ দেখা দেবে। তেমনি যে কোন দেহতাত্ত্বিক ডাক্তারও জানে, অমুক শিশু তার জন্ম লগ্নের প্রকৃতি অনুসারে যুবক হলে এবং লালন-পালনের সময়ে কোন অসুখ বিসুখ ইত্যাদি দেখা না দিলে, সে চতুর ও সাহসী হবে কিংবা বোকা ও দুর্বল চিত্ত হবে।

তখন প্রশ্ন থাকে, কাজগুলো নির্গত হয়ে মূল প্রাণে আবার ফিরে আসে কেন? তার কারণ এই, মানুষ যখন কোন কাজ বেশী করে, তখন এরূপ অভ্যস্ত হয় যে, বিনা চিন্তা-ভাবনায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তার থেকে সে কাজ হয়ে থাকে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, তার অন্তর উক্ত কাজের রঙে রঞ্জিত হয়ে গেছে। এ সহজাত প্রভাব সমগোত্রীয় অন্যান্য কাজকেও আকৃষ্ট করে থাকে। হোক সে প্রভাব যত সূক্ষ্ম বা হাল্কা। মহানবীর (সঃ) নিম্ন হাদীসটি এ বক্তব্যের সমর্থন জানাবে ঃ

"বিভ্রান্তির চিন্তা ও প্রবণতা মানুষের অন্তরকে মাদুরের বুননীর মত ঘিরে নেয়। যে অন্তর তার প্রভাব গ্রহণ করে, তার ওপর একটি কালো দাগ পড়ে যায়। পক্ষান্তরে যে অন্তর তা গ্রহণ করে না, তার ওপর একটা সাদা দাগ পড়ে। এ ভাবে দাগ পড়ে পড়ে দু'অন্তরের অবস্থা এই দাঁড়ায়, একটি সাদা মর্মরের মত ঝকঝকে ও তেলতেলে হয়ে যায়। ফলে তাতে আর কখনও কোন খারাপ প্রভাবে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। অপরটি এরূপ মসীবর্ণ ও পিচ্ছিল হয় যে তাতে খেয়াল খুশীর চরিতার্থতা ছাড়া ভালমন্দের কোন তারতম্য বোধই অবশিষ্ট থাকে না।"

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, কাজ কি করে সঙ্গে জড়িয়ে থাকে? তার কারণ এই, মানবিক প্রবৃত্তি (অন্তর) গোড়ার দিকে সাদা ও পরিচ্ছন্ন এক পাত্র রূপে তৈরি হয়। কোনরূপ চিহ্ন বা রঙ তাতে থাকে না। তারপর শক্তি তাকে চালিত করে কাজের দিকে এবং দিন দিন সেদিকে সে এগিয়ে চলে। এ ক্ষেত্রে তার প্রতিটি পশ্চাতের অবস্থা পরবর্তী অবস্থার কারণ হয় এবং কার্য সৃষ্টি করেই কারণ লোপ পায়। এ কার্যকারণ ব্রতটি ধারাবাহিক চলতে থাকে এবং কখনও তাতে আগেরটি পেছনে ও পেছনেরটি আগে আসার জো- নেই। তাই আজ যে অন্তর বর্তমান, তাতে অতীতের প্রতিটি কারণের প্রভাব বিদ্যমান। যদিও বিভিন্ন বাহ্যিক ব্যস্ততার কারণে অন্তরে তার পূর্ণ উপলব্ধি থাকে না।

শুধু দুটো অবস্থাতেই এ প্রভাব দূর হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এক, কার্য সৃষ্টির মূলে যে শক্তিটি সক্রিয় যদি সেটা বিলুপ্ত হয়। যেমন বৃদ্ধ ও রুগ্নের অবস্থার কথা আমি বলে এসেছি যে, তাদের বিশেষ কর্ম প্রবণতাই বিলুপ্ত হয়। দুই, যদি উপর থেকে কোন (দৈব) প্রভাব এসে কারো বিশেষ প্রবণতাটি বৃদ্ধ ও রুগ্নের মতই বিলুপ্ত করে দেয়। এ অবস্থা সম্পর্কেই আল্লাহ পাক বলেন ঃ

إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ *

সূরা হূদ ঃ আয়াত ঃ ১১৪

"নিশ্চয় ভাল কাজ মন্দ কাজকে বিলুপ্ত করে।"

তিনি আরও বলেন ঃ

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ *

সূরা যুমার ঃ আয়াত ঃ ৬৫

"যদি তুমি শির্ক কর, তোমার ভাল কাজ বরবাদ হবে।"

এখন প্রশ্ন থাকে, কাজগুলো কেন সুরক্ষিত রাখা হবে? এর জবাব আমি নিজে যতটুকু বুঝতে পেরেছি তা হল এই, উর্ধলোকের ব্যবস্থাপনার দান অনুসারে উন্নততর স্বরূপ জগতের স্তরে প্রত্যেকটি মানুষের আসল রূপ প্রকাশ পায়। আল্লাহকে প্রভু মেনে আসার কাহিনীতে যে সত্তারা উপস্থিত

ছিল এরা তারাই। তারপর যখন সে সত্তা রূপ জগতে এসে দেহ ধারণ করে, তখন স্বরূপ ও রূপ যুক্ত ও একাত্ম হয়। তাই যখন কোন ব্যক্তি ভাল কাজ করে, তখন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তার স্বরূপ খুশীতে উজ্জ্বল হয় কিংবা স্বরূপের সাথে কাজটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। মৃত্যুর পর বিচার দিবসে কখনও দেখা যাবে তার কাজগুলো যত্নে সুরক্ষিত রয়েছে। আমলনামা পাঠের তাৎপর্য এটাই। কখনও বা দেখা যাবে, কাজগুলো তার অংগ-প্রত্যংগে জড়িয়ে রয়েছে। হাত-পা সাক্ষী দেবে কথাটির তাৎপর্যই তাই।

এও একটা কথা যে, কাজের আকৃতি ও প্রকৃতিই তাদের পার্থিব ও অপার্থিব ফলাফল সাফ সাফ বলে দেয়। মানে, তাদের দেখেই ফলাফল বুঝা যায়। ফেরেশতারা কখনও তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি সৃষ্টিতে দ্বিধান্বিত হয়ে বিলম্ব করে থাকে। তখন আল্লাহর ফরমান আসে, যা আছে তাই হুবহু চিত্রিত কর (তোমাদের গবেষণার প্রয়োজন নেই)।

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেন, "সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত সব বস্তু সৃষ্টির জন্য আল্লাহ পাক পরিমাপ নির্ধারিত করেছেন, তা সবই আদি সৃষ্টিটিতে লিখে নিয়েছেন। আল্লাহর সেই আদি সৃষ্টিটিকে কখনও 'লওহে মাহফুজ' কখনও 'কিতাবে মুবীন' কখনও বা 'ইমামে মুবীন' নামে কুরআনে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এগুলোর অর্থ যথাক্রমে 'সুরক্ষিত পাত' 'সুস্পষ্ট গ্রন্থ' ও 'সুস্পষ্ট চালক'। সৃষ্টি জগতে যা কিছু হয়েছে কিংবা হবে, সবই লওহে মাহফুজে এরূপ ভাবে অংকিত রয়েছে যা সাধারণ চোখে দেখার সাধ্য নেই।

আপনি মনে করবেন না যে, লওহে মাহফুজ লোহার পাত কিংবা কাঠ বা হাড়ের তক্তা। কিতাবে মুবিনকেও কাগজের কোন বই ভাববেন না। বরং আপনার মনে রাখতে হবে, আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলীর যেরূপ কোন তুলনা নেই, এ তক্তা ও গ্রন্থেরও তেমনি কোন তুলনা নেই। যদি আপনি তার কোন কাছাকাছি তুলনা নিয়ে বুঝতে চান তো সেটাকে হাফেজে কুরআনের অন্তর ও মেধার মতই একটা কিছু ভাবতে পারেন। কারণ, হাফেজের মন মগজে কুরআন এরূপ সুস্পষ্টভাবে লেখা থাকে যে, যখনই সে পাঠ করে, পরিষ্কারভাবে লেখাগুলো দেখতে পায়। অথচ অপর কেউ সে

রেখা দেখে না। তেমনি লওহে মাহফুজেও সব বস্তুর আল্লাহ নির্ধারিত পরিমাপের রেকর্ড এমন ভাবে লিখে রাখা হয়েছে যা লিখক ব্যতীত অন্য কেউ দেখতে পায় না।"

ইমাম গাজ্জালীর (রঃ) বক্তব্য এখানেই শেষ হল। মানুষের 'আমল' সুরক্ষিত রাখার সপক্ষে এও এক যুক্তি যে, সে ভাল বা মন্দ যাই করুক না কেন, অধিকাংশ সময়ে তা তার স্মরণে পড়ে এবং স্বভাবতই সে ভাল কাজের পুরস্কারের আশা ও মন্দ কাজের জন্য শাস্তির আশংকা রাখে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কাজের সাথে স্বভাবের সংযোগ

জেনে রাখুন, কাজ হল মনোগত ভাবের বহিঃপ্রকাশ, তাদের সাধারণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং তাদের শিকারের বস্তু। সাধারণের ধারণা মতে কাজ ও মনোগত ভাবে কোন প্রভেদ নেই। তাই অধিকাংশ মানুষই কাজ বলতে মানুষের স্বভাব-চরিত্রকে বুঝে থাকে। তার কারণ এই, যখন কোন আন্তরিক অভিলাষ কাউকে কোন কাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রবৃত্তি সেটাকে পছন্দ করে, তখন সে খুশীতে বাগ বাগ হয়। যদি স্বভাবের সেটা অপছন্দনীয় হয়, তখন সে বিমর্ষ ও হতাশ হয়। তারপর যখন সে কাজটি করে ফেলে, তখন সে অভিলাষের উৎস ফেরেশতা স্বভাব হোক কিংবা পশু স্বভাব, স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী হয়ে যায়। তখন তার বিপরীত পশু কিংবা ফেরেশতা প্রবৃত্তি অধীন ও দুর্বল হয়ে যায়। এ দিকেই ইংগিত দিয়ে মহানবী (সঃ) বললেন, 'মানুষের প্রবৃত্তি যখন কিছুর অভিলাষ করে, তার অংগ- প্রত্যংগ সেটাকে বাস্তবায়িত করে কিংবা ব্যর্থ করে দেয়।'

যে চরিত্র বা অভ্যেসই দেখুন না কেন, এটাই দেখতে পাবেন যে, তার পেছনে বিশেষ কিছু কাজ ও অবস্থা সক্রিয় রয়েছে। সেগুলোই চরিত্র ও অভ্যেসের ইংগিত দেয় এবং সেগুলার মাধ্যমেই তাদের পরিচয় মিলে। ফলে কাজ ও অবস্থা চরিত্র ও অভ্যেস প্রকাশের বাহন হয়ে দাঁড়ায়। কেউ যদি কাউকে বীর বলে আখ্যায়িত করে এবং তার কাছে বীরত্বের পরিচয় জানতে চাওয়া হয়, তা হলে অবশ্যই সে তার বড় বড় আক্রমণ ও অভিযানের উল্লেখ করবে। কেউ যদি তার দানশীলতা ও দরাজ হস্তের বর্ণনা

দেয়, তা হলেও সে জিজ্ঞাসিত হয়ে তার মুক্ত হস্তে বিরাট বিরাট দান কার্যের ও অর্থ ব্যয়ের উল্লেখ করবে। এখন কেউ যদি তার বীরত্ব ও দানশীলতা কল্পনা করতে চায়, তা হলে তার সামনে তার বীরত্বের ও দানের কার্যাবলী ও অবস্থাগুলোই ভেসে উঠবে।

হ্যাঁ এটা অন্য কথা যে, মানুষকে আল্লাহ্ যে প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, সে প্রকৃতিই বদলে যাবে। (অর্থাৎ মানবীয় স্বাভাবিক রীতি-নীতির ঊর্ধে থেকে কেউ যদি চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কোন কিছুর চিত্র প্রয়োজন মতে সামনে দেখতে পায়, তার কথা স্বতন্ত্র।)

যদি কেউ নতুন কোন চরিত্র বা অভ্যেস চেষ্টা করে অর্জন করতে চায়, তা হলে তার জন্য সঠিক সুযোগের অপেক্ষায় থাকা ছাড়া উপায় নেই। সে যেন তার চরিত্রের সাথে অন্তত সম্পর্ক রাখে, এমন কিছুর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালায় এবং যারা এ ধরনের কাজ করে গেছেন, তাদের ঘটনাবলী বারংবার স্মরণে আনে। সে কাজগুলোই কেবল আয়ত্তে আনা যেতে পারে এবং সেগুলো করার জন্যই সময় নির্ধারণ করা চলে। চোখেও চরিত্র ধরা দেয় না, দেয় চরিত্রের কাজ। বর্ণনাও দেয়া যায় কাজের, অভ্যেসের নয়। তাই তার উপরেই শর্ত আরোপ করা যায়। সেটাই অনুসরণ করা যায়। ক্ষমতা ও এখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত সেটাই এবং পুরস্কার বা তিরস্কার সেটার ভিত্তিতেই হবে।

প্রশ্ন থাকে, সব মানুষ তো কাজ করার ও দক্ষতা অর্জনের বেলায় এক নয়? কারো কারো তো এরূপ ক্ষমতা রয়েছে যে, কাজের চাইতেও পরিকল্পনা দানে সিদ্ধ হস্ত। জবাব এই, যদিও তার ক্ষমতা রয়েছে নিজের ভেতর স্বভাব ও দক্ষতা সৃষ্টি করার, তথাপি তার ভাবনায় কাজের চিত্রও এসে যায়। কারণ, কাজই হল স্বভাব ও দক্ষতার ধারক। তাই স্বভাব ও দক্ষতা আয়ত্তে থাকার মানেই কাজ আয়ত্তে থাকা। তবে এ ক্ষেত্রে কাজের সংরক্ষণ কিছুটা কম হয়।

চোখে যা দেখা যায় না, সেটার চিত্র সামনে দেখা যেন স্বপ্ন যোগে কোন তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে দেখা। যেমন, একজন স্বপ্নে দেখল, সে মানুষের মুখে ও লজ্জাস্থানে তালা লাগাচ্ছে। (ইবনে সিরীনের কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, লোকটি মুআজ্জিন। রোযার দিনে ফজরের আজান ওয়াক্তের আগেই দেয় বলে মানুষের খাওয়া-দাওয়া ও স্ত্রী সংসর্গ নেয়া বন্ধ হয়ে যায়।)

কিছু লোক তো এরূপ দুর্বল হয় যে, নিজের যা কিছু কাজকেই দক্ষতা ভেবে বসে। কারণ, তার কাছে অন্তর্নিহিত অবস্থাগুলো সুবিন্যস্ত হয়ে ধরা দেয় না। সব কিছু সে দেখে কাজের আবরণে। তাই তাদের ভেতর যা কিছু যোগ্যতা কাজ থেকে জন্মে (স্বতন্ত্র দক্ষতা থাকে না) অধিকাংশ লোকই-এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত কার্যসূচী অনুসরণ অত্যাবশ্যক। শরীয়তের তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত অবস্থার চিন্তা ছেড়ে তাদের আমলের ওপর বেশী জোর দিতে হয়।

কথা থেকে যায় যে, কোন কোন কাজ এমন রয়েছে যার পসন্দ বা অপসন্দের ব্যাপারটি কারো নিজস্ব মনোভাব থেকে হয় না, হয় উচ্চ পরিষদের সরাসরি প্রভাব থেকে। এ ভাবে কোন ভাল কাজ করা যেন সর্বোচ্চ পরিষদের এ ইলহাম গ্রহণ করা 'আমাদের নৈকট্য লাভ কর, আমাদের মত হও এবং আমাদের আলোকে উজ্জ্বল হও।' তেমনি কোন খারাপ কাজ করার ক্ষেত্রে এর বিপরীত প্রভাব আসে।

সর্বোচ্চ পরিষদে কয়েকটি কারণে এভাবে কাজ নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়।

এক, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁরা জানতে পান, অমুক অমুক কাজগুলো না করা হলে কিংবা অমুক অমুক কাজ বর্জিত না হলে মানবীয় জীবন ধারায় পরিবর্তন ও সংস্কার আসবে না। তখন সর্বোচ্চ পরিষদে সে কাজগুলোর রূপরেখা অংকিত হয়। তারপর বিশেষ বিশেষ লোকের কাছে তা আল্লাহর নির্ধারিত বিধান রূপে অবতীর্ণ হয়।

দুই, এ অবতীর্ণ পুণ্য কাজগুলো যখন এক দল মানুষ অহরহ করে চলে, তখন তাতে তাদের পূর্ণ দক্ষতা অর্জিত হয়। তারপর যখন তারা এভাবে সর্বোচ্চ পরিষদের নৈকট্য লাভ করে তখন তাদের এ পসন্দ-অপসন্দ বোধ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অবস্থায় বেশ কিছুদিন কাটাবার পর সেই ভাল ও মন্দ কাজগুলো তাঁদের কাছেও যথার্থ রূপ নিয়ে স্থির হয়ে ধরা দেয়। সেক্ষেত্রে তাঁদের কাজ বা আমলগুলো অতীতের বুযুর্গদের পরীক্ষিত ও বর্ণিত তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকের মতই প্রভাব সৃষ্টি করে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শাস্তি ও পুরস্কারের কারণ

মনে রাখবেন, শাস্তি ও পুরস্কারের কারণ অনেক। তবে তার ভেতর দুটোই মূল কারণ।

এক, মানুষের সুপ্রবৃত্তি (বিবেক) তার কোন খারাপ কাজ বা স্বভাবের প্রতি রুষ্ট থাকে তার এ বিরূপ অনুভূতিই তাকে লজ্জিত, অনুতপ্ত ও আত্মগ্লানিতে বিদগ্ধ করে। অনেক সময় এ কারণে স্বপ্নে কি জাগরণে ভয়াবহ চিত্র তার সামনে ভেসে ওঠে এবং তাকে ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। কোন কোন লোক যেভাবে ইলহামে অন্যান্য জ্ঞান অর্জন করেন, তেমনি তার কাজে ভাল-মন্দ সম্পর্কেও ইলহামে জ্ঞাত হবার যোগ্যতা রাখেন। সে অবস্থায় ফেরেশতাদের মাধ্যমে ঘোষিত হয়, কাজের চিত্রটি তাকে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দাও। এ সম্পর্কেই আল্লাহ পাক বলেন ঃ

সূরা বাক্বারা ঃ আয়াত ঃ ৮১

"হাঁ, যারা পাপ অর্জন করল এবং স্খলন-পতন যাদের ঘিরে ফেলল, তারাই জাহান্নামের সহচর এবং সেখানকার তারা স্থায়ী বাসিন্দা।"

দুই, সর্বোচ্চ পরিষদের ফেরেশতারা বনি আদমের দিকে নিবিষ্ট থাকেন। সর্বোচ্চ পরিষদের সামনে মানবীয় প্রবৃত্তি, চরিত্র ও ভাল-মন্দ কাজের চিত্র মওজুদ থাকে। তাঁরা আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা জানান, 'প্রভু! নেক বান্দাদের শান্তি ও বদ চরিত্রদের শাস্তি দাও।' তাদের এ প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। তখন আদম সন্তানের ওপর ইলহাম অবতীর্ণ হওয়ার মতই শান্তি ও শাস্তি অবতীর্ণ হয়। এ থেকেই মানুষ সুখকর ও দুঃখদায়ক ঘটনার সম্মুখীন হয়। এ পথেই তাঁরা তাঁদের সন্তোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকেন।

কখনও সর্বোচ্চ পরিষদের অসন্তোষের প্রভাবে মানুষ অসুস্থ ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। কখনও তাঁদের সন্তোষের প্রভাব এসে মানুষের স্বভাবের দুর্বলতা দূর করে তাতে দৃঢ়তা এনে দেয়। এভাবে তাঁদের প্রভাবে ফেরেশতাও মানুষ ভাল লোককে শান্তি দেয় ও মন্দ লোককে শাস্তি দেয়। কখনও

মানুষের কৃতকর্মই অঘটন কিংবা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে তার শান্তি ও শাস্তির কারণ হয়।

আসল সত্য হল এই, যে মানুষকে আল্লাহ ভালবেসে সৃষ্টি করেছেন, তাদের তিনি লাগাম ছাড়া হতে দিতে চান না। তাদের কাজের তিনি ভাল-মন্দ দেখবেন না, তা হতে পারে না। যেহেতু আল্লাহ কিভাবে এ ভাল বা মন্দ কাজের প্রতিদান দিবেন তা বুঝা কিছুটা দুস্কর, তাই ফেরেশতার নেক দোয়া ও বদ দোয়ার ফলাফল রূপে তা দেখানো হল। বাদ বাকী আল্লাহই জানেন ভাল।

আমার দ্বিতীয় যুক্তিটির দিকেই আল্লাহ পাকের ইংগিত পাই–

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۔ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ *

সূরা বাক্বারা ঃ আয়াত ঃ ১৬০

"নিশ্চয় যারা কাফের ও কাফের থেকেই মারা যায়, তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষ সবার অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। এ অভিসম্পাতে তারা চির কাল কাটায় এবং এ শাস্তি তাদের কমে না আদৌ ও কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে না।"

এ দু'ধরনের কারণের সান্নিধ্য ও সংমিশ্রণে মানব প্রকৃতির যোগ্যতার বিভিন্নতা অনুসারে নানা ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত কারণ সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রথম কারণটিই মানুষের ব্যক্তিগত স্বভাব ও কাজের ক্ষেত্রে অধিক প্রভাবশালী। সেটি মানুষের স্বভাব ও কাজকে কল্যাণময় ও ধ্বংসকর দুইই করতে পারে। তাই অধিকাংশ (বিবেকবান) জ্ঞানী-গুণীগণ এটাই সমর্থন করেন। এর প্রয়োজনীয়তা কেউই অস্বীকার করতে পারে না।

দ্বিতীয় কারণটি দ্বারা এমন সব কাজ ও স্বভাব নিয়ন্ত্রিত হয় যেগুলো সামগ্রিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে থাকে। অর্থাৎ যে সব স্বভাব ও কাজ

সর্বসাধারণের কল্যাণ ও শান্তির পরিপন্থী এবং মানবীয় জীবন ব্যবস্থা পরিশুদ্ধির অন্তরায় হয়। ফেরেশতা স্বভাব বা বিবেক যাদের দুর্বল, যারা পাপী তাদের স্বভাব ও কাজগুলোই এ ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

শাস্তি ও পুরস্কারের এ দুটো কারণের প্রভাব সৃষ্টির পথে কিছু অন্তরায়ও রয়েছে। সেগুলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রভাব ঠেকিয়ে রাখে। প্রথম কারণটির অন্তরায় হল মানুষের দুর্বল বিবেক ও কুপ্রবৃত্তি। এ অবস্থা বেড়ে গিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে, যখন মানুষের ভেতর পশুত্ব ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তখন তার বিবেক অনুভূতিহীন হয়। কোন কিছুই সেটাকে ব্যথিত করে না। তাই তার দংশনও থাকেনা। তারপর যখন তার স্বভাব থেকে পশুত্বের প্রভাব দূর হয় ও সেখানে বিবেক মাথা চাড়া দিতে থাকে, তখন তার দুঃখ দেখা দিয়ে থাকে।

দ্বিতীয় কারণের প্রভাব ততক্ষণ মুলতবী থাকে যতক্ষণ তাদের ওপর আল্লাহর আজাবের পথে অন্তরায় মওজুদ থাকে। যখন তা দূর হয়ে নির্ধারিত সময় আসে (পুণ্যাত্মার বিলুপ্তি বা পাপাত্মার পূর্ণত্ব প্রাপ্তি ঘটে), তখন আজাবের রাস্তা উন্মুক্ত হয়। চারদিক থেকে তখন বন্যার প্রবাহে আজাব এসে তাদের ভাসিয়ে নেয়। আল্লাহর এ আয়াত তারই সাক্ষ্য বয়ে চলছেঃ–

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ *

সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ঃ ৩৪

“প্রত্যেক দল বা জাতির (পতনের) জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। তাদের সময় যখন এসে যাবে, তখন তার এক মুহূর্তও আগ-পিছ হবে না।”

দ্বিতীয় অধ্যায়

পার্থিব-অপার্থিব শাস্তি-পুরস্কারের রূপরেখা

প্রথম পরিচ্ছেদ (১৪)

পার্থিব শাস্তি-পুরস্কার

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ *

সূরা শূরা ঃ আয়াতঃ ৩০

"অনন্তর যা কিছু বিপর্যয় তোমাদের ওপর নেমে আসে, তা তোমাদেরই স্বহস্তে উপার্জিত বৈ নয়। এবং অনেককে রেহাইও দেয়া হয়ে থাকে।"

অন্যত্র তিনি বলেনঃ-

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ *

সূরা মায়েদা ঃ ৬৬

"যদি তারা তাওরাত, ইঞ্জীল কিংবা যা কিছু তাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে তা বাস্তবায়িত করত তা হলে আকাশ ও পৃথিবীর সব দিক থেকে তারা অফুরন্ত নেয়ামত ভোগ করতে পেত।"

কৃপণ বাগানের মালিক প্রসঙ্গে আল্লাহতা'য়ালা (সূরা নূহে) যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। (বাগানের মালিক তিন ভাই প্রতি মৌসুমে ফসল কাটার সময়ে উপস্থিত ভিক্ষুকদের ভেতর কিছু অংশ বিতরণ করত। একবার রাতারাতি ফসল কেটে ভিক্ষুকদের পৌঁছার আগেই তা ঘরে তোলার অভিলাষ নিয়ে গিয়ে দেখল বাগান জ্বলে গেছে।) মহানবী

(সঃ) কুরআনের

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ

সূরা বাক্বারা ঃ ২৮৪ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ *

(এবং তোমরা যা খুলে বল বা গোপন রাখ, সব কিছুর হিসাব আল্লাহ নেবেন)

* وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَبِهٖ * (এবং খারাপ কাজ করবে তাকে শাস্তি পেতে হবে) আয়াত দুটির ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, ' এ হিসাব নেয়া ও শাস্তি দেয়া আল্লাহ অসুখ-বিসুখ ও অন্যান্য বিপদাপদের দ্বারা কার্যকরী করেন। পকেটের কিছু হারিয়ে যে দুর্ভাবনা ও মনোকষ্ট দেখা দেয় তাও তার ভেতরে শামিল। এ ভাবের বিপদাপদের ভেতর দিয়ে মানুষ তার ছোট-খাট পাপগুলোর কাফফারা দিয়ে দিয়ে এরূপ নিষ্পাপ হবে যেন আগুনে জ্বালিয়ে সোনা খাঁটি করা হল।

জেনে রাখুন, বিবেক রিপুর হাতে মার খেয়েও আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। একটি উপায় হল তার স্বাভাবিক মৃত্যু। দ্বিতীয় উপায় হল তার ইচ্ছা করে মরার মত হওয়া। স্বাভাবিক মৃত্যুতে রিপুগুলোর রুজী রুটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তার বেঁচে থাকার শক্তি এভাবে বিলুপ্ত হয যা আর ফিরে পাবার নয়। এ অবস্থায় ক্ষুৎ-পিপাসা, লোভ-লালসা ও রাগ-দ্বেষ কিছুই তার থাকে না বলে তার ওপর আত্মিক জগতের প্রভাব জমতে থাকে (তাই বিবেক চাংগা হয়)। ইচ্ছা করে মৃত সাজা মানে হল, আত্মিক সাধনা দিয়ে রিপুকে মেরে মেরে নিস্তেজ করা এবং আত্মিক জগতের দিকে মনোনিবেশ করে সেখানকার চিত্রগুলো অন্তরে চিত্রিত করতে থাকা। এর ফলে তার অন্তরে ফেরেশতা স্বভাব বা বিবেকের আলো দেখা দেবে।

এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, সব কিছুই অনুকূল অবস্থায় খুশীতে ফুলে ফেঁপে যায়। তেমনি প্রতিকূল পরিবেশে তা দুঃখে ও হতাশায় ভেংগে পড়ে। (বিবেকের দশাও তাই।)

এও জানা প্রয়োজন, প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট এবং আনন্দ-খুশীর নিজ নিজ বিশেষ আকৃতি-প্রকৃতি রয়েছে। তারা সেই বিশেষ রূপ ধরেই প্রকাশ পায়। যেমন, রক্ত দূষিত হওয়ার প্রকাশ ঘটে দেহে খুজলী পাঁচড়া রূপে। তেমনি পিত্ত গরমের কষ্ট প্রকাশিত হয় দেহের অস্থিরতা ও স্বপ্নে আগুন দেখার মাধ্যমে। কফের কষ্ট সর্দীর প্রচণ্ডতায় ও স্বপ্নে বরফ দেখায় প্রকাশ পায়।

তেমনি বিবেক যখন প্রাধান্য পায় এবং মানুষ তার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে অর্থাৎ নিজের ভেতর পবিত্রতা ও বিনয় সৃষ্টি করে, তখন স্বপ্ন কি জাগরণে আনন্দ ও প্রীতির বিশেষ বিশেষ দৃশ্য ও চিত্র দেখতে পায়। যদি তার বিপরীত কাজ করে তা হলে সে সব অসামঞ্জস্য কাজগুলো এরূপ দৃশ্য ও চিত্রের সৃষ্টি করবে যাতে লাঞ্ছনা ও ভীতির ব্যাপার থাকে। যেমন হিংস্র বাঘকে দেখবে শিকার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ক্রোধ প্রকাশ করতে কিংবা সাপকে দেখবে দংশন উদ্যত কিংবা দংশন করতে ইত্যাদি।

বাহ্যিক তথা পার্থিব পুরস্কার-শাস্তির মূলনীতি হল এই, কারণ সৃষ্টি হলেই কেবল সে কাজগুলো দেখা দেবে। যে ব্যক্তি কার্যকারণ রীতি বুঝে নিবে এবং কোন্ কারণে কোন্ কাজ দেখা দেয় তা খেয়ালে রাখবে, তা হলে সে সুস্পষ্ট জানতে পাবে, আল্লাহ্ পাক পার্থিব জীবনেও পাপীকে শাস্তি থেকে রেহাই দেননা। তবে সংগে সংগে দুনিয়া পরিচালনার (কার্যকারণ) রীতি ব্যাহত করে তিনি তা করেন না (বরং পরকালের জন্য মুলতবী রাখেন)।

ব্যাপারটা এই হয়, পৃথিবীতে পুণ্যবানের শান্তি ও পাপীর শাস্তি লাভের বাহ্যিক কারণ-উপকরণ যদি সৃষ্টি ও সরবরাহ না হয়, তখন পুণ্য কাজ করাতে (আত্মিক) শান্তি ও পাপ কাজ করাতেই (আত্মিক) শাস্তি পেয়ে থাকে। যদি কোন পুণ্যবানের শাস্তির জন্য পার্থিব কারণ সৃষ্টি হয় এবং তা বন্ধ করলে তার পুণ্য কাজের কোন ক্ষতি না হয় তাহলে তার পুণ্য সেটাকে পুরোপুরি বন্ধ করতে কিংবা শাস্তির পরিমাণ ও প্রচণ্ডতা কমাতে সহায়ক হয়। তেমনি কোন পাপীর জন্য যদি শান্তির পার্থিব কারণ সৃষ্টি হয়, তখন তার পাপ সে শান্তির পথে অন্তরায় হয় এবং তা কার্যকর হতে দেয় না। তবে যদি তার কর্মফলের অনুকূল কারণ-উপকরণ সৃষ্টি হয়,তা হলে শাস্তি ও শান্তি দুটোই যথেষ্ট পরিমাণে মিলে। তা বলে পাপ-পুণ্যের ফলাফল দ্বারা

পৃথিবীর রীতিনীতি কখনও বদলানো হয় না। বাহ্যিক ফলাফল দেবার ক্ষেত্রে যেখানে পার্থিব রীতি-নীতি অন্তরায় হয়, সেখানে ফলাফল মুলতবী থাকে। এ কারণেই দেখা যায়, পাপ করেও মানুষ পার্থিব জীবনের স্বল্প পরিসরে বেশ সুখে-শান্তিতে কাটাচ্ছে। পক্ষান্তরে পুণ্য করেও মানুষ যথেষ্ট দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে। পুণ্যবানের এ বাহ্যিক দুঃখ-কষ্ট তার পশু শক্তিকে দুর্বল ও পরাভূত করে থাকে। এভাবে তাকে তার দুঃখ-কষ্টের কল্যাণ বুঝানো হয়। তখন রোগী যে ভাবে রোগমুক্তির আশায় তিক্ত ওষুধ খেতে রাজী হয়, তেমনি পুণ্যবান পার্থিব দুঃখ-কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করে। মহানবীর (সঃ) নিম্ন হাদীসটির মর্মও তাই।

"মুমিন হল নরম ডালের মত। বাতাস কখনও এদিক হেলায়, ওদিক হেলায়, মাটিতে লুটায়, আকাশে উঠায়, এমনকি তার অন্তিম দশা ঘটায় (তবু সে টিকে যায়)। পক্ষান্তরে মুনাফিক মাথা উঁচু করা শক্ত বিটপীর মত। হাওয়া তাকে এদিক-ওদিক হেলাতে পারে না বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেংগে বা উপড়ে ফেলে।"

এ মর্মেই অপর একটি হাদীস এসেছে। তাতে পাই, 'যে মুসলমানেরই অসুখ-বিসুখ কিংবা অনুরূপ কোন বিপদাপদ দেখা দেয় তার ছোট-খাট পাপগুলো ঠিক গাছের পাতার মতই ঝরে যায়।'

অনেক দেশেই শয়তানের আনুগত্য ও অর্চনা জোরে-শোরে করা হয়। সে সব এলাকার লোক আয়েশ-আরাম ও অত্যাচার-উৎপীড়নে পশু ও হিংস্র জীবের মত হয়। এ ধরনের লোকের শাস্তিও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মুলতবী থাকে। নিম্ন আয়াতে তারই ইংগিত পাই–

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا
بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ * ثُمَّ
بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ
عَفَوْا وَّقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ
فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ

الْقُرَى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ *

সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ঃ ৯৪-৯৬

"আমি যখন কোন শহর বা গ্রামে নবী পাঠিয়েছি, তখন সেখানকার লোকদের দারিদ্য ও বালা-মসিবত দিয়ে (আল্লাহর দিকে) ফিরে আসার ব্যবস্থা করেছি। যখন তাতেও ফল হয়নি, তখন তাদের দুঃখ-দুর্দশার স্থলে সুখ-সচ্ছলতা দিয়ে ধন্য করেছি তা দেখে তারা বলাবলি করতে লাগল, আমাদের বাপ-দাদার জীবনেও এভাবে সুদিন-দুর্দিনের পালাবদল হয়েছে (পাপ-পুণ্যের এতে কোন দখল নেই)। তারপর হঠাৎ আমি এমনভাবে পাকড়াও করলাম যে, তারা ভাববারও অবকাশ পেল না। যদি এলাকার লোকরা ঈমান আনত এবং আমার কথা মতে ভাল হয়ে চলত, তা হলে আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের ভাণ্ডার তাদের জন্য খুলে দিতাম। কিন্তু তারা আমার কথাকে মিথ্যা বলে উড়াল তাই আমিও তাদের এ পাপের বিনিময়ে আপদ-বিপদের ফাঁদে ফাঁসিয়ে নিলাম।"

মোট কথা, এ দুনিয়ায় পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারটা হল এই, প্রভু যেন ভৃত্যকে যখন তখন পূর্ণ বিনিময় দিতে প্রস্তুত নন। পূর্ণ অবসর নিয়ে তিনি তা করার জন্য সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন। সেটা হল শেষ বিচারের দিন। আল্লাহ্ পাকের নিম্ন বাণীতে তারই ইশারা রয়েছেঃ

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ ঃ

সূরা আর-রাহমান ঃ আয়াতঃ ৩১

"হে জ্বীন ও ইনসান! শীঘ্রই আমি তোমাদের (প্রতিদান দেবার) জন্য অবসর গ্রহণ কর।"

পার্থিব শাস্তি ও পুরস্কারের কয়েকটি অবস্থা দেখা যায়। কখনও এভাবে হয় যে, মানুষের আনন্দ ও স্বস্তি কিংবা দুঃখ ও অস্বস্তি দেখা দেয়। কখনও এমন হয় যে, দুর্ভাবনায় শারীরিক অসুস্থতা বা রোগ-ব্যাধি দেখা দেয়।

নবুয়তের আগে মহানবীর (সঃ) একবার দেহাবরণ খসে পড়ায় তিনি লাজে-ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। এও ঠিক সেরূপ রোগ-ব্যাধি। তেমনি কখনও পার্থিব পুরস্কার ধন-সম্পদের মাধ্যমে দেয়া হয়। কখনও মানুষ, পশু ও ফেরেশতাদের কাছে ইলহাম আসে, অমুকের সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রাখ। কখনও বা মানুষ নিজেই ইলহাম পেয়ে ভাল বা মন্দ অবস্থার সম্মুখীন হয়।

যে ব্যক্তি আমার উপরোক্ত আলোচনা ভাল ভাবে বুঝে নিবে এবং প্রতিটি কথা যথাস্থানে রেখে বিচার বিবেচনা করবে, সে অনেক জটিলতা থেকে বেঁচে যাবে। অন্যথায় সে মহানবীর (সঃ) হাদীসে পরস্পর বিরোধ দেখে মতভেদ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হবে। সে দেখতে পাবে, এক হাদীসে তিনি বলছেন, পুণ্য কাজে রুজী বাড়ে এবং পাপে তা কমে। পক্ষান্তরে অন্য হাদীসে বলছেন, পাপীদের পার্থিব জীবনের স্বল্প পরিসরে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেয়া হয় এবং পুণ্যবানদের আপদ-বিপদ ও দুঃখ-দুর্দশা দেয়া হয়। এমন কি যে যত বড় পুণ্যবান তাকে তত বেশী পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দেয়া হয়। এ ভাবের বিভিন্ন স্তরের আরও বহু হাদীসে আপাত বিরোধ ও তা থেকে উম্মতের ভেতর মতভেদ দেখা যায়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মৃত্যুরহস্য

জেনে রাখুন, ধাতব পদার্থ, উদ্ভিদ, পশু ও মানুষ এ সব স্তরের সৃষ্টির চার ধরনের ধারক ও ক্রিয়া-প্রক্রিয়া রয়েছে। যদিও আপাত দৃষ্টিতে কথাটি নিঃসংশয় মনে হয় না। মৌল উপাদানগুলো (আগুন, বায়ু, পানি ও মাটি) যখন অণু-পরমাণু আকারে সংঘাত মিলনের ব্রতে নিরত থাকে, তখন তা থেকে কয়েক ধরনের যৌগিক বস্তু সৃষ্টি হয়। যেমন দুই উপাদানের মিশ্রণজাত তাপ বা বাষ্প, ধূলা, ধোঁয়া, সতেজ মাটি, চাষের জমীন, অংগার, শিখা ইত্যাদি। তিন উপাদানের মিশ্রণজাত যেমন, ছানা মাটির বস্তু, কাদা মাটি ইত্যাদি। তেমনি চার উপাদানের মিশ্রণজাত বস্তুও রয়েছে।

এ সব জিনিসের বৈশিষ্ট্য বলতে এর অন্তর্ভুক্ত উপাদানেরই বিশেষত্ব বৈ নয়। মিশ্রিত উপাদানের বাইর থেকে কোন গুণ এতে আসতে পারে না,

ভেতরেও নতুন কোন গুণের উদ্ভব হতে পারে না। এ ধরনের বস্তুকে শূন্যাবস্থার বা প্রাথমিক সৃষ্টি বলা হয়। (বাষ্প, পানি ও আগুনের এবং ধূলা,মাটি ও বায়ুর মিশ্রণজাত সৃষ্টিগুলো তাদের অন্তর্ভুক্ত।)

এ স্তরের পরে আসে ধাতব যুগ। উক্ত মিশ্রণজাত বস্তুগুলোকে অনুগত বাহক বানিয়ে খনিজ পদার্থের আবির্ভাব ঘটেছে। ধারকের বৈশিষ্ট্যই তার বৈশিষ্ট্য। ধারকের প্রকৃতিকে সে নিজের ভেতর সুরক্ষিত রাখে।

তৃতীয় স্তরে আসে উদ্ভিদ যুগ। ধাতব যুগের ওপর আরোহণ করেই তার আগমন। তবে তার শক্তি এত বেশী যে, অংশের উপাদান ও প্রাথমিক সৃষ্টিগুলোকে বদলে সে নিজ প্রকৃতিতে গড়ে তোলে। ফলে সে সব অংশগত উপাদানাদির প্রয়োজনীয় প্রভাব প্রক্রিয়া প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যমান থাকে।

এরপর আসে প্রাণীর স্তর। এ স্তরে বস্তুর ভেতর প্রকৃতিগত প্রাণের (খাদ্যগ্রহণ ও বর্ধন শক্তি) উন্নয়ন দেখা দেয় এবং প্রকৃতিগত প্রাণকে বাহন করেই জৈবিক প্রাণের আগমন ঘটে। এ স্তর প্রকৃতিগত প্রাণে অনুভূতি ও ইচ্ছার সংযোগ ঘটায়। ফলে নিজ আকাঙ্ক্ষিত ও উপকারী জিনিস অর্জনের জন্য প্রাণীরা উদ্যোগী ও প্রয়াসী হয়। তেমনি ক্ষতিকারক ব্যাপার থেকে তারা দূরে থাকে।

অবশেষে আসে মানুষের স্তর। জৈবিক প্রাণকে বাহন করে এর আগমন ঘটে। এ স্তরে জৈবিক প্রাণের সাথে বিচার-বুদ্ধিরও সংযোগ ঘটে। তাই এ প্রাণ চরিত্র ও দক্ষতার ওপর জোর দেয়। মানে, ভাল হতে ও ভাল কাজ করতে বলে এবং মন্দ হতে ও মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে। এ উদ্দেশ্যে সে নৈতিক অনুভূতি ও চিন্তাশক্তি চাংগা রাখে। এবং তাদের উত্তম নীতি নিয়মের আওতায় সুবিন্যস্ত করে নেয়। এমন কি সেটাকে উর্ধ জগত থেকে পাবার সব কিছুর যোগ্য ধারক রূপে গড়ে তোলে।

আপাত দৃষ্টিতে এ কথাগুলো যতই সংশয়মূলক মনে হোক না কেন, ভেবে দেখলে বুঝতে পাবেন, প্রতিটি প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াকে তার নিজ স্বতন্ত্র উৎসের সাথে সম্পৃক্ত করতে হয়। তেমনি প্রত্যেক ধরনের সৃষ্টিকে তার নিজস্ব বাহনে বসিয়ে নিতে হয়। এটাও জানা প্রয়োজন, প্রতিটি ধরনের জন্য একটি ভিত্তিমূল থাকা দরকার। তার সাথে যেন সৃষ্টিটি স্থির থাকতে পারে। ধারকটির অবশ্যই ধরনটির উপযোগী হতে হবে। ধরনের

ধারকটির প্রয়োজনীয়তা ঠিক মোমের পুতুলের যে ভাবে মোম প্রয়োজন তেমনি।

সুতরাং যে ব্যক্তি বলে, মানবের প্রকৃতিগত প্রাণ মৃত্যুর পর মানব দেহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়, সে ভুল বলে। হাঁ, এ কথা সত্য যে, মানব প্রকৃতির দুটো উপাদান থাকে (যার ভিত্তিতে তার সৃষ্টি) একটি মৌলিক। সেটাকে প্রকৃতিগত প্রাণ বলে। দেহের সাথে তার যোগ প্রত্যক্ষ। দ্বিতীয় উপাদানটি কৃত্রিম। সেটাকে জড়দেহ বলে (তার সাথে থাকে পরোক্ষ সম্পর্ক)। তাই মানুষ যখন মারা যায়, তখন জড় দেহ বিচ্ছিন্ন হয় বটে, তাতে প্রকৃতিগত প্রাণের কোন ক্ষতি হয় না। বরং প্রকৃতিগত প্রাণের সাথে জড় দেহের সম্পর্ক থেকে যায় অবিচ্ছেদ্য। একজন সুদক্ষ শিল্পীর হাত কেটে ফেললেও তার শিল্প ক্ষমতা যেমন যথারীতি অক্ষুণ্ন থাকে এও তেমনি ব্যাপার। তেমনি কোন দ্রুত গতির মানুষের পা কেটে ফেললে কিংবা কোন দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির মানুষের চোখ ও কান হারালে তার চলার, শোনার ও দেখার শক্তি বহাল থেকে যায়, প্রকৃতিগত প্রাণ-মনেরও ঠিক সেই অবস্থা। উপাদান ছাড়াই শুধু প্রকৃতিগত প্রাণের সাথেই সে সম্পৃক্ত থাকতে পারে।

জানা দরকার, মানুষের কার্যকলাপ কয়েক ধরনের হয়। কিছু কাজ তারা মনের ইচ্ছায় করে থাকে। যদি তাকে বাধা না দেয়া হয়, তা হলে সে তা কার্যকরী করবে এবং খেয়াল-খুশীর বিরুদ্ধে সে কখনও যাবে না। কিছু কাজ তারা প্রকৃতিগত প্রয়োজনের তাগাদায় কিংবা বাইরের কোন প্রভাবে পড়ে করে থাকে। যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি। যখন সে সবের কারণ চলে যায়, তখন তা করার ইচ্ছাও চলে যায়। অবশ্য সেগুলোকে স্থায়ী অভ্যেসে পরিণত করে নিলে অন্য কথা।

দেখুন, এরূপ অনেক লোক আছে যারা কোন বিশেষ ব্যক্তি কিংবা কবিত্ব অথবা বিশেষ কোন জিনিসের প্রতি আসক্ত হয়। তখন তারা ভালবাসার ব্যক্তি বা বস্তুর অনুকূল পোশাক-আশাক ও চাল-চলন অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু যদি তারা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকত, তা হলে তা বর্জন করে চললে তাদের কোনই অসুবিধা হত না। কিছু লোক অবশ্য এমন হয় যে, অন্তর থেকেই সে অনুরূপ পোশাক-আশাক ও চাল-চলন

পসন্দ করে। তখন তাকে স্বাভাবিক অবস্থায়ও সেই পোশাক ও ঢং অনুসরণ করতে দেখা যাবে।

তেমনি কিছুলোক এরূপ স্মরণ শক্তি রাখে যে, নানা ধরনের কথা-বার্তার ভেতর থেকে সে তার প্রয়োজনীয় কথাগুলো বেছে নিয়ে স্মরণ রাখে। তার দৃষ্টি থাকে আলোচনার দিকে, ফলাফলের দিকে নয়। বাক চাতুর্যই তাকে আকৃষ্ট করে এবং বাক চাতুর্যের দক্ষতা কোত্থেকে এল তা নিয়ে তার ভাবনা নেই। এক ধরনের বেখেয়াল লোক এমন থাকে যে, মূল কথা ছেড়ে আজে বাজে কথায় ডুবে থাকে। তার নজরে কারণ আসে না, আসে শুধু কাজ। ফলে কাজের প্রাণ সম্পর্কে উদাসীন থেকে কাজের রূপই তার স্মরণে রাখে।

জেনে রাখুন, যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার জড় দেহটি পচে-গলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তার প্রকৃতিগত প্রাণ জৈবিক প্রাণের সাথে সংযোগ রাখে। তবে তার ভেতর (পার্থিব প্রয়োজনে) যে বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল, তা থাকে না। ফলে তার উদ্দেশ্যমূলক কাজ ছাড়া পার্থিব প্রয়োজনে যেগুলো করতে হত, তা আর প্রকাশ পায় না। শুধু যে সব উদ্দেশ্যমূলক নৈতিক কাজ তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দেখা দিত, সেগুলোই তার আসল প্রাণের সাথে থেকে যায়। তখন তার জীবনে বিবেক প্রাধান্য পায় ও রিপু অবদমিত হয়। তারপর যখন ঊর্ধতন জগৎ থেকে তার অন্তরে হাযিরাতুল কুদুস এবং তার সুরক্ষিত কৃতকার্যের আলোকপাত ঘটে, তখন তার বিবেক হয় দুঃখ পায়, নয় আনন্দ লাভ করে।

এটাও জানা দরকার, যখন বিবেক (পার্থিব জীবনে) রিপুর সাথে মিলে-মিশে সমঝোতা করে চলে, তার কিছু না কিছু প্রভাব বিবেকে ঢুকে যায় এবং বিবেককে তা মেনে চলতে হয়। কিন্তু সব চাইতে ক্ষতিকর ও খারাপ ব্যাপার হল এই, বিবেকে তার উদ্দেশ্য ও পরিণতির বিপরীত অভ্যেস ও অবস্থার সৃষ্টি হওয়া। তেমনি সব চাইতে উত্তম ও কল্যাণকর ব্যাপার হল এই, বিবেকে তার অভ্যেস ও অনুকূল অবস্থাকে বহাল তবিয়কে কায়েম রাখা।

মোট কথা, খারাপ ব্যাপারের আরেক দিক হল, অন্তরে সম্পদ ও সন্তান- সন্ততির এরূপ মায়া হওয়া যে, দুটি ছাড়া জীবনে অন্য কোন

উদ্দেশ্য আছে বলে মনে না করা। দ্বিতীয় দিক হল, অন্তরে এমন সব সাধারণ খারাপ অভ্যেস ও অবস্থা মুদ্রিত হয়ে যাওয়া যা মানুষকে ধার্মিক ও ভাল হওয়া থেকে সরিয়ে রাখে। তৃতীয় দিক হল এই, অন্তরকে এরূপ অপবিত্র ও আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীন রাখা যে, না কখনও সে আল্লাহকে জানতে চাইবে, না তাঁর সামনে সবিনয়ে আনত থাকবে। মোট কথা অন্তরে পবিত্রতা ও কল্যাণময়তার বিপরীত কিছু সৃষ্টি হতে দেয়া। চতুর্থ ব্যাপার এই, অন্তরের গতি সত্যের সহায়তা ও আল্লাহ-রাসূলের নির্দেশকে মর্যাদা দান এবং সাধারণ কল্যাণ প্রতিষ্ঠার কাজে ঊর্ধতন জগতের কার্যক্রমের বিরোধী হওয়া। এমন কি তার ফলে তার উপর ঊর্ধতন জগতের শত্রুতা ও লা'নত আসে।

মোট কথা, ভাল দিকের ভেতর একটি হল এই, এরূপ ভাল কাজ করা যাতে অন্তরের পবিত্রতা ও আল্লাহর সকাশে বিনয় অর্জিত হয়। এমন কি ফেরেশতাদের অবস্থা যেন স্মরণে আসে। তা ছাড়া এমন সব ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার দিকে যেন খেয়াল যায় যাতে মানুষ শুধু পার্থিব জীবন নিয়েই তৃপ্ত না থাকে। দ্বিতীয় দিক হল এই, মানুষটি যেন ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার পুতুল ও নম্র- দয়ার্দ্র অন্তরের হয়ে যায়। তৃতীয় কথা হল, মানুষ যেন এরূপ পবিত্র থাকে যাতে করে ঊর্ধতন জগতের দোয়া এবং তাদের সুনজর বহাল থাকে এবং সে যেন কল্যাণের জীবন বিধান অনুসরণ করে চলে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

কবরে মানুষের অবস্থা

জেনে রাখুন, কবরের অন্তর্বর্তী জীবনে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা ও মর্যাদা দেখা দেয়। সে সব অবস্থা ও স্তরের সংখ্যা অশেষ। তবে প্রধান অবস্থা ও স্তর হল চারটি। প্রথম শ্রেণীর লোক সচেতন প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাদের সামনে তাদের কৃত ভাল বা মন্দ কাজগুলো স্বরূপে দেখা দিলে তথা অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হলেই তারা সুখ বা দুঃখ লাভ করে থাকে। নিম্ন আয়াতে সেটাই ইংগিত করা হলঃ

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَّحَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّٰهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ *

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৫৬

“(যেন কেয়ামতের দিন) কেউ এ কথা না বলে, হায়, আল্লাহর ব্যাপারে কেন ত্রুটি-বিচ্যুতি করে এলাম। তখন তার এ কথা হাস্যকরই হবে।”

আমি এমন এক দল আল্লাহর ওলি দেখেছি, যাদের মন ঠিক শান্ত পানিপূর্ণ পুকুরের মতই প্রশান্ত। বাতাসে সে পানিতে ঢেউ খেলে না। তাই ঠিক দুপুরে মধ্যাহ্ন সূর্যের আলো যখন তার বুকে পড়ে, তখন সেটা এক খণ্ড নূরের টুকরার মতই হয়ে যায়। তাদের সে নূর হল পুণ্য কাজ কিংবা পুণ্য স্মৃতি (আল্লাহর ধ্যান) অথবা আল্লাহর রহমতের নূর।

দ্বিতীয় ধরনের লোক তাদেরই কাছাকাছি হয়ে থাকে। কিন্তু তারা স্বাভাবিক নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে এবং যা কিছু স্বপ্নেই পেয়ে থাকে। স্বপ্নে আমরা স্বভাবতঃ তা-ই দেখি, যা আমাদের মিশ্র অনুভূতিতে মওজুদ থাকে। সজাগ অবস্থায় সেদিকে খেয়াল যায় না কিংবা মনোযোগ থাকে না। শুধু কতিপয় ধারণা রূপে অন্তরে সেগুলো সঞ্চিত হয়ে থাকে। স্বপ্নে সেগুলোই হুবহু রূপ ধরে আমাদের কাছে ধরা দেয়। যেমন, তপ্ত পিত্তের মানুষ স্বপ্নে দেখতে পায়, প্রচণ্ড গ্রীষ্মে সে এক জংগলে অবস্থান করছে। ভীষণ গরম হওয়া বয়ে চলছে। হঠাৎ জংগলে আগুন লেগে গেল। সে আগুন চারদিক থেকে তাকে ঘিরে নিল। সে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে পালিয়ে বাঁচার জন্য। কিন্তু পালাবার জায়গা পাচ্ছে না। ফলে সেই আগুনে সে জ্বলে মরছে। এভাবে তার ভীষণ কষ্ট ভুগতে হয়। তেমনি সর্দী-কাশীতে আক্রান্ত ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, শীতের রাতে সে নৌকায় কোথাও যাচ্ছে। নদীর পানিও ভীষণ ঠাণ্ডা। কন কনে শীতল হাওয়া বয়ে চলছে। এমন সময় হঠাৎ তুফান এসে তার নৌকা উল্টে ফেলল। তখন সে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগল। কিন্তু বাঁচতে পারছিল না। ডুবে মরতে বসে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিল।

মানুষের ভেতর অনুসন্ধান চালিয়ে আপনি এরূপ বিচিত্র অবস্থার লোক পাবেন যারা নিজ জীবনের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ধারণা ও ঘটনা সুখ বা দুঃখের স্বপ্ন রূপে নিদ্রাবস্থায় অর্জন করে। সেগুলো সাধারণত অভিজ্ঞতা অর্জনকারীর ধ্যান-ধারণা ও স্বভাবের অনুকূল হয়ে থাকে। তেমনি দ্বিতীয় ধরনের ব্যক্তির কবর জীবনে পাপ বা পুণ্যের ফল এভাবে স্বপ্নেই লাভ করবে। পার্থক্য শুধু এতটুকু, এ এমন এক স্বপ্নকাল বা নিদ্রা যা থেকে মানুষ কেয়ামতের আগে মুক্ত হয় না। স্বপ্নদ্রষ্টা কখনও স্বপ্নে জানতে পায় না যে, স্বপ্ন তার বাস্তব নয়, শুধুই স্বপ্ন। এও বুঝতে পায় না যে, আসলে তার কোন সুখ বা দুঃখ হচ্ছে না। বরং স্বপ্নকেই সে সত্য ভেবে থাকে। এখন যদি তার এ স্বপ্ন কেয়ামতের আগে শেষ না হত অর্থাৎ সে জাগ্রত না হত, তা হলে বাস্তব যে অন্যকিছু তা সে কোন দিনই জানতে পেত না। সুতরাং কবর জীবনকে স্বপ্ন জীবন না বলে বাস্তব জীবন বলাই অধিক সংগত।

এ কারণেই হিংস্র প্রকৃতির লোক কবর জীবনে দেখতে পায়, তাকে কোন হিংস্র জীব ছিঁড়ে খাচ্ছে। কৃপণরা দেখতে পায়, তাদের সাপ-বিচ্ছু দংশন করে চলছে।

তারপর উর্ধতন জগতের জ্ঞান থেকে যারা বঞ্চিত ছিল, তারা দেখতে পায়, দু'ফেরেশতা (মুনকার-নাকীর) এসে উর্ধতন জগতের তত্ত্ব জিজ্ঞেস করল। তারা প্রশ্ন করছে, 'তোমার প্রভু কে?' 'তোমার দ্বীন কি?' 'তোমার রাসূল কে?' ইত্যাদি।

তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের ভেতর পশুত্ব ও দেবত্ব দুটোই দুর্বল বলে মরার পর তারা কবর জীবনে নিম্ন স্তরের ফেরেশতাদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। কখনও নিজেদের প্রকৃতিগত ও জন্মগত কারণে, কখনও আবার অন্য কোন কারণে তারা সেরূপ করে থাকে। প্রকৃতিগত কারণ হল এই, তার দেবত্ব পশুত্বের প্রভাবে কমই আচ্ছন্ন হত। তারা না সে নির্দেশ মানত, না প্রভাব স্বীকার করত। অন্য কারণের একটি হল এই, সে ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা দাবিয়ে রেখেছে ও ভালভাবে এ পথে স্থির রয়েছে। তারপর আত্মিক সাধনা চালিয়ে দেবত্বের জ্যোতি ও ইলহাম অর্জন করেছে। কখনও

দেখা যায়, নপুংসক ব্যক্তি পুরুষ আকারে জন্ম নিয়েও নারী প্রকৃতি ও স্বভাবের হয়ে থাকে। যদিও শৈশবে পুরুষ ও নারীর বাসনা কামনার স্বাতন্ত্র্য সে উপলব্ধি করে না। কারণ, সে বয়সটি হল খাওয়া-দাওয়া আর খেলা-ধূলার বয়স। তখন তার সে সবের দিকে খেয়ালই থাকে না। তখন যদি তাকে পুরুষের চাল-চলনে অভ্যস্ত করা হয় এবং নারীর চাল-চলন রোধ করা হয়, তা হলে সে ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায়, পুরুষ স্বভাবেরই হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন সে যুবক হয় এবং নিজ স্বভাবে বেপরোয়া হয়, তখন সঠিক ভাবেই সে নারী প্রকৃতির ওপর জমে বসে। ফলে চলনে-বলনে, আচার-আচরণে ও ইচ্ছায় অভিলাষে সে পুরোপুরিই নারী হয়ে যায়। এমন কি যৌন ক্ষেত্রেও সে কর্তার ভূমিকা ভুলে কর্মের ভূমিকা পালন করে চলে। এভাবে বেশ কিছুকাল চলার পর দেখা যাবে, সে পুরুষের সমাজ ছেড়ে নারী সমাজেই বিচরণ করে ফিরছে।

ঠিক এ অবস্থাই দাঁড়ায় মানুষের অন্যান্য ক্ষেত্রেও। মানুষ তার পার্থিব জীবনে খাওয়া-পরা, বাসনা-কামনা এবং অন্যান্য রীতি-নীতিও প্রয়োজন সম্পাদনে নিয়োজিত থাকে। কিন্তু নিম্ন স্তরের ফেরেশতাদের সাথে তাদের আত্মিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। তাই আকর্ষণও সেদিকে থাকে। যখন সে মরে যায় এবং জড় দেহ থেকে মুক্তি পায়, তখন সে সেই মূল স্বভাবে ফিরে যায় এবং ফেরেশতাদের সমাজে গিয়ে ঠাঁই নেয়। তখন তাদেরও ফেরেশতাদের মত ইলহাম হয়। তাদেরও পাখা পালক হয়। হাদীসে আছে, 'আমি জাফর ইবনে আবু তালিবকে জান্নাতে পাখায় ভর করে ফেরেশতাদের সাথে উড়তে দেখেছি।'

তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ কখনও আল্লাহর বাণীকে উচ্চকিত করার কাজে এবং আল্লাহর দলের সহায়তায় নিয়োজিত থাকেন। কখনও বা মানুষের পুণ্যের খেয়াল উদ্রেক করেন। কখনও তাদের কিছু লোকের স্বভাবগত আকাঙ্ক্ষা জাগে দেহ ধারণের। তাই স্বরূপ জগতের দুয়ার খুলে যায়। তখন তার জৈব প্রাণে এক ঐশী শক্তি এসে যায় এবং সেটা একটা জ্যোতির্ময় দেহের অধিকারী হয়। কখনও তাদের কিছু লোক খাওয়া-দাওয়া করতে চায়। তখন তাদের সে ইচ্ছা পূরণের জন্য তারা যা খেতে চায়

তার সুব্যবস্থা করা হয়। কুরআন মজীদের নিম্ন আয়াতে তারই ইংগিত দেখতে পাইঃ

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَرَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ * فرحين بما اتاهم الله من فضله *

[সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৬৯

"আল্লাহর পথে যারা প্রাণ দিল তাদের মৃত ভেব না। বরং তারা জীবিত। নিজ প্রভুর কাছে তারা রুজী পেয়ে থাকে। আল্লাহদত্ত খোরাক খেয়ে তারা খুশীতে মাতোয়ারা থাকে।"

এ সব শ্রেণী ছাড়া শয়তানের প্রভাবিত শ্রেণীও রয়েছে। তারাও স্বভাবগত কিংবা অন্য কারণে এরূপ খারাপ প্রকৃতির হয় যে, তাদের চিন্তা-ভাবনা সর্বদা ন্যায়ের পরিপন্থী, সৃষ্টির নিয়ম-শৃংখলা বিরোধী ও সচ্চরিত্রতার অন্তরায় হয়ে তাকে। তারা ইচ্ছা করেই এ ধরনের হীন ও জঘন্য চিন্তা ও অভ্যেস অনুসরণ করে থাকে। তাই আল্লাহর অসন্তোষ ও অভিশাপ তাদের ঘিরে রাখে। তারা মরে গিয়ে শয়তানের দলে মিলিত হয়। তাদের কালো পোশাক পরানো হয় এবং তাদের ইতর কাজ ও স্বভাবগুলো স্বরূপে তাদের সামনে দেখা দেয়।

প্রথম শ্রেণীর লোকগুলোর অন্তরে আনন্দ থাকে বলে তারা স্বভাবতই তাদের পুরস্কার পেয়ে যায়। দ্বিতীয় শ্রেণী তাদের কৃতকার্যের স্বরূপ ও পরিণতি দেখে দুঃখ ও অনুতাপে দগ্ধ হয় বলে স্বভাবতই শাস্তি ভোগ করে। খোঁজারা যেভাবে নিজেদের মানব সমাজের নিকৃষ্টতম পর্যায়ে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত মানসিক যাতনা ভুগতে থাকে, তা থেকে কোন মতেই অব্যাহতি পায় না, এও তেমনি ব্যাপার।

শ্রেণী বিন্যাসকারীদের দৃষ্টিতে আরও এক ধরনের লোক রয়েছে। তারা হল সমঝোতাকারীর দল। তাদের ভেতর জৈবিক দিক প্রবল ও আত্মিক

দিক দুর্বল থাকে। অধিকাংশ লোকই এ শ্রেণীভুক্ত। তাদের অধিকাংশ কাজই জৈব স্বভাবের হয়ে থাকে। জৈবিক চাহিদা পূরণেই তারা ব্যস্ত থাকে। এ শ্রেণীর লোকের দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না; বরং বাস্তব সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে চৈন্তিক সম্পর্কটা থেকে যায়। তার প্রবৃত্তি কখনও ভাবতে পারে না যে, দেহের সাথে তার সম্পর্কচ্ছেদ ঘটেছে। তাই (মর) দেহটি যদি তার কেটে কুটে টুকরা করা হয় তো ভাবে যে, তাকেই তা করা হচ্ছে। তাদের বৈশিষ্ট্য হল এই, আন্তরিক ভাবেই তারা দেহগত প্রাণ হয় অর্থাৎ দেহকেই প্রাণ ভেবে থাকে। কিংবা মনে করে, দেহছাড়া প্রাণের আলাদা অস্তিত্ব নেই। হয়ত সে বিশেষ সমাজ বা মতাদর্শের আওতায় পড়ে মুখে অন্যরূপ কথা বলে থাকে।

এ ধরনের রোক মারা গেলে স্বরূপ জগতের হাল্কা জ্যোতি তাদের ওপর দেখা দেয়। তাদের ভেতর দেখা দেয় উদভ্রান্ত খেয়াল ও ধ্যান-ধারণা। এখানে আত্মিক সাধনাকারীদের যে অবস্থা দেখা দেয়, তাদেরও ঠিক সেই আবস্থা দেখা দেয়। তাদের কৃত কাজকর্ম কখনও খেয়ালী রূপ নিয়ে, কখনও স্বরূপ জগতের অন্যান্য বস্তুর মত বাস্তব রূপ নিযে তাদের সামনে দেখা দেয়। আত্মিক সাধনাকারীদের সামনে যে ভাবে সব কিছু স্বরূপে দেখা দেয়, এও তেমনি ব্যাপার।

এখানে যদি তারা ফেরেশতা সুলভ কাজ করে থাকে, তা হলে সেগুলো তাদের ফেরেশতা আকারে দেখানো হয়। তাদের হাতে থাকে নরম রেশমী কাপড়। তাদের সাথে তারা খুব নম্র ও ভদ্রভাবে মিলে-মিশে ও কথা-বার্তা বলে। তাদের জন্য জান্নাতের জানালা খুলে ধরা হয়। তাই তারা জান্নাতের ঘ্রাণ পেতে থাকে। যদি তারা পশু সুলভ খারাপ কাজ করে থাকে ও অভিশপ্ত হয়, তা হলে তারা কাজগুলো সে ভয়াবহ ও কুৎসীত ফেরেশতা রূপে দেখতে পাবে। তারা কালো চেহারা নিয়ে বিকট আওয়াজে রূঢ় ভাষায় কথা বলবে। সেখানে যেমন ক্রোধকে হিংস্র জীব ও কাপুরুষতাকে খরগোশ আকারে দেখানো হবে, এও তেমনি দেখানো হবে।

কবর জগতে এমন সব ফেরেশতা রয়েছেন যাদের নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে কাজে নিয়োজিত রাখা হয়েছে। এ জগতে আগমনকারী মানুষদের শান্তি বা শাস্তি দেবার কাজেও তাদের ব্যবহার করা হয়। সুতরাং শান্তিপ্রাপ্ত

কিংবা শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিরা তাদের দেখতে পেত না।

জেনে রাখুন, কবর জগত কোন আলাদা জগত নয়। এ জগতেরই পরিশিষ্ট বা শেষাংশ। সেখানে সে কিছু গায়বী খবর জানতে পায় মাত্র। প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ অবস্থা সেখানে প্রকাশ পায়। বিচার জগতের ব্যাপার অন্যরূপ। সেখানে মানুষের ব্যক্তিগত অবস্থা লোপ পেয়ে সকল মানুষের সামগ্রিক অবস্থা প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি কাজগুলোর স্ব স্ব রূপে আত্মপ্রকাশের ব্যাপারটি কবর জীবনেই শেষ হবে। বিচার জীবনে তার কাজের সামগ্রিক বিচার-বিবেচনা হবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিচার জগতের তত্ত্বকথা

জেনে রাখুন, মানব প্রাণের বিশেষ একটি প্রত্যাবর্তন স্থল রয়েছে। লোহাকে যেভাবে চুম্বক টেনে নেয়, তেমনি টেনে নেয় প্রাণকে তার উৎসভূমি। সে জায়গার নাম হল, 'হাযিরাতুল কুদ্স' বা পবিত্র মজলিস। সব প্রাণই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেখানকার ধারক প্রাণ বা শ্রেষ্ঠতম প্রাণের সাথে মিলিত হয়। রাসূল (সঃ) সে প্রাণের আখ্যা দিয়েছেন বহুমুখী ও বহু ভাষী প্রাণ। এ সমাবেশ স্থলকে স্বরূপ জগত বা উপমা জগত যা ইচ্ছা বলতে পারেন। সেখানে মানব জাতির আদি নকশা বা চিত্র তৈরী হয়। এখানে ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যমূলক রীতি-নীতি ও কার্য-কলাপ লোপ পেয়ে তা মানব জাতির সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের ও বিধি-বিধানের সাথে একাত্ম হয়। অন্য কথায়, তার জড় বৈশিষ্ট্যের ওপর আত্মিক বৈশিষ্ট্যের বা রূপের ওপর স্বরূপের প্রাধান্য ঘটে এবং সেটাই অবশিষ্ট থাকে।

কথাটির ব্যাখ্যা এই, কিছু ব্যাপার মানুষের নেহাৎ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যমূলক। সেগুলোই একটি মানুষকে অপর মানুষ থেকে পৃথক করে দেখায়। তেমনি কতকগুলো ব্যাপার সব মানুষের ভেতর সমানে পাওয়া যায়। সুতরাং যে ব্যাপারগুলো সব মানুষের ভেতরেই সমভাবে বিদ্যমান,

স্বভাবতই সেগুলো মানবের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। সেগুলোই হল মানব প্রকৃতি। 'প্রতিটি মানব শিশু তার প্রকৃতির ধর্ম (ইস্‌লাম) নিয়ে জন্ম নেয় তার মা-বাপ (পরিমণ্ডল) তাকে অন্যান্য ধর্মে দীক্ষা দেয়' হাদীসটি এ সত্যেরই প্রমাণ দেয়।

সৃষ্টির প্রত্যেকটি জাতির বিশেষ প্রকৃতি বা রীতি-নীতির দুটি দিক রয়েছে। তার একটি দিক হল বাহ্যিক। যেমন তার জন্ম, আকৃতি, বর্ণ, পরিমাপ, স্বর ইত্যাদি। যে সত্তার ভেতর যে শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যাবে, তাকে সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে। কারণ, উপাদানে অভাব বা ত্রুটি না থাকলে শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা মতেই সৃষ্টিটি গড়ে উঠবে। যেমন, মানুষ মাত্রেই সরল আকৃতির, বাকসম্পন্ন ও মসৃণ ত্বকবিশিষ্ট হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ঘোড়ার বাঁকা গড়ন, হ্রেষারব, রোমশ চর্ম ইত্যাকার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়।

এ শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য তার অন্তর্ভুক্ত কোন সত্তায়ই অবর্তমান হতে পারে না। হতে পারে যদি ভেতর বা বাইরের কোন কারণ তার প্রকৃতি বদলে দেয়। প্রতিটি শ্রেণীর রীতি-নীতিও ভিন্ন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, মধুমক্ষিকাকে আল্লাহ কিরূপ দিব্যজ্ঞান দিয়েছেন যে, বিভিন্ন গাছের ফল-ফুল থেকে সে খুঁজে খুঁজে মধু আহরণ করে, সুনিপুণ ভাবে ঘর তৈরি করে, ঘরকেই আবার মধুর আকরে পরিণত করে?

পাখীদের দেখুন। আল্লাহ তাদের সহজাত শিক্ষা দিলেন পুং পাখী স্ত্রী পাখীর প্রতি আসক্ত হবে এবং জোড়া মিলে বাসা বানাবে। সেখানে ডিম দেবে। ডিম থেকে বাচ্চা হবে। বাচ্চাকে যথাযথ ভাবে তারা লালন-পালন করবে। বাচ্চা বড় হলে তাদের বাপ-মা শিখিয়ে দেয়, কোথায় পানি পাবে আর কোথায় পাবে খাদ্য। কি ভাবে শত্রু থেকে বাঁচতে হবে তাও শিখিয়ে দেয়। শিখায় কিভাবে বিড়াল আর শিকারী থেকে পালাতে হবে সে পদ্ধতি। কল্যাণ কোন পথে আসবে এবং নিজ জাতি ও মানব জাতির সৃষ্ট অকল্যাণ থেকে বাঁচার উপায় কি, সবই সবিস্তারে বুঝিয়ে দেয়। কোন বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন লোক কি বলতে পারবে, এ সব বিধি-বিধান জাতিগত চাহিদার অনুকূল নয় কিংবা কোন সম্পর্ক নেই এ সবের সেই পাখিকুলের সাথে?

জানা দরকার, ব্যক্তি সত্তার সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে জাতিগত বা

শ্রেণীগত এ সহজাত বিধানের পূর্ণ আনুকূল্যের ভেতর। তাই শ্রেণীগত রীতি-নীতির বিরোধিতা করা কোন ব্যক্তি সত্তার জন্যই কল্যাণকর নয়। এ জাতিগত বিধানের তারতম্যের কারণেই সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের প্রশ্নে ব্যক্তি সত্তার ক্রিয়া-কলাপে পার্থক্য দেখা দেয়। যতক্ষণ ব্যক্তি তার শ্রেণীগত রীতির ওপর বহাল থাকে, ততক্ষণ তার কোনই দুর্ভোগ আসে না। কিন্তু বাইরের প্রভাবে যখনই ব্যক্তি জাতীয় স্বভাবের বাইরে চলে যায়, দুর্ভোগ তার জন্য অপরিহার্য হয়। এটা যেন ঠিক মানুষের কোন অংগ-প্রত্যংগ বাইরের কোন আঘাত পেয়ে পংগু বা অচল হয়ে গেল। মহানবীর (সঃ) এ হাদীসটি তারই ইংগিত দেয় ঃ

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ اَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ *

"প্রতিটি মানব শিশু নিজ প্রকৃতি (ইসলাম) নিয়ে জন্মে। তার বাপ-মা তাকে পরে ইহুদী, নাসারা বা মজুসী করে গড়ে তোলে।"

জানা দরকার, মানব প্রাণের পবিত্র দরবারে (হাযিরাতুল কুদ্স) উপনীত হবার দুটো পদ্ধতি রয়েছে। কোন প্রাণ নিজ সাহস ও দিব্য সৃষ্টির বদৌলতে সরাসরি সেখানে পৌছে। কোন প্রাণকে পুরস্কার বা শাস্তিদানের জন্য সেখানে রূপ দিয়ে নেয়া হয়। সাহস ও দিব্যদৃষ্টি নিয়ে পৌছার অর্থ হল এই, যে ব্যক্তি জৈবিক অনাচার ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রয়েছে, তার প্রাণ সরাসরি পবিত্র দরবারে পৌছে যায়। তখন সেখানকার কিছু কিছু ব্যাপার সে জানতেও পায়। মহানবীর (সঃ) এ হাদীস তার ইংগিত দেয়ঃ

"আদম ও মূসা নিজ প্রভুর দরবারে উপস্থিত রয়েছেন।"

এ ছাড়া বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তাঁর কয়েকটি হাদীসেই বলা হয়েছে ঃ

"পুণ্যবানদের প্রাণ শ্রেষ্ঠতম প্রাণের (রূহে আজম) পাশে সমবেত হয়।" দ্বিতীয় ধরনের উপনীত হবার ব্যাপারটি হল এই, কেয়ামতের দিন আবার মানব দেহকে প্রাণ দান করে উত্থিত করা হবে। এটা কোন নতুন জীবন নয়। আগের জীবনের এটা উপসংহার মাত্র। বেশী খেয়ে কারো বদ হজম হলে যেমন অসুস্থতার পর নতুন স্বাস্থ্য ফিরে পায়, এও তেমনি ব্যাপার। যদি তা না হত,তা হলে ভিন্ন মানুষ হয়ে যেত। ফলে মৃত্যুপূর্ব

মানুষটির জন্য মৃত্যুপরবর্তী নতুন মানুষটির কর্মফল ভোগ সংগত হত না।

বাইরে আমরা যে সব বস্তু দেখছি তার অনেকটাই স্বপ্নে দেখা বস্তুর মত। বস্তু সত্তার ধারণাটি রূপ নিয়ে ধরা দেয়। যেমন হযরত দাউদের (আঃ) কাছে ফেরেশতা ঝগড়ারত অবস্থায় এসে বিচার প্রার্থী হলেন। দাউদ (আঃ) সংগে সংগে বুঝে ফেললেন, উরিয়ার স্ত্রীর বিচারে তিনি যে ভুল করেছেন, সেটাকেই বস্তুরূপ দিয়ে ফেরেশতারা তাঁর সামনে তুলে ধরছেন। (১)

অমনি তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। এভাবে (শবে মে'রাজ) মহানবীর সামনে ফেরেশতারা এক পেয়ালা দুধ ও এক পেয়ালা শরাব পেশ করলেন। তিনি দুধের পেয়ালাটি গ্রহণ করে শরাবের পেয়ালা প্রত্যাখ্যান করলেন। এখানে তাঁর উম্মতের জন্য দুধকে বিবেক (হেদায়েত) ও শরাবকে রিপুর (গোমরাহীর) প্রতীক হিসাবে উপস্থিত করা হল। দুধ গ্রহণ করে তিনি পুণ্যবান উম্মতের হেদায়েত লাভের ইংগিত দিলেন। তেমনি মহানবী (সঃ) স্বপ্নে দেখলেন, তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ) ও উমরকে (রাঃ) নিয়ে একটি কূপের পাড়ে বসে আছেন এবং হযরত উসমান (রাঃ) পৃথক হয়ে অন্যত্র বসেছেন। এটা ছিল তাঁদের দাফন হবার বাস্তব রূপ। তাঁদের তিন জন একই স্থানে ও উসমান (রাঃ) অন্যস্থানে দাফন হবেন বলে জানানো হল। হযরত দাউদ ইবনুল মুসাইয়েবও মহানবীর (সঃ) স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। এ থেকে আরও জেনে নিন, শেষ বিচারে অনেক ব্যাপারই এ ধরনের ঘটবে। গুণাগুণকে বস্তুরূপে দাঁড় করিয়ে কাজ চালানো হবে।

জানা দরকার, সাধারণ লোকের আল্লাহদত্ত প্রাণ ও জৈব প্রাণের ভেতর গভীর সম্পর্ক হওয়ায় স্বরূপ জগতের ব্যাপারগুলো সম্পর্কে তারা জন্মান্ধের মত হয়ে যায়। জন্মান্ধ যেমন আলো ও রূপ সম্পর্কে কোন ধারণাই করতে পারে না, সেও তেমনি স্বরূপ জগতের ধারণা হারিয়ে ফেলে। এমনকি তা উদ্ধারের চেষ্টাও করে না তারা। অবশ্য দীর্ঘ জানা-শোনার পর যেমন জন্মান্ধ আলো ও রূপের মোটামুটি ধারণা নেয়, তেমনি সাধারণ লোকদের ধারণা সৃষ্টির জন্য হাশরের দিন কিছু ব্যাপার আত্মপ্রকাশ করবে। (২)

---

(১) এ ঘটনাটির বিশুদ্ধতা যদিও প্রশ্নাতীত নহে, তথাপি কোন কিছু বুঝাবার জন্য উপমা হিসেবে ব্যবহার করা আপত্তিকর হতে পারে না।

(২) তার ফলে তার জৈবিক প্রভাব লোপ পাবে এবং নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে।

এ উদ্দেশ্যেই যখন সব লোক উত্থিত হবে তখন শুরুতেই একদলকে তাদের পাপ ও পুণ্যের জন্য শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া হবে। সে বিচার তাদের হাল্কা ভাবেই করা হোক কিংবা কঠিন ভাবে। কিছু লোককে পুলসিরাত পার হতে বলা হবে। পাপীরা হোঁচট খাবে এবং পুণ্যবানরা স্বচ্ছন্দে পার হবে। কিছু লোককে তাদের নেতার পিছু ধরতে বলা হবে। পুণ্যবান নেতৃত্বের অনুসারীরা মুক্তি পেয়ে যাবে এবং পাপী নেতার অনুসারীরা ধ্বংস হবে। কিন্তু লোকের হাত-পা কথা বলবে এবং কিছু লোক আমলনামা পড়বে। কখনও কৃপণের কার্পণ্য রূপ ধরে এসে তার পিঠে সোয়ার হবে কিংবা দাগ হয়ে বসে যাবে।

মোটকথা, এ সব উপমা-উদাহরণ তার জাতিগত কার্য কলাপেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যে ব্যক্তির আল্লাহদত্ত প্রাণ সবল ও জৈবিক প্রাণ উদার, তাদের সামনে উপমা-উদাহরণ আসবে সূক্ষ্মতর হয়ে ও পূর্ণত্ব নিয়ে। মহানবী (সঃ) যে বলেছেন, 'আমার উম্মতের অধিকাংশের শাস্তি কবরেই হয়ে যাবে'–এ ব্যাপারটি ঠিক উক্ত উপমা-উদাহরণেরই অন্তর্ভুক্ত। হাশর মাঠে এমন কিছু উপমা-উদাহরণও পেশ করা হবে যা সবাই সমানে দেখতে পাবে। যেমন মহানবীর (সঃ) সার্বজনীন নবুয়তের প্রতীক হবে 'হাউজে কাওছার'। তেমনি মানুষের সুরক্ষিত কার্যকলাপের প্রতীক হবে 'মীযান'। তেমনি উৎকৃষ্ট পানীয় এ হিসেবে 'শরাবান তহুরা'। গৌরবের পরিধেয় হিসেবে 'লেবাছে ফাখেরা'। অনিন্দ্য সহচরী হিসেবে 'হুরে মাকসূরা' এবং চিত্তাকর্ষী নিবাস হিসেবে 'কসূরে দিল নশীন' পেশ করা হবে। তেমনি পাপের আঁধার থেকে আল্লাহর নিয়ামতের দিকে ফিরে আসার জন্য আশ্চর্য ধরনের সব পদ্ধতি রয়েছে। যেমন মহানবী (সঃ) সবার শেষে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের ব্যক্তি সম্পর্কে সে সব বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি তার আকৃতি-প্রকৃতিও বলে দিয়েছেন। (১)

---

(১) বোখারী ও মুসলিম শরীফের উক্ত হাদীসটি এই –"জনৈক জাহান্নামী আল্লাহর কাছে আরজ করবে, দয়াময় প্রভু! দোযখের আগুন আমাকে ঝলসে ফেলেছে, তাই তোমার দয়া থেকে আমাকে বঞ্চিত রেখ না। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, কিরূপ দয়া চাও! সে আরজ করবে, শুধু আমার মুখটাকে আগুন থেকে বাঁচাও, আর কিছু চাইনা। এ কথার ওপর সে প্রতিজ্ঞাও করবে। যখন তার মুখ আগুন থেকে ওপরে উঠে আসবে, তখন সে জান্নাতের ছায়াঘেরা বাগান দেখতে পাবে। অমনি তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। আরজ করবে, প্রভু! শুধু আমাকে বাগানটির কাছে যেতে দাও। তাকে ভালভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়ে যখন গোসল সারিয়ে সেখানে নেয়া হবে, কিছুক্ষণ কোনমতে চুপ থেকেই জান্নাতের লোভনীয় আরাম-আয়েশের সামগ্রী দেখে আবার নতুন আব্দার তুলবে ইত্যাদি।

মানুষের সেখানেও মানবিক বাসনা ও কামনা দেখা দেবে। সেমতে আল্লাহ্‌র নেয়ামতও বস্তুরূপে ধরা দেবে। মানুষের কামনা-বাসনায় পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যও দেখা দেবে। আল্লাহ্‌র দানও সে অনুযায়ী প্রকাশ পাবে। মহানবীর (সঃ) হাদীসে তার ইংগিত পাই। তিনি বলেন ঃ জান্নাতে ঢুকে আমি একটি রক্তিম অধরের শ্যামল তরুণী দেখতে পেলাম। প্রশ্ন করলাম, এ কে?(১) জবাব পেলাম, জা'ফর ইবনে আবু তালিব এ ধরনের সহচরী পসন্দ করে বলেই একে সৃষ্টি করা হল।(২) মহানবী (সঃ) অন্যত্র বলেন, যদি তুমি জান্নাতে গিয়ে চাও যে, ইয়াকুতের লাল ঘোড়ায় চড়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াবে, তক্ষুণি তুমি পেয়ে যাবে এবং তোমার সখ পূর্ণ হবে। অন্যত্র তিনি বলেন, এক জান্নাতী আল্লাহ্‌র কাছে চাষাবাদের অনুমতি চাইবে। তাকে আল্লাহ্ প্রশ্ন করবেন, তোমার মনের ইচ্ছা কি সব পূরণ করা হয় নি? সে জবাব দিবে হাঁ, সবই পূর্ণ হয়েছে। তবে আমি চাষাবাদ খুব ভালবাসি। তখন সে অনুমতি পেয়ে ফসল বুনবে। দেখতে না দেখতে তা গাছ হয়ে ফুলে ও ফলে সুশোভিত ও পরিপক্ক হয়ে কর্তিত হয়ে যাবে। এমন কি নিমেষে তার চারদিকে ফসলের পাহাড় তৈরী হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ বলবেন, নাও হে আদম সন্তান! তোমার পেট তো কিছুতেই ভরে না। অবশেষে মিশকের টিলায় চড়ে আল্লাহ্‌র দীদার সবাই পেয়ে ধন্য হবে। তারপর আরও অনেক কিছু ঘটবে। মহানবী (সঃ) যখন সবিস্তারে এ সব বলেন নি, আমিও তা প্রকাশ করা ঠিক মনে করলাম না।

---

(১) মহানবী (সঃ) শ্যামল মেয়ে দেখে এ কারণে অবাক হলেন যে, আরবের দৃষ্টিতে তা সুন্দর নয়। সুতরাং তা দেখানো হল কেন?

(২) জা'ফর ইবনে আবু তালিব হিজরত করে বেশ কিছুদিন আবিসিনিয়া ছিলেন। সেখানে এ ধরনের মেয়েকে সুন্দরী বলা হয়। তাই তিনি তা পসন্দ করতেন।

তৃতীয় অধ্যায়

মানব সমাজের বিভিন্ন সংগঠন

॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ॥

সংগঠন উদ্ভাবন পদ্ধতি

জেনে রাখুন, মানুষ খানা-পিনা, বিয়ে-শাদী, গ্রীষ্মে-বর্ষায় ছত্রছায়া গ্রহণ, শীতে গরম কাপড় ব্যবহার ইত্যাকার চাহিদায় সবাই সমান। আল্লাহ তায়ালা বিশেষ অনুগ্রহে সব শ্রেণীকেই যার যার এ ধরনের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রকৃতিগত 'ইলহাম' করে রেখেছেন। তাই তারা জানতে পায়, কি করে কোন উপায়ে সে সব প্রয়োজন মিটাতে হবে। এ গুণগত দিক থেকে সবাই একাকার। কিন্তু যদি কেউ প্রকৃতিগত ভাবেই পংগু ও দুর্বল হয় এবং কোন চাহিদা না-ই থাকে, সেটা স্বতন্ত্র কথা।

লক্ষ্য করুন, মৌমাছি জানে কোন গাছে কি ফুল বা ফল খেতে হবে, কিভাবে মধু আহরণ করতে হবে, কোথায় কিরূপ ঘর বানাতে হবে এবং রাণী মক্ষিকাকে মেনে কিভাবে সুসংবদ্ধ থাকতে হবে। অন্য পাখী জানে, কোথা থেকে তাকে খাদ্য ও পানি সংগ্রহ করতে হবে। বিড়াল বা বাজ দেখলে পালাতে জানে। জানে তার প্রয়োজনের পথে অন্তরায় দেখলে তা দূর করার সংগ্রাম চালাতে। যৌন মিলন পদ্ধতিও তাদের অজানা নেই। নিরাপদে বসবাসের জন্য পাহাড়ের টিলায় কিংবা উঁচু গাছে বাসা বাঁধতে হবে তাও জানে। বাসায় ডিম দিয়ে কিভাবে তা হেফাজত করতে হবে তাও বুঝে। মোট কথা,এ সব ব্যাপারে প্রত্যেক শ্রেণীর স্বতন্ত্র পদ্ধতি জানা রয়েছে। শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে প্রত্যেক শ্রেণীকেই প্রকৃতিগতভাবেই প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করা হয়।

এভাবেই আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে তাদের প্রয়োজন মিটাবার ও কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে সহজতর পথ উদ্ভাবনের জন্য বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন। যেহেতু মানব জাতি অন্যান্য জাতি থেকে বড়, তাই তার শ্রেষ্ঠত্ব অনুসারে তাকে তিনটি অতিরিক্ত জিনিস দেয়া হল।

প্রথমত, মানুষ কিছু করতে চাইলে সব দিক বিচার-বিবেচনা করেই তা চায়। পক্ষান্তরে চতুষ্পদ জীব শুধু প্রাকৃতিক তাগাদা দ্বারা পরিচালিত

হয়। যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনস্পৃহা ইত্যাকার ব্যাপার। অথচ মানুষ জৈবিক প্রয়োজন ছাড়াই বুদ্ধি বৃত্তির প্রেরণায় কাজ করে। কখনও তারা নগর ও রাষ্ট্র সুশাসন পদ্ধতি প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়। কখনও তারা চরিত্র উন্নয়ন কিংবা আত্ম সংশোধনের প্রয়াস চালায়। কখনও পরকালের শাস্তির ভয়ে সংযত জীবনে অভ্যস্ত হয়। কখনও মানুষের কাছে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষী হয়।

দ্বিতীয়ত, মানুষ তার প্রয়োজন মিটানোর পদ্ধতিটি শালীন ও সুন্দর করতে চায়। অথচ চতুষ্পদ জীব যে কোন ভাবে তার প্রয়োজন মিটায়। মানুষ প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে রুচি ও আনন্দের তাগাদা অনুভব করে। যেমন সে সুন্দরী স্ত্রী, সুস্বাদু খাদ্য, উত্তম পোশাক ও সুরম্য ভবন পছন্দ করে।

তৃতীয়ত, এমন কিছু মানুষও রয়েছেন যারা জ্ঞানগত উৎকর্ষের ফলে অনেক ভাল ভাল কল্যাণপ্রদ ব্যাপার নিয়ে ভাবেন ও তা অনুসরণে প্রয়াসী হন। এরূপ একদল মানুষও রয়েছে যারা জ্ঞানী লোকদের উদ্ভাবিত ব্যবস্থা ও অনুসৃত পদ্ধতি পসন্দ করে। কিন্তু নিজে তার উদ্ভাবন ক্ষমতা রাখে না। তারা কোন জ্ঞানীর বিশেষ উদ্ভাবন নিজের মোটামুটি জ্ঞানের অনুকূল পেয়ে তা অনুসরণ করতে আগ্রহী হয়। ক্ষুৎ-পিপাসা কাতর অনেক ব্যক্তিকে দেখতে পাবেন তারা নিজেরা তা জুটিয়ে নিতে না পেরে বেশ কষ্ট পেতে থাকে, কিন্তু যখন তা সরবরাহ করা হয়, অমনি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তা যথারীতি নেবার জন্য প্রয়াসী হয়। ঘটনাক্রমে কোন উপযুক্ত জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি যদি এ অবস্থায় পড়েন, তা হলে তিনি খাবার যোগ্য তরি-তরকারী নির্বাচন করে তার চাষ করবেন, পানি সেচে যত্ন নেবেন, কেটে-কুটে পরিষ্কার করে খেয়ে নিবেন এবং পরবর্তী সময়ে খাবার জন্য কিছু জমিয়ে রাখবেন। এমন কি ফসলের ক্ষেত থেকে পানি দূরে থাকলে পয়ঃপ্রণালী কেটে পানি আনয়নের ব্যবস্থা করবেন কিংবা পুকুর কেটে নেবেন অথবা মশক বানিয়ে ডোংগা তৈরী করে কাজ চালাবেন। এ ভাবে খাদ্য উৎপাদন প্রয়াসের তিনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর প্রণালী উদ্ভাবন করবেন। এ ব্যক্তির উদ্ভাবিত এ পদ্ধতি স্বভাবতই উক্ত ক্ষুৎ-পিপাসা কাতর ব্যক্তিরা আগ্রহভরে অনুসরণ করবে।

তেমনি কোন অজ্ঞ ব্যক্তি কাঁচা ফসল বা তরকারী খেয়ে পেট নষ্ট করবে। তাই সে তা এমন উপায়ে খেতে আগ্রহী হবে যাতে পেট খারাপ না হয়। কিন্তু সে পথ তো তার জানা নেই। অবশেষে সে এ ক্ষেত্রে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পেল। তিনি পাকাতে জানেন, পিষতে জানেন, ভুনতে জানেন ও ভাজতে জানেন। তাই অজ্ঞ ব্যক্তিটি আগ্রহ ভরেই এ সব উদ্ভাবন অনুসরণ করবে এবং এ ক্ষেত্রে তার জ্ঞানের প্রসারতাও বেড়ে যাবে।

এ দুটো উদাহরণের আলোকেই আপনি মানুষের অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারটি অনুমান করুন। মানুষ সমস্যায় ভুগেছে। তাদের এক জ্ঞানী ব্যক্তি ভেবে-চিন্তে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করেছেন। অন্যান্য মানুষ সেটা অনুসরণ করেছে। এ ভাবেই চলে এসেছে মানুষের প্রয়োজন পূরানোর ব্যবস্থাটি। তাই তার প্রয়োজন পূরণের প্রকৃতিগত জ্ঞানের সাথে এ সব অর্জিত বাড়তি জ্ঞান মিলে কল্যাণ অর্জনের বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। সে সব নিয়মিত অনুসরণ করে তারা পূর্ণ মাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এমন কি সে সব পদ্ধতিতে তারা জীবন ধারণের স্বাভাবিক রীতিতে পরিণত করেছে এবং সেগুলো তাদের বাঁচা-মরার প্রশ্নের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে।

মোট কথা, মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই প্রকৃতিগত জ্ঞান উক্ত তিন ব্যাপারের সাথে সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদ্য। মানুষের জন্য মৌলিক শ্বাস-প্রশ্বাস অপরিহার্য। শিরা থাকলে তা নড়া যেমন অপরিহার্য, এও তেমনি। তবে শক্তি ও দুর্বলতা ভেদে শিরা সঞ্চালনে ক্ষিপ্রতা ও মন্থরতা আসে। সেরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসও। তবে শ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘ বা হ্রস্ব করা মানুষের ইচ্ছাধীন।

উক্ত তিনটি ব্যাপার সব মানুষের ভেতর সমানে পাওয়া যায় না। স্বভাব, বুদ্ধি ও অনুভূতির পার্থক্যের কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পসন্দ-অপসন্দ এবং ভাল-মন্দ বিচার ও অনুসরণের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দেয়। তা ছাড়া চিন্তা-ভাবনার সুযোগ-সুবিধার তারতম্যের কারণেও মানুষের অবস্থায় তারতম্য আসে। এ কারণেই জীবন ধারা অনুসরণের দুটো সীমারেখা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

প্রথমটি থেকে সাধারণ ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠিও বাদ থাকতে পারে না। মরুর বেদুঈন, পার্বত্য জাতি ও সভ্যজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন মনুষ্য সমাজ এ প্রাথমিক স্তরের জীবন ধারার অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় ধারায় সভ্য জগতের বড় বড় শহর ও বস্তির বাসিন্দারা অন্তর্ভুক্ত। সেখানে উন্নত চরিত্র ও মনীষা জন্ম নেয়। সে সব শহরে বিভিন্ন মত ও পথের মানুষ বাস করে। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপাদানের প্রাচুর্য থাকে, সেখানে বিভিন্ন মুখী অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জিত হয়। সে সব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন মূলনীতি ও আইন প্রণীত হয়। সেখানকার অধিবাসীরা গুরুত্ব সহকারে সেগুলো অনুসরণ করে চলে। এ জীবন ধারার উন্নততম পর্যায় হল রাষ্ট্র ব্যবস্থা। রাষ্ট্রপতিকে কেন্দ্র করে সমবেত হন বিভিন্ন সমাজের জ্ঞানী-গুণীবৃন্দ। তিনি তাঁদের পরামর্শে বিভিন্ন কল্যাণপ্রদ ও সঠিক উপায়-উপকরণের উদ্ভব ঘটান। এ পর্যায়টিকেই আমরা জীবন ধারায় দ্বিতীয় স্তর বলে থাকি।

এ দ্বিতীয় স্তর যখন পূর্ণ হয়ে যায়, তখন উন্নয়নের তৃতীয় স্তর প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। তা এই, যখন মানবমণ্ডলী একত্রে তাদের কাজ-কারবার চালায় তখন পরস্পরের ভেতর কার্পণ্য, লালসা, হিংসা, অবহেলা, মান্যতা ও অমান্যতা জনিত দ্বন্দ্বের বীজ দেখতে পায়। সেগুলো স্বভাবকেও প্রভাবিত করতে উদ্যোগী হয় এবং পরিণামে তাদের ভেতর দ্বন্দ্ব-বিভেদ দেখা দেয়। তাদের ভেতর কলুষ বাসনার লোকও দেখা দেয়। এমনকি স্বভাবগত খুনী ও দাংগাবাজ লোকের উদ্ভব ঘটে। তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান হয় মেনে নিতে চায় না, নয় মেনে নেবার ক্ষমতা রাখে না কিংবা কেউ তাদের তা মানাতে সাহসী হয় না। তাই মানুষ কোন ইনসাফগার শাসক বা বিচারক নির্বাচন করতে বাধ্য হয়। তিনি যেন অপরাধীকে শাস্তি দেন, বিদ্রোহীকে দমন করেন, সবার কাছ থেকে কর আদায় করে সমাজের সার্বজনীন কল্যাণ ও সংস্কারের কাজে ব্যয় করেন।

এ তৃতীয় স্তরের উন্নয়ন থেকেই চতুর্থ স্তরে উন্নীত হবার তাগাদা সৃষ্টি হয়। তা এভাবে যে, দেশে দেশে যখন শাসক নিযুক্ত হয়ে যায়, তখন ধন-সম্পদের চাবিকাঠি তাঁর মুঠোয় চলে যায়। ফলে সবল ও বিচক্ষণ লোকেরা তাঁর পাশে ভিড় জমায়! তাদের ভেতর কার্পণ্য, সংকীর্ণতা, লোভ-লালসা ও হিংসা-বিদ্বেষের বীজাণু ছড়িয়ে পড়ে। তার ফলে তাদের ভেতর শুরু হয় ঝগড়া, ফাসাদ ও রক্তারক্তি। তখন শাসকরা বাধ্য হয় এ

পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এড়াবার জন্য একজন আন্তর্জাতিক নেতা বা খলীফা নির্বাচন করতে। কিংবা এমন একটি আন্তর্জাতিক শক্তির আওতায় সংঘবদ্ধ হতে যাকে উপেক্ষা করা বা ঘায়েল করা কারো পক্ষে সহজসাধ্য নয়। তা করতে হলে অনেক দেশ বা জাতি মিলে করতে হয় এবং অসংখ্য লোক ও অজস্র ক্ষয়–ক্ষতি স্বীকার করেই তা করতে হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ আন্তর্জাতিক মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা সর্বাধিক কম এবং দীর্ঘকাল পরে হয়ত তা সম্ভব হতে পারে।

এ খেলাফত বা আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন সব দেশ ও জাতির জন্য সমান নয়। দেশবাসীর অবস্থা ভেদে তা দেখা দেয়। যে জাতি রূঢ় স্বভাবের এবং নৈতিকতা বর্জিত,তাদের প্রয়োজন সর্বাধিক। পক্ষান্তরে যারা শালীন, উদার ও মহানুভব তাদের প্রয়োজন খুবই কম।

এখন আমি আপনাদের মানবীয় জীবন ধারার বিভিন্ন রীতি-নীতি ও অধ্যায়ের তালিকা সম্পর্কে অবহিত করব। উত্তম চরিত্রের প্রকৃষ্ট জাতির জ্ঞানী-গুণীদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে তা পাওয়া গেছে। তাঁরা এগুলোকে সর্ববাদি সম্মত নীতি হিসেবে মেনে নিয়েছেন। তাঁদের সমসাময়িক কিংবা কাছাকাছি কালের কেউই এগুলো সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেন নি। এখন আপনাদের সামনে যা কিছু পেশ করা হচ্ছে, অনুধাবন করুন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রথম সংগঠন

এ সংগঠনের প্রথম ভিত্তি হল ভাষা। ভাষার মাধ্যমেই মানুষ তার ভাবের আদান-প্রদান ঘটায়। ভাষার মূলে রয়েছে কাঠামো, প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া। এ সব মিলেই কোন না কোন ধ্বনি সৃষ্টি হয়। এ ধ্বনি অবশ্যই কোন না কোন সম্পর্ক বা কারণ থেকে হয়ে থাকে। ঐ ধ্বনিই হুবহু ভাষা হয়ে প্রকাশ পায়। তারপর তার অর্থের দিক থেকে শব্দ উদ্ভাবন করে তা বিন্যস্ত করা হয়। তার ফলে যে ব্যাপারটি সামনে ভেসে উঠে কিংবা ব্যক্তির মনে যে ভাবের উদ্রেক করে, সেটাকেই প্রথম সংগঠনের ভিত্তি মূল ভাষা নাম দেয়া হয়। তখন সেই ভাষার অনুরূপ আরও ভাষা তৈরী করা হয় এবং

কোন সম্পর্ক বা সামঞ্জস্যের কারণে তাকে ব্যঞ্জনার দিক থেকে বেশ প্রসারতা দেয়া হয়। ভাষা সম্পর্কিত আরও কিছু মূলনীতি আপনারা আমার অন্যান্য বক্তব্যে কোথাও কোথাও পাবেন।

এ প্রথম সংগঠনের ভেতর ভাষা ছাড়া ক্ষেত-খামার করা, গাছপালা লাগানো, কূপ খনন, খানা পাকান এবং রুটি ও বিভিন্নরূপ খাদ্য তৈরী রয়েছে। বিভিন্ন পাত্র তৈরী এবং প্রয়োজনীয় নানা যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনও এর অন্তর্ভূত। চতুষ্পদ জীবকে অনুগত করে কাজে লাগানো, তা বাহনরূপে ব্যবহার, তার দুধ-গোশত ভক্ষণ, হাড় ও লোমের ব্যবহার এবং বংশাবলী রক্ষা ও ব্যবহার এরই অন্তর্ভুক্ত। এ পর্যায়ে মানুষ শীত-গ্রীষ্ম থেকে বাঁচার জন্য গুহা কিংবা ঘরের ব্যবহার জানতে পায়। চতুষ্পদ জীবের চামড়া, গাছের বল্কল কিংবা পাতা দিয়ে কাপড় তৈরীও এ কালের কাজ। মানুষের জন্য তা পাখীর পালকের মতই কল্যাণ দেয়। নির্দিষ্ট বিয়ে-শাদীও এ অধ্যায়ে আসে। অপরের কুৎসা বা হস্তক্ষেপ থেকে বাঁচার জন্য তা করা হয়। এ থেকে মানুষ তার কামনা চরিতার্থের সাথে বংশধারাও অব্যাহত রাখে। তার ঘরকন্না ও সন্তান পালনের কাজ দেয়। মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীব এভাবে স্ত্রী নির্দিষ্ট করতে পারে না। সেগুলোর জোড় বাঁধার ব্যাপারটি নেহাৎ আকস্মিক। হয় সে দু'টো একই সাথে জন্ম নেয় বলে পূর্ণত্ব লাভ করা পর্যন্ত এক সঙ্গে থাকে কিংবা অন্য কোন কারণে তারা জোড় বেঁধে থাকতে বাধ্য হয়।

এ সমাজ ব্যবস্থায় কারিগরীর দিকেও নজর পড়ে। যেমন, কৃষি খামার, বাগান তৈরী, কূপ খনন, পশু পালন এবং পানি সিঞ্চনের জন্য ফোয়াড়া, মশক ইত্যাদির উদ্ভাবন। তা'ছাড়া পরস্পরের সামগ্রিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য পারস্পরিক দ্রব্য বিনিময় পদ্ধতির সূত্রপাত হয় এবং বিভিন্ন কাজে পারস্পরিক সহযোগীতার প্রচলন হয়।

এ ব্যবস্থায় এমন লোকও দেখা যায় যিনি সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারতেন। তিনি নিজ শক্তিতে অন্যান্যকে আয়ত্ত করতে পারেন এবং কোন না কোন উপায়ে নিজ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এমন কি অনুবর্তীদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন।

এ ধরনের লোকদের কতগুলো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত থাকে। তার সাহায্যে

তাঁরা বিরোধ-বিসম্বাদ মিটিয়ে থাকেন। তা দিয়ে অত্যাচারী ও উচ্ছৃঙ্খলদের দমিয়ে রাখেন। তাঁদের বিরোধী শক্তির সাথে লড়তে পারেন। প্রত্যেক গোত্র ও সম্প্রদায়ের ভেতর এরূপ লোক থাকা এক অপরিহার্য ব্যাপার। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁরা ভেবে-চিন্তে এরূপ রীতি-নীতি উদ্ভাবন করে থাকেন যা সবাই অনুসরণ করে থাকে। তাঁদের একদল বেশ মার্জিত রুচির হন। তাঁরা কোন না কোন উপায়ে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন পসন্দ করেন। কিছু লোক তাঁদের চারিত্রিক মহত্ত্ব, বীরত্ব, দানশীলতা, পাণ্ডিত্য ও শিল্প-সাহিত্যে গৌরবময় ভূমিকা নেন। এমন লোকও থাকেন যাঁর দুনিয়া জোড়া খ্যাতির চমক জাগে। তিনি নিজ শান শওকত বাড়িয়ে সবার শীর্ষে ঠাঁই নেন।

এটা অবশ্য বান্দার ওপর আল্লাহ্‌র বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি কুরআন পাকে মানবীয় জীবন ধারার সর্ব ইলহামী (স্বভাবগত) শাখাগুলো সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ্ জানতেন, কুরআনের পাঠক সব ধরনের লোকই হবে। তাই সব ধরনের মানুষের জীবন ধারাই তাতে রয়েছে এবং সেগুলোই এখানে বলা হল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

জীবিকা-পদ্ধতি

জীবিকা-পদ্ধতির বিষয়টি এমন এক বিদ্যা যা জীবন ধারার দ্বিতীয় রূপ রেখায় বর্ণিত হয়েছে। তার সার কথা এই, প্রথম পর্যায়ের জীবন ধারার প্রয়াসগুলোকে সঠিক অভিজ্ঞতার কষ্টি পাথরে যাচাই করে বিশেষ রূপ দান। সেগুলো একদিকে যেমন ক্ষতিমুক্ত হবে, অন্যদিকে হবে কল্যাণকর। যা কিছু ক্ষতিকর বা কল্যাণমুক্ত প্রমাণিত হয়েছে তা বর্জন করা হবে। তা ছাড়া প্রথম পর্যায়ের পদ্ধতিগুলো সে সব চারিত্রিক মানদণ্ডে যাচাই করা প্রয়োজন, যা পূর্ণাংগ ও সুস্থ স্বভাবের মানুষের প্রকৃতিতে জন্মগত ভাবেই সুরক্ষিত রয়েছে। সে সব পুর্ণাংগ চরিত্রের অনুকূল ও আকাঙ্ক্ষিত রূপ রেখাই হবে সঠিক জীবিকা-পদ্ধতি। সেটাকে গ্রহণ করে অন্যগুলো বর্জন করা উচিত। তারপর সে রীতিগুলোকে সর্বসাধারণের ভেতর উত্তম সংসর্গ ও সুন্দর আদান-প্রদানের মানদণ্ডে উতরে নিতে হবে। এভাবে সেগুলোর

নির্ভুলতা সম্পর্কে অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে। সাধারণ সংস্কারের জন্য সর্বসম্মত অভিমতের আলোকে তা করতে হবে।

জীবিকা ও জীবন পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হল খানা-পিনা, চলা-ফিরা, উঠা-বসা, মেহমানদারী, প্রস্রাব-পায়খানা, স্ত্রী-সহবাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ী, পাক-পবিত্রতা, সাজ-সজ্জা, আলাপ-আলোচনা, সেবা-শুশ্রূষা, ওষুধ-তাবিজ, মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ প্রয়াস, সন্তান-সন্ততি হওয়া, বিয়ে-শাদী করা, ঈদ উদযাপন, অতিথি-মুসাফির খাওয়ানো, বিয়ের ওলিমা কিংবা মেহমানদারীর ভোজোৎসব, বিপদাপদে হা-হুতাশ ও কান্নাকাটি, মৃতের দাফন-কাফন ব্যবস্থা ইত্যাদি।

প্রধান প্রধান শহর ও জনপদের সুস্থ প্রকৃতির বিবেক সম্পন্ন লোক এ ব্যাপারে একমত যে, অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন জিনিস খাওয়া উচিত নয়। যেমন, মৃত পশু, দুর্গন্ধময় বস্তু এবং অপ্রকৃতিস্থ ও জঘন্য স্বভাবের জীব-জন্তু। তাই এগুলো থেকে বাঁচা প্রয়োজন। সকল রুচি সম্পন্ন বিবেকবান ব্যক্তিই চান যে, খানা বরতনে রাখা হোক এবং বরতন রাখার জন্য দস্তরখানা বিছানো হোক ইত্যাদি। এটাও সবাই পসন্দ করে যে খাবার আগে হাত-মুখ ধোয়া হোক। এটাও সর্বসম্মত রীতি যে, উগ্রতা, ক্রোধ কিংবা এ ধরনের যে সব কাজে সংগী-সাথীদের অন্তরে বিষাদ আসে তা বর্জন করা চাই। এটাও সার্বজনীন অভিমত যে, দুর্গন্ধময় পানি পান করা ঠিক নয়। তেমনি গোগ্রাসে পানি পান করাও উচিত নয়।

বিবেক সম্পন্ন ও রুচি মার্জিত ব্যক্তিরা এ ব্যাপারেও একমত যে, দু'ধরনের পংকিলতা থেকে দেহ, বসন ও আসন পবিত্র থাকা প্রয়োজন। এক, দুর্গন্ধময় বস্তু থেকে। দুই, প্রকৃতিগত পংকিলতা থেকে। যেমন বাসিমুখ দাঁতন দিয়ে ধোয়া, কিংবা অনভিপ্রেত লোম থেকে দেহকে মুক্ত রাখা। এভাবে কাপড়ের ময়লা ও বাড়ী-ঘরের আবর্জনা দূর করা।

সুস্থ প্রকৃতির লোক এ ব্যাপারেও দ্বিমত রাখেন না যে, মানুষ মানুষের মাঝে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও রুচি মার্জিত ভাবে থাকবে। সুন্দর পোশাক পরবে। মাথার চুল ও দাড়ি সুন্দর করে রাখবে। বিবাহিতা নারী হাত-পা রাংগিয়ে অলংকার ভূষিতা হয়ে থাকবে।

এ ব্যাপারেও তারা মতৈক্য রাখেন যে, নগ্নতা লজ্জাকর। পোশাক সৌন্দর্য বাড়ায় লজ্জাস্থান আবৃত থাকা অপরিহার্য গোটা দেহকে ঢেকে রাখে যে পোশাক সেটাই পুর্ণাংগ পোশাক। লাজ্জাস্থান ঢেকে রাখার জন্য অপরিহার্য পোশাক ও গোটা অংগ ঢাকার পোশাকের আলাদা পরিমাপও তারা নির্ধারণ করে থাকেন।

এটাও তাঁদের সর্বসম্মত মত যে, স্বপ্ন, জ্যোতিবদ্যা, ফালনামা ইত্যাদি দ্বারা ভবিষ্যতের ঘটনাবলী সম্পর্কে আগাম কিছু জানা যায়।

তা ছাড়া রুচি মার্জিত বিবেকবান ব্যক্তি মার্জিত ভাষায় কথা পছন্দ করেন। শ্রুতিমধুর বাক-বিন্যাস ও সংযত ভাষাপ্রয়োগ তাঁর বৈশিষ্ট্য হবে ও বাকভংগী আকর্ষণীয় হবে। তার কথাবার্তা ও বিবৃতি ভাষণ মানুষকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করবে। এ ধরনের লোকই ভাষা ও সাহিত্যের মানদণ্ড হয়ে থাকে।

মোট কথা, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এমন কতগুলো সর্বসম্মত রীতি থাকে যা শহর ও জনপদে সমানে প্রতিপাল্য ও সর্বজন মান্য হয়। যে কোন দূর দূরান্তরের শহর ও জনপদে এ রীতি অনুসৃত হয়ে থাকে। অতঃপর জীবন পদ্ধতির ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালা প্রণীত ও অনুসৃত হয়। যেমন, চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা শাস্ত্রের বিধি-বিধান অনুসরণ করা পছন্দ করেন, তেমনি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের গতিবিধির আলোকে নিজেদের জীবন ধারা নিয়ন্ত্রিত করেন। আর আল্লাহ বিশ্বাসীরা ইসলাম ও ইহ্সানের ভিত্তিতে তাদের জীবনধারা গড়ে তোলেন এবং ঐশী গ্রন্থে সে জীবন পদ্ধতির পরিপূর্ণ রূপরেখা সবিস্তারে বিবৃত রয়েছে। ফলে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মন-মেজাজ, চাল-চলন ও রীতি-নীতিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পারিবারিক ব্যবস্থা

এটা এমন এক বিদ্যা যাতে ব্যক্তি দ্বিতীয় ধাপে পৌছে একই ঘরের বাসিন্দা হিসেবে সম্পর্ক সংস্থাপন ও সংরক্ষণের পদ্ধতি পরিজ্ঞাত হয়। এ সম্পর্ক চার ভাগে বিভক্ত। এক, দাম্পত্য সম্পর্ক। দুই, পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক। তিন, গৃহকর্তা ও অধীনস্থদের সম্পর্ক। চার, সকলের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সাহচর্য।

পরিবারের মূল ভিত্তি রচিত হয় যৌন প্রয়োজনে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক ও সাহচর্যের মাধ্যমে। উভয়ের সম্পর্ক নিবিড়তর হয় এবং পারস্পরিক সহায়তার দ্বার উন্মুক্ত হয়। নারী সন্তানাদি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে প্রকৃতিগত ভাবেই অধিকতর দক্ষ ও এ ব্যাপারে বিভিন্ন কলা-কৌশলের অধিকারিণী। এ কারণে অন্যান্য ক্ষেত্রে তার জ্ঞান-বুদ্ধি নগণ্য থাকে। দৈহিক কোমলতার জন্য কঠিন কাজ এড়িয়ে চলে। সে অধিকতর লজ্জাশীলা হয়। ফলে স্বভাবতঃই ঘরকুনো হয়। ঘরের ছোট-খাট ও খুঁটিনাটি কাজেই সে গলদঘর্ম হয়। সাধারণতঃ পুরুষের অনুগত হয়।

পক্ষান্তরে পুরুষের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজের প্রয়োজনে প্রকৃতিগত ভাবে তারা নারীর তুলনায় জ্ঞানী, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন, সাহসী, সৌজন্য বোধের অধিকারী, শক্তিশালী ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী হয়ে থাকে। পুরুষের জীবনে নারীর প্রয়োজন রয়েছে। পুরুষের আত্মমর্যাদাবোধ ও কষ্ট স্বীকারের দাবী এটাই যে, কোন এক নারী নির্দিষ্টভাবে তারই সহচরী হিসেবে সাক্ষীদের সামনে নির্ধারিত হয়ে থাকবে।

তেমনি নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ ও নির্ভরতা দাবী করে যে, পুরুষ নারীর জন্য মহরানা দেবে, প্রস্তাব পাঠাবে ও অভিভাবকের মাধ্যমে নারীর সম্মতি নেবে। অভিভাবকরা নারীর জন্য মাহরম হওয়ায় এটা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে নারীর অভিভাবক যদি নারীর গায়ের-মাহরম হত তাহলে নারীর জন্য তা ক্ষতিকর হত। সে ক্ষেত্রে অভিভাবক নারীর অভিপ্রেত পুরুষ থেকে তাকে জোর করে ফিরিয়ে রাখত। তাছাড়া তখন নারীর অধিকার আদায় করে দেয়ার কেউ থাকত না। ফলে অধিকার বঞ্চিতা নারীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে যেত। পরন্তু পারস্পরিক দাবী-দাওয়ার কলহে রক্তের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যেত। তেমনি মার্জিত রুচির দাবী এটাই যে, পুরুষ তার গর্ভধারিণীর কিংবা ঔরসজাত নারীর অথবা একই ঔরসে জন্মগ্রহণ কারিণীর সাথে যৌন সম্পর্কের অভিলাষী হতে পারে না।

তারপর বিয়ের আলোচনায় যদিও মানবিক লজ্জা-শরম পারস্পরিক যৌন সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতে দেয় না, তথাপি সেটাই যে এর আসল উদ্দেশ্য তা সকলের কাছে সুস্পষ্ট থাকে। ঘর সাজিয়ে, মাইক বাজিয়ে যেভাবে তার জোর প্রচার করা হয়, তাতে লোকদের ওলিমা না খাইয়ে

উপায় থাকে না। মোটকথা এ ক্ষেত্রে অনেক পদ্ধতি অনুসৃত হয়। তার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করলাম। আর অবশিষ্টগুলো বুঝে নেবার জন্য রেখে দিলাম।

বস্তুতঃ বিয়ের জন্য জরুরী হল গায়ের-মাহরমের সাথে বিয়ে হবে, মজলিস অনুষ্ঠিত হবে, প্রস্তাব অনুমোদন হবে, অভিভাবকগণ নিঃস্বার্থ অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করবেন, কুফু রক্ষিত হবে, ওলিমা করা হবে, স্বামী সর্বদা স্ত্রীর জিম্মাদার হবে ও তার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করবে, স্ত্রী সর্বদা স্বামীর ঘর সংসারের কাজে নিয়োজিত থাকবে, সন্তানাদি লালন-পালন করবে ও স্বামীর অনুগত হয়ে থাকবে। গোটা মানব সমাজে এগুলোই বিয়ের অপরিহার্য শর্ত ও স্বতঃসিদ্ধ রীতি-নীতি। আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে স্বভাব দিয়ে তৈরী করেছেন এগুলো তারই স্বাভাবিক দাবী। তাই আরব-আজমের কোথাও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

এভাবে যখন দুজন এক হয়ে যায় এবং একে অপরের ভাল-মন্দের সাথে জড়িয়ে যায় ও পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সহযোগী হয়ে দাঁড়ায়, তখন বুঝা যায় যে, উভয়ই মনে-প্রাণে এ বিয়ে মেনে নিয়েছে। পক্ষান্তরে যদি এর বিপরীত দেখা দেয়, তখন তা থেকে মুক্তি লাভের পন্থাও অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য তালাক ব্যবস্থা সকল বৈধ কাজের ভেতর সবচেয়ে অপ্রিয় কাজ। তাই তালাকের শর্ত রাখা হয়েছে এবং পরে ইদ্দত পালনের ব্যবস্থা অপরিহার্য করা হয়েছে। একই কারণে স্বামীর মৃত্যুর পরে ইদ্দত পালন শর্ত করা হয়েছে যেন বিয়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা অন্তরে অবশিষ্ট থাকে, তাছাড়া বংশ ধারার সংমিশ্রণের আশংকাও যেন তিরোহিত হয়।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের মুখাপেক্ষিতা ও সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার বাৎসল্যের দাবী এটাই যে, তারা তাদের এমন তালীম-তরবিয়ত দেবে, যা হবে সর্বতোভাবে প্রকৃতি সম্মত। সন্তান বয়স্ক ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত মাতা-পিতার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব অব্যাহত থাকবে। তাঁদের পুণ্য চরিত্রের সাহচর্য সন্তানদেরও পুণ্য চরিত্রের অধিকারী করবে। সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষায় মাতা-পিতার শ্রম ও ত্যাগস্বীকার ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এসব কারণেই মা-বাপের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও সদাচরণ সন্তানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

আদম সন্তানদের মেধা ও যোগ্যতার যেহেতু প্রকৃতিগত তারতম্য থেকে যায়, তাই তাদের কেউবা নেতা হয়, মনীষী হয়, বিত্তশালী হয়, এমনকি তার ভেতরে প্রকৃতিগতভাবেই সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতা এবং জনকল্যাণের প্রবণতা দেখা দেয়। পক্ষান্তরে কেউ আবার প্রকৃতিগতভাবেই ভৃত্য, নির্বোধ,অনুগত ও অন্ধ অনুসারী হয়ে থাকে। এ দু'ব্যক্তির জীবন স্বভাবতঃই পরস্পর নির্ভরশীল ও একে অপরের সম্পূরক। এ দু'জন তখনই একে অপরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হবে, যখন দু'জনের পারস্পরিক সম্পর্ককে অন্তরে স্থায়ীভাবে ঠাঁই দেবে।

মানুষের ভেতর আরেকটি সম্পর্ক শাসক ও শাসিতের। তখন শাসক শাসিতের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন করে। মালিক ও গোলাম, প্রভু ও ভৃত্য কিংবা রাজা ও প্রজার সম্পর্কটা এই স্তরের। মানব সমাজে এ ব্যবস্থাটাও চালু রাখা হয়েছে। এই শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের একটা বিধি-বিধান থাকা অপরিহার্য। সে বিধানের অনুসরণ উভয়ের জন্য জরুরী হবে ও ব্যত্যয় ঘটা নিন্দনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। তেমনি মালিক ও গোলামের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গোলামের মুক্তির কোন শর্ত বা বিধান থাকা চাই, হোক সে টাকা দিয়ে কিংবা অন্য কোন উপায়ে যেন মুক্তি পেতে পারে।

তারপর অনেক সময় আবার মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনের শিকার হয়, রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, অচলাবস্থার মুখোমুখী হয়। এক কথায় এমন সব অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাতে করে অন্য মানুষের সহায়তা ছাড়া তার চলাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এ সব সমস্যা সৃষ্টির ব্যাপারে সব মানুষই সমান। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্প্রীতি বজায় রাখা অপরিহার্য হয়। এ কারণেই অভাবী মানুষের সমস্যার সমাধান ও উৎপীড়িতদের উৎপীড়ন রোধের জন্য বিশেষ রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান অত্যাবশ্যক। সে বিধান অবশ্য পাল্য হতে হবে এবং তা বর্জনকারী নিন্দনীয় ও তিরস্কৃত হবে। মানবিক প্রয়োজনের এই সমস্যার সমাধানের জন্য দুটো দিক প্রয়োজন। এক দিকে প্রত্যেকে অপরের লাভ-লোকসান ও ভাল-মন্দকে নিজের লাভ-লোকসান ও ভাল-মন্দ বলে বিবেচনা করবে। অপর দিকে প্রত্যেকে অপরের জন্য নিজের যথাসাধ্য শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করবে, এমনকি নিজের আয় ও সম্পদের অধিকার দান করবে।

সারকথা, পারস্পরিক সহযোগিতার এ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাহায্যদাতা ও সাহায্য গ্রহীতা উভয়ের সহায়তা প্রয়োজন। দাতা যেন তার ক্ষতি স্বীকারের যথাযথ বিনিময় পেয়ে যেতে পারে। দান ও সহায়তার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য দাবী হল নিকটাত্মীয়ের। কারণ, তাদের সাথে নৈকট্য ও সম্প্রীতির সম্পর্কটা সহজাত ও প্রকৃতিগত। দ্বিতীয় ধাপটি সাধারণ মানুষের। স্বভাবতঃই প্রথম ধাপের চেয়ে এর গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম। তবে বিপদগ্রস্তদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া মানুষের একটি স্বীকৃত রীতি হয়ে গেছে। অবশ্য আত্মীয়ের খবরদারী করার ব্যাপারটা সব চাইতে মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব চাইতে গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হল পারিবারিক তথা দাম্পত্য সম্পর্কের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া। যেমন, বিয়ে ও বিচ্ছেদের শর্ত ও কারণসমূহ জ্ঞাত হওয়া, পুরুষ ও স্ত্রীর প্রয়োজনীয় গুণাবলী জানা, পারস্পরিক সু-সম্পর্ক ও হৃদ্যতা সৃষ্টির পদ্ধতি বিদিত হওয়া, স্ত্রীর ইজ্জত-আবরু রক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা, নিজের পবিত্রতা রক্ষা ও স্বামীর আনুগত্যের মাধ্যমে স্ত্রী সংসারের কতখানি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে তা জ্ঞাত হওয়া, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সৃষ্ট অসন্তোষ ও বিরাগের অবসান ঘটানোর উপায় অবহিত হওয়া, তালাকের পন্থা এবং স্বামী বিয়োগের শোক পালনের উপায় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা ইত্যাদি।

তাছাড়া মা-বাপের সাথে কিভাবে সুসম্পর্ক রাখা যায়, ভৃত্য ও কর্মচারীর সাথে কিরূপে সদ্ভাব রাখতে হয়, ভৃত্যরা কিভাবে মালিকের যথার্থ সেবা করতে পারে, গোলাম কি করে প্রভুর কাছে থেকে মুক্তি পাবে, আত্মীয়, পাড়া-পড়শীর সাথে কি ধরনের আচার-আচরণ করতে হবে, অসহায় নাগরিকদের কিরূপ সহানুভূতি দেখাতে হবে, আর তাদের বিপদ মুক্তির জন্য কি কি চেষ্টা করতে হবে, জাতীয় নায়কদের আচার-আচরণ কেমন হবে, আর তারা কিভাবে জাতিকে পরিচালনা করবে, কি ভাবে মীরাছ বন্টন হবে, কি ভাবেই বা বংশধারা সংরক্ষিত হবে, তা সবই অবগত হওয়া অপরিহার্য।

এ কারণেই মানব জাতির ভেতর এমন কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী মিলবে না, যারা উপরোক্ত ব্যাপারসমূহের নির্ধারিত রীতিনীতি অনুসরণ করে চলে না। অথচ তারা বিভিন্ন জাতি আর বিভিন্ন দেশের লোক।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

অর্থনীতি এমন এক বিদ্যা যাতে মানুষের বৈষয়িক সহযোগিতার লেনদেন ও আয়-ব্যয়ের অবস্থা পর্যালোচিত হয়। অর্থনীতির মূলনীতি হল এই, মানুষের চাহিদা যতই খুব বেড়ে গেল আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজন মনের মত করে পূরণ করার জন্য উদগ্রীব হল, ততই দেখতে পেল কারো পক্ষেই বিচ্ছিন্ন থেকে একাকী তা পূরণ করা সম্ভব নয়। কারণ, কারো কাছে হয়তো প্রয়োজনারিক্ত পানি রয়েছে কিন্তু খাবার নেই। ফলে একে অপরের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে বিনিময় ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। তাই এ বিনিময়ের কাজটি অভাব পূরণের জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। তখন এটা অপরিহার্য মনে হল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন এক প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদন বা তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করবে এবং সেটাকেই সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে তুলবে ও তার সর্ববিধ উপকরণ সংগ্রহ ও সরবরাহ করবে। এমনকি সেটাকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিনিময়ের মাধ্যম করার উপযোগী করবে। এ ভাবে বার্টার সিস্টেম অর্থনীতির এক সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন দেখা গেল, একজনের পছন্দনীয় জিনিসটি অপর ব্যক্তির পছন্দ হচ্ছে না, তাই দ্রব্য বিনিময় কোন কোন ক্ষেত্রে অচল হয়ে পড়ছে, তখন তারা এ ব্যবস্থার বিকল্প আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করল। ফলে তারা স্থায়িত্ব লাভকারী খনিজ দ্রব্য উত্তোলনপূর্বক মুদ্রা তৈরী করে বিনিময়ের মাধ্যম বানাল। তখন এটাই সর্বজন স্বীকৃত মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল। খনিজ দ্রব্যের ভেতর সোনা ও রূপা এ কাজে ব্যবহৃত হয়। এগুলো মুদ্রাকারে তৈরী বিধায় মানুষের বহনের জন্যও সহজসাধ্য হল। তাছাড়া সোনা বা রূপার কোন গুণগত তারতম্য না থাকায় পছন্দ অপছন্দের বিরোধ দেখা দিল না। ফলে এ দুটোই সাধারণতঃ স্থায়ী সমাধান হয়ে দাঁড়াল। অন্য মাধ্যমটি শুধু উভয় পক্ষের স্বীকৃতির ভিত্তিতে অব্যাহত থাকল।

উপার্জনের পন্থা হিসেবে মানুষ কৃষি, পশুপালন ও পশু শিকার, কাষ্ঠ ও ফলমূল সংগ্রহ এবং খনিজ দ্রব্য আহরণকে গ্রহণ করল। তাছাড়া কামার, সূতার, তাঁতী ইত্যাদি শিল্পজাত পেশাজীবি গড়ে উঠল। এর মাধ্যমে মানুষ

তার আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভাকে কাজে লাগাল। ব্যবসা-বাণিজ্য এক গুরুত্বপূর্ণ পেশা হিসবে দেখা দিল।

তারপর শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মেথর ও ঝাড়ুদার নামক পেশাদার সৃষ্টি হল। অতঃপর মানুষের নানাবিধ চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিভিন্ন পেশাদার জন্ম নিল। এ ভাবে মানুষ যতই ভোগ-বিলাস ও আড়ম্বরের দিকে অগ্রসর হল, তত বেশী পেশাদার সৃষ্টি হয়ে চলল। এমনকি এক এক পেশায় এক এক শ্রেণী নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

এর কারণ দুটো। প্রথমতঃ প্রত্যেকে তার নিজ নিজ দক্ষতা ও ক্ষমতা অনুসারে নির্দিষ্ট পেশা গ্রহণ করল। সাহসী বাহাদুরেরা সামরিক পেশায়, মেধাবী ও ধীশক্তি সম্পন্নরা অফিস-আদালতের পেশায় এবং দৈহিক শক্তিধর ও পরিশ্রমীরা বোঝা বহন ও শ্রমের পেশায় নিয়োজিত হল। দ্বিতীয়তঃ সুযোগ-সুবিধার কারণেও পেশা নির্ধারিত হয়। যেমন, একজন কামারের ছেলের কিংবা তার সহচরদের জন্য কামার হওয়া যেরূপ সহজ, অন্যের জন্য সেরূপ সহজ নয়, তেমনি কামারের ছেলের জন্য অন্য কোন পেশাও সহজ সাধ্য নয়। যেভাবে নদীর কূলের বাসিন্দাদের জন্য জেলে হওয়া যত সহজ, অন্য কিছু হওয়া তার জন্য তত সহজ নয়।

এসব পেশাদার ছাড়াও কিছু লোক থাকে যাদের কোন ভাল পেশার সুযোগ বা শক্তি থাকে না। তখন তারা নাগরিকদের জন্য ক্ষতিকর পেশায় নিয়োজিত হয়। যেমন চুরি, জুয়া, ডাকাতি, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি!

বিনিময় কার্যের আবার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কখনও দ্রব্য দিয়ে দ্রব্যের বিনিময় হয়। সেটাকে বেচা-কেনা বলা হয়। কখনও দ্রব্যের বিনিময়ে কাজ নেয়া হয়। সেটাকে মজুরী বা ভাড়া বলা হয়। শহরবাসী কিংবা জনবহুল এলাকার নাগরিকদের ভেতর যেহেতু আত্মীয়তা বা প্রতিবেশী সুলভ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে, তাই তাদের ভেতর হেবা, উপহার ও ধার-কর্জের আদান-প্রদান ও লেনদেন চালু হয়। দরিদ্র শ্রেণীর জন্য দান-খয়রাতের রীতি প্রবর্তিত হয়।

মূলতঃ যে কোন সমাজে কিছু লোক জ্ঞানী হয়, কিছু লোক বোকা হয়, কিছু লোক সবল হয়, কিছু লোক কর্মঠ হয়, কিছু লোক বিলাসী হয়, কিছু হিসেবী হয়, এবং এর ফলে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। তাই

একে অপরের সহযোগীতা ছাড়া চলতে পারে না। এ সহযোগীতার ক্ষেত্রে চুক্তি, শর্ত ও সমঝোতার প্রশ্ন দেখা দেয়।

এ সবের জন্যই বর্গা প্রথা, সমবায় প্রথা, শেয়ারের ব্যবসা, পাওয়ার অব এটর্নী; ইজারা প্রথা ইত্যাদি রীতি চালু হয়। এ ক্ষেত্রে ধার-কর্জও জরুরী হয়। কখনও আমানতের লেনদেন হয়ে থাকে্ এসব ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততার অভাব দেখা দেয়ায় সাক্ষী-সাবুদ, লেখা-পড়া, দলীল-দস্তাবীজ, জামীন-জামানত ইত্যাদি ব্যবস্থা অনুসৃত হয়। মানুষ যত বেশী সম্পদ আহরণ করতে থাকল, তত বেশী পারস্পরিক সহযোগীতার রীতি-নীতি চালু হতে লাগল।

এভাবে সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের ভেতর লেনদেনের এসব রীতি-নীতির বিস্তার লাভ ঘটেছে। আপনারা এও দেখতে পাবেন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ভাল-মন্দের ভিত্তিতেই ন্যায়বান ও নিপীড়ক নির্ণীত হয়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ
রাজনীতি

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেই বিদ্যাকে বলে, যাতে নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়। কোন রাষ্ট্রের নাগরিক বলতে তাদের বুঝায়, যারা ভিন্ন ভিন্ন থাকা সত্ত্বেও সম ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ও জীবন-জীবিকার যাবতীয় কায়কারবারে পরস্পর সম্পৃক্ত।

মূলতঃ যে কোন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ একই ব্যক্তি সদৃশ, যার বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগ মিলে একক দেহ গঠিত হয়েছে। প্রত্যেকটি যৌগিক বস্তুর যে কোন অংশে ক্ষতি দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে কিংবা তাতে কোন ব্যাধি সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ, তাতে যথাযথ অবস্থার বদলে কোন অব্যবস্থা দেখা দিতে পারে। অথবা তাতে যথাযথ অবস্থা বহাল থাকতে পারে এবং তা সুন্দর ও সুস্থ মনে হতে পারে। মোটকথা, বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে সৃষ্ট যে কোন বস্তুতে এদুটো অবস্থা দেখা দিতে পারে।

যে কোন রাষ্ট্রে বহু লোক বাস করে। ভাল-মন্দ ভাবনার ব্যাপারে নানা

মুনির নানা মত হওয়া স্বাভাবিক। কোন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পরিষদ ছাড়া কেউ কারো নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখে না। কারণ, তা করতে গেলে ঝগড়া-বিবাদ ও দাংগা-হাংগামা সৃষ্টি হবে। তাই গোটা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ এমন এক ব্যক্তির হাতে থাকতে হবে যার আনুগত্য রাষ্ট্রের ভাংগা-গড়ার ক্ষমতাসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মেনে নেয়। অর্থাৎ, তিনি হবেন তাদেরই নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান। রাষ্ট্র প্রধানকে পূর্ণ ক্ষমতাবান হতে হবে। তার অধীনে সামরিক বাহিনী থাকতে হবে! সংকীর্ণমনা উগ্র স্বভাবের দাংগা-হাংগামা প্রিয় লোকদের জন্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন সর্বাধিক।

এই ব্যবস্থার অবর্তমানে দেখা যায় যে, দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসে এবং তখন তারা ইনসাফের বিধি-বিধান বর্জন করে খেয়ালখুশী মত সমাজ পরিচালিত করে। এ ধরনের সংগঠনকে ডাকাত সংঘের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তাদের উদ্দেশ্য থাকে শুধু জনসাধারণের সম্পদ লুণ্ঠন করা। অথবা তাদের কাজ হয় হিংসা-বিভেদ ছড়ানো, শত্রুতা উদ্ধার করা ও যে কোন মূল্যে ক্ষমতায় জেঁকে বসা। এদের হাতে মানুষের চরম দুর্গতি নেমে আসে। এরূপ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করে তাদেরকে উৎখাতের জন্য জেহাদ করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

সঠিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবর্তমানে অন্যান্য যে সব জটিলতা ও অকল্যাণ দেখা দেবে তা হল এইঃ

কোন দুর্ধর্ষ লোক যদি কাউকে হত্যা কিংবা আহত করে, অথবা নির্যাতন করে, কিংবা কারো স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নির উজ্জত নষ্ট করতে চায়, অথবা তার ধন-সম্পদ গায়ের জোরে ছিনিয়ে নেয় বা রাতের আঁধারে চুরি করে কিংবা কারো সম্মান হানি ঘটায়, অপবাদ রটায় ও নানা ভাবে ক্ষতি করে চলে, তখন তার প্রতিকারের কোন উপায় থাকে না।

এ সব প্রকাশ্য অপরাধ ছাড়াও বেশ কিছু অপ্রকাশ্য ও পরোক্ষ অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন, যাদু করা, বিষ খাওয়ানো, মানুষকে ক্ষতিকর ব্যবহার শিক্ষা দান, মানুষে মানুষে ঝগড়া বাঁধানোর ষড়যন্ত্র করা, রাষ্ট্রপতি ও নাগরিক, কর্মচারী ও মালিক, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট করার চক্রান্ত চালানো ইত্যাদি।

তেমনি চরিত্র ধ্বংসকারী কার্যকলাপ যথা পুরুষ কিংবা নারীর সমকামিতা অথবা পশুর সংগে পাশবিকতার মত বদ-অভ্যেস মানব সমাজের সামাজিক রীতি-নীতির বিপর্যয় ঘটায়। এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের ভাংগন সৃষ্টি হয়, কিংবা তারা অসুখী হয়।

তেমনি সে সব বদঅভ্যেস যা মানব সমাজের বিবেক ও রুচির পরিপন্থী। যেমন পুরুষরা নারী সেজে নারী সুলভ আচরণ চালায় কিংবা নারীরা পুরুষ সেজে পুরুষের আচরণ দেখায়।

তেমনি সেসব স্বভাব যা বড় রকমের ঝগড়ার সৃষ্টি করে। যেমন, এরূপ কোন নারী লাভের জন্য কয়েকজনে জুটে কাড়াকাড়ি করা যে নারী মূলতঃ কারো জন্যই নির্ধারিত নয়, কিংবা মদ পান করে মাতলামী করা।

তেমনি নাগরিক জীবন দুর্বিষহ করার বিভিন্ন গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়া। যেমন, জুয়া খেলা, ঘুষের আদান-প্রদান, মাপে কম দেয়া, ভেজাল মেশানো, দুর্মূল্য সৃষ্টির জন্য গুদামজাত করা, কিংবা ফটকাবাজারী করা, অন্যকে ফাঁসানোর জন্য দাম বাড়ানোর দালালী করা ইত্যাদি।

তেমনি নাগরিক জীবন অতীষ্টকারী ঘৃণ্য কার্যকলাপে লিপ্ত থাকা। মিথ্যা মামলা, বানোয়াট ও জাল দলীল প্রণয়ন, মিথ্যা সাক্ষী, মিথ্যা শপথ ইত্যাদি। কারণ, এসব কারণে সত্য উদঘাটন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা দুরূহ হয়ে পড়ে। পরন্তু নাগরিক নৈতিকতাও কলুষিত হয়।

তেমনি শহরবাসী শহরে পেশা ছেড়ে গ্রামে গিয়ে চাষাবাদ শুরু করা কিংবা গ্রামবাসী চাষাবাদ ছেড়ে সবাই ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করাও একটা ক্ষতিকর দিক। কারণ, যে পেশায় যারা দক্ষ তারা হঠাৎ পেশা বদল করলে সব ক্ষেত্রেই অদক্ষতা ও ব্যর্থতা দেখা দেয়। এ কারণে খাদ্য উৎপাদকদের যেমন খাদ্য উৎপাদনে থাকা উচিত, তেমনি অন্যান্য পেশাদারদের নিজ নিজ পেশায় দক্ষতা প্রয়োগে লেগে থাকা কর্তব্য। মূলতঃ কৃষিকাজ যেন খাদ্য আর অন্যান্য পেশা যেন লবণ। একটি ছাড়া অপরটি বিস্বাদ ও অর্থহীন হয়ে যাবে।

তেমনি হিংস্র জন্তু ও ক্ষতিকর প্রাণী এবং কীট-পতংগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়া। অথচ সেগুলো ধ্বংস করে ফেলা অপরিহার্য।

এসব তো গেল রাষ্ট্রের নাগরিক জীবনের নিরাপত্তার জন্য নাগরিকদের নীতি-নৈতিকতার বিভিন্ন দিক। এখন আলোচ্য হচ্ছে তাদের বৈষয়িক

সংরক্ষণ ও উন্নয়নের দিকসমূহ। যেমন, রাজধানী ও কেন্দ্রীয় শহরগুলোর জাতীয় প্রয়োজনে বিভিন্ন সৌধ নির্মাণ, প্রাচীর ও দুর্গ তৈরী, সরাইখানা, বাজার, রাস্তা-ঘাট, ও পুল তৈরী, পুষ্করিণী, খাল ও কূপ খনন, নদী বন্দর ও জাহাজ তৈরী করে পণ্য আমদানী-রফতানী ও যোগাযোগের ব্যবস্থা করা, চাকরী, ব্যবসা ও শিল্পের সৃষ্টি করা, স্বদেশী ও বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের আকর্ষণ ও সুযোগ সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

তাছাড়া প্রত্যেক পেশার লোকজনকে নিজ নিজ পেশার কাজের উৎসাহ, পরিবেশ ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। বেকারদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। শিল্পখাতে দ্রব্য যাতে উন্নতমানের হতে পারে তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারিগরি শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। কৃষি বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে। ভূমি অনাবাদী রাখা যাবে না। ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্লানিংয়ে পারদর্শী লোক তৈরী করতে হবে, দেশের নাগরিকদের সামগ্রিক অবস্থা জানার ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাহলে কার কোথায় কি প্রয়োজন তা যথাসময়ে নিরসনের ব্যবস্থা নেয়া যাবে। বিত্তবানদের সহায়তায় বিত্তহীনদের অবস্থার প্রতিকার করতে হবে।

বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় তহবিল যেন বেকারভাতা আর ওলামা, সেনানায়ক, কবি-সাহিত্যিক ইত্যাকার অনুৎপাদনশীল লোকের ভার বহন করে নিঃশেষ না হয়। তাহলে পেশাদার কৃষক ও ব্যবসায়ীদের ওপর অতিরিক্ত ট্যাক্স বসিয়ে তাদের নিরুৎসাহ করা হবে। ফলে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার অধিকতর দুর্বল হয়ে পড়বে। এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহ-বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। তাই কর্মহীন সব লোককেই বেকারভাতা না দিয়ে কর্মক্ষমদের উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করতে হবে এবং সামারিক ও পুলিশ বাহিনীতে প্রয়োজন মোতাবেক নিয়োগ করতে হবে। রাষ্ট্রনায়কদের উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো সতর্কতার সাথে অনুধাবন করতে হবে।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রপতিগণের চরিত্র ও গুণাবলী

রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই যথোপযোগী চরিত্র ও গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে। অন্যথায় তিনি রাষ্ট্রের জন্য আপদ ও বোঝা হয়ে দাঁড়াবেন। তিনি যদি সাহসী না হন তা হলে তাঁর প্রতিপক্ষের সাথে যথাযথভাবে মোকাবেলা

করতে ব্যর্থ হবেন। ফলে জনগণ তাকে হেয় চোখে দেখবে। তেমনি যদি তিনি ধৈর্যশীল না হন, তাহলে জনগণ তাঁর হাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তেমনি যদি তিনি বিজ্ঞ না হন, তাহলে জনগণের কল্যাণ সাধনে তিনি অপারগ হবেন।

রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই জ্ঞানী, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন ও পুরুষ হতে হবে। আরও হতে হবে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণক্ষম। তাঁকে দৃষ্টি, শ্রবণ ও বাক শক্তির অধিকারী হতে হবে। জনগণ তাঁর ব্যক্তিত্ব ও খান্দানকে যেন মর্যাদার চোখে দেখে। তাঁর নিজের ও বাপ-দাদার এরূপ ভাল পরিচিতি থাকা চাই যা থেকে জনগণ তাঁর ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারে। তারা যেন বিশ্বাস করতে পারে যে, তার দ্বারা দেশ ও জাতির যথার্থ কল্যাণ হবে।

রাষ্ট্রপতির এসব গুণাবলীর প্রয়োজনীয়তা জ্ঞানী মাত্রই উপলব্ধি করবেন। আর এ ব্যাপারে সকল বনী আদম একমত। যে দেশে আর যে সম্প্রদায়ের লোকই হোক না কেন, এ ব্যাপারে তাদের কোন মতানৈক্য নেই। কারণ তারা জানে, রাষ্টপতি নির্বাচনের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তা উপরিবর্ণিত চরিত্র ও গুণাবলী ছাড়া অর্জিত হতে পারে না। সে ক্ষেত্রে জনগণ স্বভাবতঃই তার প্রতি বিরূপ হবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে গণ-অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়বে। যদি তারা প্রকাশ্যে কিছু নাও বলে, তথাপি তারা অসন্তোষের কারণে রাষ্ট্রীয় কাজে উদাসীন থাকবে।

তাই রাষ্ট্রপতির জন্য প্রয়োজন হল গণমনে তাঁর প্রভাব ফেলা ও তা সর্বক্ষণ অক্ষুণ্ন রাখা। তেমনি যে সব কাজ তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে সেগুলোর ব্যাপারে তাঁর সার্বক্ষণিক সতর্কতা প্রয়োজন। যে রাষ্ট্রপতি তাঁর প্রভাব সৃষ্টি করতে আর তা অক্ষুণ্ন রাখতে চান, তাঁকে অবশ্যই উপরোক্ত চরিত্র ও গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে। তাছাড়া রাষ্ট্রনায়ক সুলভ সব ধরনের গুণাবলীই তাকে অর্জন করতে হবে। যেমন, সাহসিকতা, বিজ্ঞতা, বদান্যতা, ক্ষমাপরায়ণতা, ঔদার্য্য সার্বজনীন কল্যাণ প্রবণতা।

জনগণের ভেতরে প্রভাব বিস্তার করে তাদের মুঠোয় আনার জন্য রাষ্টপতিকে শিকারীর ভূমিকা নিতে হবে। শিকারী যেরূপ জংগলে বিভিন্ন কলাকৌশলের মাধ্যমে হরিণ শিকার করে থাকে, ঠিক সেরূপ করতে হবে। শিকারী জংগলে গিয়ে যখন কোন হরিণ দেখতে পায়, তখন সে হরিণের

স্বভাব ও মেজাজের উপযোগী পন্থা ও কলাকৌশল ভেবে নেয়। তারপর সে শিকারের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। যখন শিকার দৃষ্টিগোচর হয়, তখন সেটার চোখ-কান থেকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা চালায়। যখন সন্দেহ হয় যে শিকার তার উপস্থিতি টের পেয়েছে তখনই নিষ্প্রাণ পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। যখন বুঝতে পায়, শিকার তার ব্যাপারে উদাসীন হয়েছে, তখনই আগে বেড়ে যায়। কখনও শীশ দিয়ে সেটাকে খুশী করে আর তার সামনে তার প্রিয় বস্তু এগিয়ে দেয়, তা সে এমনভাবে দেয় যেন সেটাকে মায়া করেই খাওয়ার জন্য দেয়, শিকার করার ইচ্ছে তার আদৌ নেই। এভাবে দাতা ও গ্রহীতার ভেতর প্রীতি বেড়ে যায়। এ প্রীতির শৃংখল লোহার শিকলের চেয়ে শক্ত। এভাবে সেটা শিকারীর সহজ শিকারে পরিণত হয়। ঠিক এভাবেই যে ব্যক্তি নিজেকে জনগণের সামনে পেশ করতে চায় তার উচিত জনগণের পছন্দনীয় পোশাক, কথাবার্তা ও আচার-আচারণ অবলম্বন করা। তারপর আস্তে আস্তে তাদের কাছাকাছি হতে থাকবে আর ছল চাতুরীমুক্ত নিঃখাত প্রীতি ও ভালবাসা তাদের বিলিয়ে চলবে। তারা যেন ঘুনাক্ষরেও সন্দেহ করতে না পারে যে, তাঁর এ প্রীতি, অনুগ্রহ তাদের শিকার করার জন্যই দেখানো হচ্ছে। তাদের অন্তরে এটা মজবুত ভাবে বসিয়ে দিতে হবে যে, তাদের জন্য তার মত হিতাকাঙ্ক্ষী আর কেউ হতে পারবে না। এভাবে তাদের অন্তরে তার প্রভাব ও মর্যাদা সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাদের অন্তর যেন তার প্রীতিতে ভরপুর হয়ে যায়। ফলে যেন তারা তার ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে।

মোটকথা, রাষ্ট্রপতির এ সব ব্যাপার খুব লক্ষ্য রাখতে হবে। তার তরফ থেকে যেন এমন কাজ প্রকাশ না পায় যাতে উর্ক্ত অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটায়। যদি কোন ভুলত্রুটি হয়ে যায়, তাহলে ভাল কিছু করে সংগে সংগে তার প্রতিকার করবে। তারপর বুঝিয়ে দেবে যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটাকেই তাদের জন্যে ভালবেসে করা হয়েছিল এবং তাদের ক্ষতির জন্যে আদৌ করা হয়নি।

এ'তো গেল এক দিক। অপর দিকে যারা রাষ্ট্রপতির অবাধ্য হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় তাদের জন্য শাস্তির

ব্যবস্থা রাখতে হবে। পক্ষান্তরে যারা তার আনুগত্য মেনে নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা করবে তাদের জন্য পদোন্নতি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে খেয়ানতকারী এবং অবাধ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতি ও বেতন হ্রাসের ব্যবস্থা নিতে হবে।

মোটকথা, যে ব্যক্তি জনগণের অকল্যাণ করবে তার অকল্যাণ করতে হবে। তবে কারো বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার আগে পরামর্শ সভায় তা আলোচনা করে তাদের বুঝিয়ে নিতে হবে যে, সে শাস্তি পাবার যোগ্য। রাষ্ট্রপতির বা কোন সরকারী কর্মকর্তার পক্ষে জনগণকে অনুর্বর বা অনাবাদী জমি চাষ করতে কিংবা আবাদের জন্য কোন দূর দূরান্তে যেতে বাধ্য করা উচিত হবে না।

রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই সুস্পষ্ট দৃষ্টিসম্পন্ন ও দূরদর্শী হতে হবে। জনগণের ইচ্ছা আকাংক্ষা হৃদয়ঙ্গম করার মত ক্ষমতা তার থাকতে হবে। সব ব্যাপারে তার ধারণা এরূপ স্বচ্ছ থাকতে হবে যেন তিনি সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।

রাষ্ট্রপতির জন্য অপরিহার্য হচ্ছে আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে না রাখা। তেমনি কেউ যদি তার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র চালায়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে শায়েস্তা না করা যায়, ততক্ষণ তার ক্ষান্ত হওয়া ঠিক নয়।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ পরিষদ ও কর্মকর্তাদের গুণাবলী ও দায়িত্ব

রাষ্ট্রপতি যেহেতু রাষ্ট্রের উপরোক্ত ব্যবস্থাপনা ও কল্যাণমূলক কার্যকলাপের সব কিছু একা করতে পারেন না, তাই স্বভাবতঃই সহায়ক ব্যক্তিবর্গ থাকতে হবে। উক্ত সহায়ক লোকদের জন্য পয়লা শর্ত হল তাদের অবশ্যই যোগ্য ও আমানতদার হতে হবে। তেমনি রাষ্ট্রপতির প্রতি বাহ্যিক ও আন্তরিক আনুগত্য ও আস্থা থাকতে হবে। যার ভেতরে উপরোক্ত গুণাবলীর অভাব পরিলক্ষিত হবে তাকে পদচ্যুত করতে হবে। যদি রাষ্ট্রপতি তাকে পদচ্যুত করতে অবহেলা করেন, তা হলে তিনি যেন রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। পরন্তু নিজের অবস্থাও খারাপ করে ফেললেন।

এ কারণেই রাষ্ট্রীয় কাজে তাঁর এমন লোককে নিয়োগ করা উচিত নয়, যাকে তিনি পদচ্যুত করতে পারবেন না। তেমনি এমন কোন ঘনিষ্ঠ আপনজনকে তাঁর নিয়োগ করা উচিত নয় যাকে অপসারণ করা তাঁর জন্য অশোভন হবে।

রাষ্ট্রপতির উচিত, তাঁর প্রতি যারা আন্তরিক তাদের দিকে নজর রাখা। কারণ কিছু লোক ভয়ে আর কিছু লোক লালসায় তাঁর প্রতি প্রীতি দেখায়। এ ধরনের বন্ধুদের কোন কিছুর মাধ্যমে কৌশলে জড়িয়ে রাখা চাই।

তবে কিছু লোক অত্যন্ত আন্তরিকতা নিয়েই তাঁকে ভালবাসে। তাই তাদের লাভকে নিজের লাভ ও তাদের ক্ষতিকে নিজের ক্ষতি মনে করা উচিত। মূলতঃ এক ধরনের লোক প্রকৃতিগত ভাবেই নিঃস্বার্থ ও সরল স্বভাবের হয়ে থাকে। এরা সেই শ্রেণীর লোক।

রাষ্ট্রপতির উচিত নয় কারো থেকে তার যোগ্যতা ও ক্ষমতার বাইরে কিছু আশা করা। তাঁর সহায়ক ব্যক্তিবর্গ চার শ্রেণীর হতে পারে। একদল হল প্রতিরক্ষা ও শান্তিরক্ষী বাহিনীর লোক। রাষ্ট্রকে বহিঃশত্রু ও অভ্যন্তরীণ দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে রক্ষা করা তাদের দায়িত্ব হবে। তারা দেহের সেই হাত যা সর্বদা সশস্ত্র থাকে। এক দল হবে দক্ষ ও কুশলী কর্মচারী। তারা মানব দেহের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতার সাথে তুলনীয়। একদল হবে পরামর্শদাতা, তারা মানব দেহের বুদ্ধিবৃত্তি ও মানবতার সাথে তুলনীয়। রাষ্টপতির সাথে অপরিহার্য যা তা হচ্ছে প্রতি নিয়ত তাদের খবরাখবর রাখা ও ভাল-মন্দ দেখা।

রাষ্ট্রপতি ও তার উক্ত সহায়কবৃন্দ যখন জনগণের কর্মচারী হয়ে অহরহ তাদের কল্যাণে নিয়োজিত হয়, তখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব হয়ে যায় তাদের ভরণ- পোষণের ব্যবস্থা করা। তবে রাজস্ব ও কর আদায়ের ক্ষেত্রে সহজ সরল পন্থা অনুসরণ করা চাই। তাতে যেন জনগণের ক্ষতি ও হয়রানী দেখা না দেয়। অথচ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনও যেন মিটে যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির কিংবা প্রতিটি মালামালের ওপর ট্যাক্স বসানো উচিত নয়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রনায়কগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শুধু সচ্ছল লোকের ওপর ট্যাক্স হওয়া উচিত। যেমন পশু সম্পদ কৃষিজাত দ্রব্য, কিংবা ব্যবসার মালামালের ওপর ট্যাক্স হতে পারে। তাতেও যদি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন

পূরণ না হয়, তা হলে পেশাদার লোকদের ওপর আয়কর ধার্য করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির এটাও অপরিহার্য্য দায়িত্ব যে, সেনাবাহিনীকে তিনি সে ভাবেই গড়ে তুলবেন, যেভাবে এক দক্ষ অশ্বারোহী তার অশ্বকে গড়ে তোলে। কোন ঘোড়ার কি চাল-চলন, কোনটির কোন বদঅভ্যাস, কোনটির দৌড় ও দোলা কিরূপ, কোনটি আরোহীকে ঠিকভাবে নেয়, আর কোনটি ফেলে দিতে চায়, তা তার ভাল ভাবে জানা থাকে এবং সে ভাবেই ব্যবস্থা নিয়ে সে সেগুলোকে কাজে লাগায়। কখন আদর করতে হবে, কখন চাবুক মারতে হবে তা সে বুঝতে পারে। তাই যখন তারা ঘোড়া কোন অনুভিপ্রেত স্বভাব প্রকাশ করে, তখন এমন ভাবে সে তাকে শিক্ষা দেয়, যাতে শিক্ষাটি সে মেনে নেয়, তার শৈথিল্য চলে যায়, অথচ সেটা কোন পেরেশানীর শিকার হয় না। কারণ, কি জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে সেটা সে অনায়াসে বুঝতে পায়। এভাবে যখন যে স্বভাবের জন্য সেটাকে শিক্ষা দেয়া হয় সেটা যদি তার সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা যায়, তা হলে সেটা তার অন্তরে স্থায়ীভাবে দাগ কাটে। ফলে সেই স্বভাবের পুনরাবৃত্তির ভয়ে এগিয়ে চলে। তথাপি সেটার এ ভয়টাকে স্বভাবে পরিণত করা পর্যন্ত সে সতর্কতার সাথে এ পরিবর্তন লক্ষ্য করতে থাকে। যখন দেখতে পায় যে, কোনরূপ সতর্কতা ছাড়াই সেটা স্বাভাবিকভাবে সদাচরণ করে চলে, তখনই কেবল সে নিশ্চিত হয়ে থাকে।

ঠিক এ পদ্ধতিতেই সেনাবাহিনীকে সুশৃংখল করে গড়ে তোলা অপরিহার্য। তারা যেন তাদের করণীয় ও বর্জনীয় কাজগুলো যথাযথ ভাবে জানতে পারে এবং সেভাবে নিজেদের পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারে। সেনানায়কদের সেদিকে সদা-সতর্ক দৃষ্টি থাকবে এবং তাদের থেকেও কঠোর নিয়ম-শৃংখলার বাইরে কিছু প্রকাশ না পায় সেদিকে খেয়াল রাখবে। রাষ্ট্রপতির এ সহায়ক শক্তিগুলোর সংখ্যার নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা থাকবে না। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তা কমানো-বাড়ানো হবে। কারণ, কখনও কোন কাজে একজনই যথেষ্ট হয়, কখনও আবার একাধিক লোকের প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে মূল কর্মকর্তা হবেন পাঁচ জন।

এক, প্রধান বিচারপতি। তিনি হবেন পুরুষ, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন, বিজ্ঞ, ধীশক্তি সম্পন্ন ও যোগ্য। তাকে তাঁর বিষয়গত বিদ্যায় পারদর্শী হতে হবে এবং পক্ষ-বিপক্ষের বক্তব্যের মারপ্যাঁচ ও ছলচাতুরী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতে হবে। স্বভাবে দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য থাকতে হবে।

বিচার করতে হলে তাকে দুটো ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে। প্রথমেই বিচার্য ঘটনাটি বিশ্লেষণ করে তাঁর দেখতে হবে যে, এটা আদৌ কোন ঘটনা কিনা। যদি সত্যি কোন ঘটনা হয়, তা হলে সেটা জুলুম-বঞ্চনার ব্যাপার, না ভুল বুঝা-বুঝির ফলে সৃষ্ট আপোসযোগ্য ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ তাঁর দেখতে হবে যে, বাদী-বিবাদী মূলত তার প্রতিপক্ষের কাছে কি চায় এবং কার চাওয়াটা সঠিক, আর কারটি সঠিক নয়। তাছাড়া ঘটনা জানার সূত্রগুলোও বিশ্লেষণ করে দেখা চাই। কেননা, একপক্ষের হয়ত এরূপ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ রয়েছে যার ওপর কারো কোন সংশয় দেখা দেবে না। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের দলীল-প্রমাণ অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সংশয়যুক্ত। এ সবই বিচার-বিশ্লেষণ সাপেক্ষ ও এগুলো পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করেই রায় দিতে হবে।

দুই, প্রধান সেনাপতি। প্রধান সেনাপতিকে অবশ্যই সেনা সরঞ্জাম, সমরোপকরণ ও সমর কৌশল সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকেফহাল হতে হবে। তাঁকে সাহসী ও শক্তিশালী লোক সংগ্রহ করতে হবে। প্রতি ব্যক্তির কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতা জানতে হবে। সৈন্যদের প্রশিক্ষণ ও গোয়েন্দা নিয়োগের কলাকৌশল ভালভাবে জানা চাই। শত্রুর ঘাঁটিসমূহ ও আক্রমণ পরিকল্পনা সম্পর্কে তাকে ওয়াকেফহাল থাকতে হবে।

তিন, পুলিশ প্রধান। শান্তিরক্ষী বাহিনীর প্রধানকে অবশ্যই সাহসী ও সুদক্ষ পুরুষ হতে হবে। কিভাবে রাষ্ট্রের শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করা যায় ও শান্তি ভংগকারীদের শায়েস্তা করতে হয়, তা তাকে ভালভাবেই জানতে হবে। তার চরিত্রেও দৃঢ়তা ও ধৈর্য থাকতে হবে। তাকে অবশ্যই সেই স্বভাবের লোকদের একজন হতে হবে, যারা কোন অন্যায় দেখে চুপ থাকতে পারে না। পুলিশ প্রধান যখন এ স্বভাবের হবেন, তখন স্বভাবতঃই তিনি অনুরূপ স্বভাবের লোকই বেছে বেছে প্রত্যেক এলাকায় দায়িত্বশীলদের শ্রেণীতে নিযুক্ত করবেন। তারা অবশ্যই স্ব-স্ব এলাকার

খবরাখবর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবেন। তাদের মাধ্যমে তিনি সারা দেশে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করবেন। যখন প্রয়োজন তখনই তাদের কাজের কৈফিয়ত নেবেন।

চার, রাজস্ব সচিব। সমগ্র রাজস্ব বিভাগে কর্মচারী নিয়োগ, সঠিক পাত্র থেকে রাজস্ব আদায় ও যথাযথ ক্ষেত্রে তা বিতরণ, তাঁর দায়িত্বে থাকে।

পাঁচ. প্রাইভেট সেক্রেটারী। রাষ্ট্রপ্রধানের করণীয় ব্যাপারগুলোয় তাঁকে সাহায্য করা ও তার ব্যক্তিগত ব্যাপার তদারক করাই তার দায়িত্ব। কারণ রাষ্ট্রীয় সার্বিক দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত করার ফলে রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনের অবকাশ পান না।

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ

আন্তঃরাষ্ট্রিক নীতিমালা

এ অধ্যায়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক নীতিমালা আলোচিত হবে। কি করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মাঝে সুসম্পর্ক বহাল রাখা যায় সেটাই এ নীতিমালার লক্ষ্য। এ নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ও জাতির ভেতরে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক কায়েম হবে। যেহেতু প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বাধীন ও তার শাসকই রাষ্ট্রের সব কিছুর অধিকর্তা, তাই স্বভাবতঃই তার ভাণ্ডারে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয় এবং লোভী ও উচ্চাভিলাষী লোক তার সভাসদ হয়। ফলে বিভিন্ন স্বভাব ও দক্ষতার শাসকমণ্ডলীর ভেতরে মতানৈক্য ও দ্বন্দ্ব দেখা যায়। যে শাসক নিজকে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দেখতে পায়, সে শাসক অপেক্ষাকৃত দুর্বল শাসকদের উপর জোর-জুলুম চালাতে চায়। এমন কি তা দখল করে নেয়ার জন্য লালায়িত হয়। তাছাড়া সম পর্যায়ের হলেও পারস্পরিক ঈর্ষা থেকে ছোট-খাট বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কখনও সীমান্ত ভূখণ্ড নিয়ে, কখনও বা সম্পদ আহরণ নিয়ে এ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এ সবের ফলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দেয়। এ কারণেই একজন খলীফার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে যায়।

খলীফা বলতে সেই লোকটিকে বুঝায়, যার কাছে সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম এত বেশী রয়েছে যে, তার দিকে কারো হাত বাড়ানো

স্বভাবতঃই অসম্ভব। কারণ তার রাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ করতে হলে অনেক রাষ্ট্রও তাদের সেনা সম্পদ একত্র করে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে হয়ত তা কিছুটা ভাবা যায়। অথচ তার বিরুদ্ধে সব রাষ্ট্র ও সম্পদ একত্র করা সাধারণত এক অভাবনীয় ব্যাপার।

রাষ্ট্রবর্গের যখন কোন খলীফা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তার মাধ্যমে উত্তম নীতি ও চরিত্র পরিশীলিত হয়, বিদ্রোহীরা অনুগত হয়ে যায় ও শাসকবর্গ তাকে মেনে নেয়, তখন আল্লাহর নিয়ামত পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সব রাষ্ট্রে স্বস্তি দেখা দেয় এবং জনগণ আশ্বস্ত হয়ে যায়। খলীফাকে তখন শুধু হিংস্র প্রকৃতির লোকদের শায়েস্তা করতে হয় যারা জনগণের সম্পদ লুটে খায় আর তাদের সন্তানদের কয়েদী বানিয়ে থাকে। তিনি তাদের উৎপাত-উৎপীড়নের মূল্যোৎপাটন ঘটিয়ে জনগণকে তাদের ক্ষতি ও ভীতি থেকে মুক্ত করেন।

এ কারণেই বনী-ইসরাঈলরা তাদের নবীর কাছে আবেদন করেছিল যে, 'আমাদের জন্য একজন বাদশাহ পাঠান, তাহলে আমরা আল্লাহ্র পথে জেহাদে অবতীর্ণ হতে পারব।' যখন প্রকৃতি পূজারী হিংস্র প্রকৃতির লোকগুলো বদ অভ্যেসের বশবর্তী হয়ে দেশে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে, তখন তার প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ পাক নবীদের সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে এ কথাই জানিয়ে দেন যে, প্রথমে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নির্মূল করতে হবে। তাতেও তারা সংশোধিত না হলে তাদের হত্যা করতে হবে। এ ধরনের লোক সমাজ দেহের বিষাক্ত অংগটির মতই আশংকাজনক হয়ে থাকে। তখন খলীফার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ ব্যবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ-

لَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ *

সূরা হাজ্জ ঃ ৪০

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক যদি একদল দ্বারা অন্য দলকে শায়েস্তা না করতেন, তা হলে তারা গীর্জা, মসজিদ সব কিছুই বিধ্বস্ত করত।

আল্লাহ্ পাক এ কারণেই বলেছেন, "তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ অভিযান অব্যাহত রাখ যতক্ষণ না ফেতনা-ফাসাদ নির্মূল হয়।

ধন-সম্পদ ও লোক-লশকর ছাড়া খলীফার পক্ষে বিদ্রোহী শাসকদের প্রভাব- প্রতিপত্তি নির্মূল করা সম্ভব নয়। তাই খলীফাকে অবশ্যই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সাজ- সরঞ্জাম সম্পর্কে পারদর্শী ও ওয়াকিফহাল হতে হবে। তেমনি তাকে যুদ্ধ ও সন্ধির রীতি-নীতিও ভালভাবে জানতে হবে। কাদের থেকে রাজস্ব আদায় করতে হবে আর কাদের ওপর জিযিয়া ধার্য করতে হবে তাও জানতে হবে।

খলীফাকে প্রথমে স্থির করতে হবে, কেন তিনি যুদ্ধে নামবেন? তিনি কি কোন প্রকার জুলুম বন্ধ করার জন্য অভিযান চালাবেন, না জালিমকে নিপাত করার জন্য যুদ্ধ করবেন? এ ক্ষেত্রে তাঁর কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে। হয় সেরূপ শাসকের দম্ভ চূর্ণ করে অনুগত রাখা, নয় ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের নায়ককে নির্মূল করে অন্যান্যদের সংযত করা, কিংবা তাকে বন্দী করে শিক্ষা দেয়া, অথবা দেশ ও সম্পদ করায়ত্ত করা, কিংবা সে দেশের জনগণকে তার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়া ও তাদের সহায়তা করা।

মূলতঃ খলীফার জন্যে এর চেয়ে বেশী জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। কারণ, আপনজনদের বিরাট এক দলকে রণাংগনে নিঃশেষ করে সম্পদের পাহাড় জমানো খলীফার কাজ হতে পারে না। খলীফার জন্য ফরয হচ্ছে দেশবাসীর অন্তর জয় করা। প্রত্যেকটি কল্যাণের কাজ সম্পর্কে তার ধারণা থাকবে। প্রতিটি ব্যক্তির অবস্থা জেনে নিয়ে তার থেকে তার চাইতে বেশী কিছু আশা করা যাবে না। জ্ঞানী ও নেতৃত্বের অধিকারী লোকদের মর্যাদা দিতে হবে। তাদের উৎসাহ জাগিয়ে ও প্রয়োজনে ভীতি প্রদর্শন করে জিহাদের জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

খলীফার প্রথম লক্ষ্য থাকবে আওতাধীন রাষ্ট্রসমূহে অনৈক্য সৃষ্টি করে তাদের বিক্ষিপ্ত করে রাখা। তাহলেই তারা দুর্বল ও সন্ত্রস্ত থাকবে। এমনকি তারা তাঁর সামনে এরূপ অসহায় হয়ে থাকবে যে, নিজে স্বাধীন ভাবে কোন ষড়যন্ত্র করার সাহস দেখাবে না। যখন তাদের এ অবস্থা দেখা দেবে তখন সহজেই তাদের সে সব ব্যবস্থা মানিয়ে নেয়া যাবে না যুদ্ধ করে মানাতে হত। এর পরেও যদি তাদের কেউ কখনো ফাসাদ সৃষ্টি করতে

চায়, তা হলে তার ওপর কর ও জিযিয়ার ভারী বোঝা চাপিয়ে দিতে হবে এবং তার সমর শক্তি এরূপ দুর্বল করে দিতে হবে যাতে আর কখনও বিদ্রোহ সম্পর্কে ভাবতেও না পারে।

খলীফাকে যেহেতু বিভিন্ন মন মেজাজ ও চরিত্রের লোকের জিম্মাদার হতে হয়, তাই তাঁকে অবশ্যই সচেতন ও সতর্ক দৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে। তাঁর গোয়েন্দা বিভাগ যেসব তথ্য সংগ্রহ করবে, তার আলোকে তাকে অত্যন্ত দূরদর্শীতার সাথে কাজ চালাতে হবে। যদি জানতে পায় যে, একদল সৈন্য বিদ্রোহ করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছে অমনি তার বিরুদ্ধে আরেক দল এমন সৈন্য নিয়োগ করতে হবে যারা কোন মতেই তাদের সাথে এক হতে পারবে না। যদি কাউকে তিনি খেলাফতের অভিলাষী বলে জানতে পান তো সংগে সংগে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে দুর্বল করে দিবেন।

খলীফার জন্য জরুরী হল জনগণকে তার অনুগামী ও মংগলকামী বানিয়ে নেয়া। এ ক্ষেত্রে শুধু তাঁকে মেনে নিচ্ছে এতটুকুতেই তৃপ্ত হলে চলবে না; বরং মেনে নেয়ার সুস্পষ্ট নজীরও পেশ করতে হবে। তাহলে তার প্রভাব জনগণের ওপর পড়বে। যেমন খলীফার জন্যে প্রকাশ্য মজলিসে দোয়া করা, বড় বড় সভা-সমিতিতে তাকে সম্মান দেখানো ও খলীফার নির্দেশ নিজেদের অন্তরে এরূপ অংকিত করে নেয়া যেভাবে একালের মুদ্রায় খলীফার নাম অংকিত হয়ে থাকে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

সার্বজনীন মানবিক মৌলনীতি

আবাদ পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র ও সভ্য জাতিপুঞ্জের প্রতিটি জাতিই বাবা আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোন না কোনভাবে মানবিক প্রয়োজনের মৌলনীতিগুলোর মতৈক্য বজায় রেখে চলছে। যদি কেউ তার বিরোধিতা করতে চায় তো সর্বস্তরের লোক তাকে খারাপ জানে। সে নীতিগুলো এরূপ সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে, প্রকাশ্য দিবালোকের মতই তা সুস্পষ্ট! হয়ত সেগুলো শাখা-প্রশাখায় কিছুটা মতানৈক্য দেখা যায় সেটাকে আমার বক্তব্যের পরিপন্থী মনে করা যায় না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মৃতের সৎকার নীতিতে সার্বজনীন মতৈক্য

রয়েছে। তবে তার পদ্ধতিতে মতানৈক্য দেখা দেয়। কোন সম্প্রদায় তাকে মাটির নিচে দাফন করে, কোন সম্প্রদায় তাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করাকেই উত্তম মনে করে। তেমনি বিয়ের ব্যাপারটি; সবাইকে জানানোর নীতিতে সবাই একমত। উদ্দেশ্য হল, বিয়ে ও ব্যভিচারের পার্থক্য সৃষ্টি করা। তথাপি তার পদ্ধতিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। একদল সাক্ষী, ইজাব-কবুল ও ওলিমা করে তা সম্পন্ন করে, অপর দল আবার গান-বাজনা ও জাঁকজমকের পোশাক দিয়ে তা সম্পন্ন করে। ব্যভিচারী ও চোরকে শাস্তি দেয়ার নীতিতে সবাই একমত। তবে তার পদ্ধতিতে পার্থক্য দেখা যায়। এক সম্প্রদায় প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু দণ্ড ও হাত কাটার বিধান দেয়, অন্য সম্প্রদায় কঠোর মারপিট, সশ্রম কারাদণ্ড, মোটা অংকের জরিমানা ইত্যাকার শাস্তির ব্যবস্থা করে।

আলোচ্য সর্বসম্মত মূলনীতির ব্যাপারে দু'শ্রেণীর লোকের মতানৈক্য ধর্তব্য নয়। কারণ , তারা সভ্য সমাজের নিম্নস্তরে থেকে জীব-জানোয়ারের আচার- আচরণ অনুসরণ করে! যেমন, মানব সমাজের বড় একটি অংশ মূর্খ ও নির্বোধ হওয়ায় তারা কোন নিয়ম-শৃংখলার বাঁধনে থাকতে নারাজ! তাদের এ বাঁধনমুক্ত উচ্ছৃংখল জীবনের কামনাই প্রমাণ করে যে, তারা আহাম্মক। দ্বিতীয় দল হল, পাপাচারী। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ করে দেয় পাপাসক্তি! তাই তাদের অন্তর থেকে যদি পাপাসক্তি বিলুপ্ত করা যায়, তাহলে তারাও সুশৃংখল জীবনের পক্ষপাতী হয়ে যায়। তারা তাদের অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির তাড়নায় অস্থির হয়ে অপরের মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করে থাকে বটে, কিন্তু কেউ যদি তার মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করে, তাহলে ক্রোধে ফেটে পড়ে। এতে বুঝা যায়, উক্ত খারাপ কাজটি যে খারাপ সে ব্যাপারে তার অন্যান্যের মতই উপলব্ধি রয়েছে। সে এটাও বুঝে যে, এ কাজ সামাজিক জীবনকে কলুষিত করে। কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়না তাকে ক্ষণিকের জন্য অন্ধ করে ফেলে। চুরি, আত্মসাৎ ইত্যাদির অবস্থাও তাই।

এ ক্ষেত্রে কেউ যেন ভেবে না বসে যে, এ মৌলনীতির মতৈক্যটা ঠিক পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের লোকের রুটি তৈরী করে খাওয়ার মতই একটি ব্যাপার। এরূপ ধারণা হবে এক মস্ত বড় ধোঁকা। কারণ, একটি হল প্রকৃতিগত ঐক্য, অপরটি হল বিবেকগত ঐক্য। এ দুটির ভেতরে

আকাশ-পাতাল তফাত। মানবিক বিবেক, ভৌগোলিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক সব ব্যবধান ডিংগিয়ে এ সিদ্ধান্তে পৌছাবে যে, আলোচ্য মৌলনীতিগুলো স্বভাবতঃই এক হবে। সে মানবিক সহজাত স্বভাব মানুষ হিসেবে মানুষের ভেতরে তা অহরহ ঘটার কারণে এবং মানবিক চরিত্র ও সুস্থ বুদ্ধির প্রভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

যদি কোন লোক লোকালয় থেকে দূরে কোন জংগলেও লালিত-পালিত হয়, সে যদি লোকালয়ের লোকের অনুসৃত রীতি-নীতি সম্পর্কে কিছুই জানতে না পায়, তথাপি তার ক্ষুধা লাগবে, পিপাসা সৃষ্টি হবে, কামনা-বাসনাও দেখা দেবে। নিঃসন্দেহে তার ভেতরে নারীর প্রতি আকর্ষণ জন্ম নেবে। তারপর সেই সন্তান নিয়ে তারা পারিবারিক জীবন যাপন করবে। ফলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ প্রকাশ পাবে। এটাই মানব সমাজ ও রাষ্ট্রের পয়লা স্তর। তারপর যখন তাদের সংখ্যা বাড়বে, তখন অবশ্যই তাদের ভেতর মেধাবী ও চরিত্রবান লোক দেখা দেবে। তখন তাদের ভেতর এমন সব কাজ-কারবার হবে, যার ফলে ধীরে ধীরে সমাজ ও রাষ্ট্রের সব স্তরের রীতি-নীতিই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

মানব সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি

জেনে রেখো, মৌলনীতির সাথে সামাজিক রীতি-নীতির সম্পর্কটা হচ্ছে অন্তর ও দেহের সম্পর্ক। সব ধর্মেরই পয়লা উদ্দেশ্য এটাই। আল্লাহ্র শরীয়াতের সকল আলোচ্য বিষয় ও নির্দেশাবলী সেটাকেই কেন্দ্র করে এসেছে।

কয়েকটি কারণে এই রীতি-নীতিগুলো জন্ম নেয়। এক, মনীষীবৃন্দের জ্ঞান-গবেষণা ও ফেরেশতা স্বভাবের আলোর সাহায্যলব্ধ আল্লাহদত্ত ইলহাম।

দুই, কোন বড় ধরনের রাজা-বাদশাহ্ কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি। তিন, মানব সমাজের পছন্দনীয় মনগড়া পদ্ধতি যা কতগুলো ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার কারণে কঠোরভাবে অনুসৃত হয়। তারা তা অনুসরণে কল্যাণ ও বর্জনের

অকল্যাণ দেখতে পায়। ফলে তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরাও তা বর্জন করলে নিন্দা করে থাকে।

আমি যা কিছু বললাম তার সত্যতা যে কোন জ্ঞানীলোক সহজেই মেনে নেবে যখন সে দেখতে পাবে, কোন রাষ্ট্রে হয়ত একটি রুসূম দেখতে পাবে কিন্তু অন্য রাষ্ট্রে আবার তা দেখতে পাবে না। রুসূম-রেওয়াজ বা রীতি-নীতি মূলত ভাল। কারণ, নীতি-আদর্শের সংরক্ষণ এর মাধ্যমেই হয়ে থাকে। ফলে তার মাধ্যমেই ব্যক্তি জীবন ধ্যান-ধারণা ও আমলের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করে। সামাজিক রীতি-নীতির শৃংখলমুক্ত জীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চতুষ্পদ জীবের পর্যায়ে নেমে যায়। অনেকেই বিয়ে-শাদী ও অন্যান্য ব্যাপারাদি সামাজিক রীতি অনুসারে যথাযথ ভাবে সম্পাদন করে থাকে। কিন্তু যখন তাদের কাজে এ সব রীতি-নীতির বাঁধন মেনে চলার কারণ জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তারা স্বজাতির অনুকরণ করার কথা বলা ছাড়া অন্য কোন জবাব দিতে পারে না, বড় জোর সে রুসূমের একটা মোটামুটি ধারণা তাদের থাকে যা তারা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলতে পারে না। হয়ত তারা সেটার উপকারিতা ও গুণাবলী বলে দেবে। এ ধরনের লোক যদি উক্ত রীতি-নীতি না মানত, তাহলে তাকে পশুর পর্যায়ে মনে করা হত।

এ সব রীতি-নীতির ভেতরে কখনও খারাপ রীতিও ঢুকে পড়ে। ফলে লোকদের পক্ষে ভাল-মন্দ নির্ধারণ করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। খারাপ রীতির কারণ এটাই যে, কখনও কোন খারাপ লোক নেতা হয়ে যায়, যার দৃষ্টি থাকে সীমিত ও সংকীর্ণ। তার সামনে মানব সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের দিকটি থাকে অনুপস্থিত। ফলে সে হিংস্র পশুর আচার-আচরণ চালায়। যেমন, ডাকাতি, আত্মসাৎ ইত্যাদি। কখনও তার থেকে কামনা চরিতার্থতার কাজ প্রকাশ পায়। যেমন, ঘুষ খাওয়া, মাপে কম দেয়া ইত্যাদি। কখনও পোশাক-আশাক ও আনুষ্ঠানিক খাওয়া, মাপে কম দেয়া ইত্যাদি। কখনও পোশাক-আশাক ও আনুষ্ঠানিক খাওয়া-দাওয়ায় বাহুল্য খরচ চালু করে, যা সংগ্রহ করতে যথেষ্ট আয়োজন করতে হয়। কিংবা তার আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-ব্যসনের ঝোঁক বেড়ে যায়। ফলে ধনভাণ্ডার ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শূন্য ও অচল হয়ে যায়। যেমন, নাচ-গান, জুয়া-পাশা,

শিকার ও প্রমোদ বিহার, পশু পাখীর রেস ইত্যাদি। তখন শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করার জন্য বহিরাগতদের ওপর মোটা কর আরোপ করা হয় ও জনগণ থেকে এত বেশী রাজস্ব আদায় করা হয় যে, তারা নিঃস্ব হয়ে যায়। কিংবা তার মর্মজ্বালা ও হিংসা বেড়ে যায়, ফলে সে লোকদের সাথে এমন দুর্ব্যবহার করে চলে যা তার নিজের বেলায় সে পছন্দ করে না। অথচ তার দাপটের কারণে কেউ তাকে কিছু বলতে পারে না।

এ ধরনের নেতৃত্বের অনুসারী হয় পাপাচারী দুষ্ট চরিত্রের লোকেরা। তারা তার সহায়ক হয়ে উক্ত অনাচারগুলো সমাজে ছড়াতে থাকে। তখন সমাজে এমন জনগোষ্ঠি সৃষ্টি হয়, যাদের ভেতর না ভাল করার উৎসাহ থাকে, আর না মন্দ কাজ বর্জন করার ইচ্ছা হয়। পরবর্তীকালে নেতাদের খারাপ কাজগুলো তাদের ধাতস্থ হয় এবং তারাও তা করতে উদ্যোগী হয়। এক সময় দেখা যায়, ভাল কাজের সে সমাজে কোন পাত্তাই মেলে না। এরূপ সমাজে অবশেষে ভাল চরিত্রের অবশিষ্ট লোকগুলো অগত্যা চুপ মেরে যায়। তাদের এ চুপসে যাওয়ার সুযোগেই মন্দ রীতি-নীতিগুলো সমাজে পাকাপোক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

তাই যথার্থ ভাল লোকদের ওপর অপরিহার্য হল সত্যের প্রচার ও প্রসার এবং অসত্যের প্রতিরোধ ও উৎখাতের জন্য আপ্রাণ অব্যাহত প্রয়াস চালানো।

অনেক ক্ষেত্রে এরূপ কাজ ঝগড়া-বিবাদ ও দাংগা লড়াই-ছাড়া সম্ভব হয় না। এ কারণেই ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াইকে সকল পুণ্য কাজের সেরা পুণ্য কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে। এভাবে যখন নেক কাজের রীতি-নীতিগুলো চালু হয়ে যায়, তখন তা স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসে ও যুগ যুগ ধরে লোক জীবনের বাজী ধরে সেটাকে বাঁচিয়ে রাখে। সেটা এমন ভাবে প্রত্যেকের মন-মগজে ঠাঁই নেয় যে, তা কোথাও থাক বা না থাক, যে কোন অবস্থায় সেটাকে সে অপরিহার্য রীতি হিসেবে মেনে চলে। শুধু মাত্র কলুষিত আত্মার লোকেরা, নির্বোধরা কিংবা কামনা-বাসনার দাস ও স্বার্থান্ধরা ছাড়া তার বাইরে কেউ পা রাখতে রাজী হয় না। তবে সে সব লোকজনও যখন তার বাইরে চলতে চায়, তখন অন্তত মনে তার পাপবোধ থেকেই যায়। তখন সে তার সামগ্রিক কল্যাণের পক্ষে অন্তরায় হয়ে

দাঁড়ায়। তারপর সে যখন বেপরোয়াভাবে তা করে চলে, তখন বুঝতে হবে তার আত্মা রুগ্ন ও অসুস্থ হয়ে গেছে। তখন সে তার সমাজ ও রীতি-নীতির জন্য কলংক হয়ে দাঁড়ায়।

যখন কোন সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণময় রীতি-নীতি পুরোপুরি চালু হয়ে যায়, তখন উচ্চ পরিষদের ফেরেশতাগণ এর সহায়কদের জন্যে দোয়া ও বিরোধীদের জন্যে বদদোয়া করতে থাকেন। ফলে সুমহান পবিত্র সত্তা সহায়কদের প্রতি সন্তুষ্ট ও বিরোধীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। যখন এভাবে কোন কল্যাণময় সমাজ ও রাষ্ট্র কয়েম হয়, তখনই সেই মহান উদ্দেশ্য সাধিত হয়, যে উদ্দেশে আল্লাহ পাক মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মানবিক বৈশিষ্ট্য, বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য

জেনে রেখো, মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য এমন যে, তা মানুষ হিসেবে সে প্রকৃতিগত ভাবেই পেয়ে থাকে। তেমনি কিছু বৈশিষ্ট্য তার বৈষয়িক। যা তার পারিপার্শ্বিকতা ও দূরবর্তী কোন প্রভাব থেকে অর্জিত হয়। মানবিক সচ্চরিত্রতা ও বিবেক যে ব্যাপারটিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয় ও লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নেয় তা হলো মানবিক পরিপূর্ণতা বা পূর্ণাংগ মানবতা।

কারণ, কখনও কারও এমন কিছু নিয়ে প্রশংসা করা হয়, যা তার প্রকৃতিগত অবয়বের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন, তার দৈহিক উচ্চতা কিংবা দেহের বিশালত্বের প্রশংসা। সেটাকে যদি কৃতিত্ব বলা হয়, তাহলে সে কৃতিত্বের পূর্ণতা দেখতে পাবে সুউচ্চ ও সুবিশাল পাহাড়-পর্বতে। কখনও কাউকে প্রশংসা করা হয় এমন কিছুর জন্যে যা গাছ-পালায়ও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, কারো দ্রুত বর্ধন ডগমগে চেহারা, সুন্দর গড়ন ইত্যাদির জন্যে। সেটাই যদি কৃতিত্ব হয়,তাহলে লালা কিংবা গোলাপফুল সে কৃতিত্বের সর্বাধিক দাবীদার। কখনও কাউকে এমন কিছুর জন্যে প্রশংসা করা হয়, যা জীব-জন্তুর ভেতরেও পাওয়া যায়। যেমন, দৈহিক শক্তি, সুউচ্চ কণ্ঠ, যথেষ্ট খাওয়া, শক্ত হাতে পাঞ্জা লড়া, জেদী ও

প্রতিদ্বন্দ্বীতাপরায়ণ হওয়া ইত্যাদি। যদি সেটাকে কৃতিত্ব বলা হয় তা হলে গাধাকে সেক্ষেত্রে সর্বাধিক কৃতিত্বের দাবীদার বলতে হয়। হ্যাঁ, কখনও কাউকে এমন কিছুর জন্যে প্রশংসা করা হয়, যা শুধু মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়। যেমন, মার্জিত চরিত্র, উত্তম কর্মধারা, উন্নতমানের গুণাবলী, উচ্চাংগের শিল্প-নৈপুণ্য ও সুউচ্চ মর্যাদা ইত্যাদি।

মূলত এগুলোকেই বলা হয় মানবিক যোগ্যতা ও কৃতিত্ব। প্রত্যেক জাতির জ্ঞানী মনীষীগণ এগুলোকেই লক্ষ্য বানিয়ে নেন এবং এসব ছাড়া অন্য যেসব গুণের কথা বলা হয়েছে, তারা সেগুলোকে আদৌ কোন প্রশংসনীয় গুণ বলে মনে করেন না। অবশ্য এখনও বিষয়টি সুস্পষ্ট ও পরিশীলিত হয়নি। কারণ, সে গুণাবলীর মূল বস্তু প্রতিটি জীবের ভেতরই পাওয়া যায়। যেমন, বীরত্বের মূলে রয়েছে ক্রোধ সহকারে প্রতিশোধ নেয়া, প্রচণ্ড ভাবে অগ্রসর হওয়া ও বিপজ্জনক কাজে পা রাখা। অথচ এগুলো পুরুষ জীবজন্তুর ভেতরে যথেষ্ট দেখা যায়। কিন্তু সেটাকে তখনই বীরত্ব বলা হয়, যখন কোন মানুষ অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে কল্যাণকর পথে সেগুলোর উপস্থাপনা, বাস্তবায়ন ঘটায়। তেমনি কলাকৌশল ও কারিগরী কাজের মূল বস্তু জীব জন্তুর ভেতরেও দেখা যায়।

বাউই পাখী তার নিজের বাসা তৈরী করে। কোন কোন জীবতো স্বভাবগত ভাবে এমন শিল্পকর্ম দেখায় যা মানুষকে অনেক কষ্ট করেও সেরূপ করতে ব্যর্থ হতে হয়।

এ থেকে বুঝা গেল যে, সেগুলোও মানুষের মূল কৃতিত্ব বা মৌলিক গুণ নয়; বরং সেগুলোও প্রকৃতিগত কৃতিত্বের অন্তর্ভুক্ত! মানুষের মূল কৃতিত্ব বা গুণ হল তার ভেতরকার পশু প্রকৃতিতে মানব প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে রাখা, প্রবৃত্তির তাড়নাকে বিবেক-বুদ্ধির বশীভূত রাখা। তারই ফলে মানুষ জীব জগতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে থাকে।

জেনে রেখো, মানবিক মূল গুণের সাথে যেসব ব্যাপার সম্পৃক্ত তা দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। একটি হচ্ছে মানবের জৈবিক প্রয়োজনের কাজগুলো যার দিকে জন্মগত ভাবেই মানুষ আকৃষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু এ শ্রেণীর বিষয় দ্বারা আপন উদ্দেশ্য হাসিল সম্ভব হয় না; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসবের চাকচিক্যের মোহে ডুবে আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়। এটা যেন আংশিক

লাভের আশায় সামগ্রিক লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়া। এসব ক্ষুদ্র কৃতিত্ব মূল কৃতিত্বের পরিপন্থী হয়ে থাকে। যেমন, কোন লোক নিজের উত্তেজনা সৃষ্টি করে ও কুস্তী লড়ে লড়ে বীরত্ব অর্জন করতে চায়, কিংবা আরবী কবিতা ও ভাষণ মুখস্ত করে বিশুদ্ধ আরবী ভাষী হতে চায়।

মানব চরিত্রের প্রকাশ ঘটে তার স্বজাতির সাথে ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে। তেমনি মানুষের কর্ম কৌশল উদ্ভাবিত হয় তার প্রয়োজনাদি মেটাবার গরজে। তেমনি শিল্প কার্যের প্রয়োজনে যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়। তবে এসব কিছুই জীবন সাংগ হবার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। তাই কোন ব্যক্তি যদি এ অসম্পূর্ণ গুণ নিয়ে এমনকি তার সাথে সম্পৃক্ত অস্থায়ী ব্যাপারগুলোর প্রতি অসন্তোষ নিয়েও মারা যায়, তথাপি সে মানবিক মূল গুণ থেকে বঞ্চিত থেকেই চলে যায়।

তারপর যদি তার অসম্পূর্ণ গুণ ও কার্যাবলীর পেছনে প্রবৃত্তির তাড়না সৃষ্ট সংকীর্ণ স্বার্থান্ধতা সক্রিয় থেকে থাকে, তাহলে তো লাভের বদলে শুধুই ক্ষতি হল।

দ্বিতীয় শ্রেণী হল, সে ব্যাপারগুলো যার প্রভাবে তার ভেতরকার পশু স্বভাব ফেরেশ্‌তা স্বভাবের অনুগত হয়ে যায়, সেটার নির্দেশেই চলে আর তারই রঙে রঞ্জিত হয়। তার ফেরেশ্‌তা স্বভাবটি এরূপ শক্তিশালী হতে হবে যা বিন্দুমাত্র পশু স্বভাবের প্রভাব মেনে নেবেনা। কোনমতে সেটার হিংসার ছাপ তার ওপর পড়বে না। মোমের ওপর আংটির ছাপ যেভাবে পড়ে সে ভাবে কোন মতেই পশু স্বভাবের ছাপ ফেরেশতা স্বভাবের ওপর যেন না পড়ে। তার উপায় হল এই, যখনই আত্মিক শক্তিটির কোন কিছুর প্রয়োজন দেখা দেয় আর তা সে তার দৈহিক শক্তির নিকট কামনা করে, তখন জৈবিক শক্তির কাজ হবে সে নির্দেশ পালন করা এবং কোন মতে তা অমান্য না করা। এভাবে আত্মিক শক্তির প্রতিটি নির্দেশ যদি জৈবিক শক্তি পালন করতে থাকে, তাহলে সে স্বভাবতই সেগুলোয় অভ্যস্ত হয়ে যাবে। ফলে সে নিজেই সেগুলোর আকাঙ্ক্ষা হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে কাজগুলো ফেরেশতা স্বভাব কামনা করে তার পশু স্বভাব তা বাধ্য হয়ে মেনে নেয়, তখন স্বভাবতই প্রথমটি সন্তুষ্ট হয় এবং দ্বিতীয়টি অসন্তুষ্ট হয়। এ ব্যাপারটি যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব মেনে চলে বহিঃশক্তির গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য করা।

এটাও ফেরেশতা স্বভাব বা বিবেকেরই বৈশিষ্ট্য, পশু স্বভাব বা প্রবৃত্তি এ বৈশিষ্ট্য থেকে অনেক দূরে অবস্থিত।

যখন এ অবস্থা দাঁড়াবে যে, পশু প্রবৃত্তি তার বাসনা-কামনা, স্বাদ-আহ্‌লাদ ও আসক্তি-আকর্ষণ বর্জন করবে, তখন তার নাম দেয়া হবে ইবাদাত ও রিয়াযাত বা উপাসনা ও সাধনা। এটাই মানুষের সেই মূল চরিত্র অর্জনের মাধ্যম হয় যা তার ভেতরে অনুপস্থিত। এ মাকাম বা পর্যায়ের তাৎপর্য এই দাঁড়াল, মানবের সত্যিকারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইবাদত ছাড়া অর্জিত হয় না।

একারণেই ব্যক্তি মানবের সামগ্রিক কল্যাণের ব্যাপারে মানবিক সত্তার মৌল আলোক বর্তিকা ডাক দিয়ে বলে ও কঠোরভাবে নির্দেশ দেয় যে, ব্যক্তি মানুষের দ্বিতীয় পর্যায়ের পূর্ণতার জন্যে প্রয়োজন মোতাবেক নির্ধারিত গুণের পরিমার্জন ও উন্নয়ন চাই। সে জন্যে স্বীয় প্রকৃতিকে পরিশোধিত ও সুসজ্জিত করে নিজেকে উচ্চ পরিষদের সদস্যদের পর্যায়ে উন্নীত করাকে জীবনের মূল লক্ষ্য ও সাধনা বলে স্থির করতে হবে। এমন কি নিজের ভেতরে এরূপ যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে যার ফলে জৈবিক ও আত্মিক উভয় শক্তির ভারসাম্যের প্রভাবে সে বিমন্ডিত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে জৈবিক শক্তি আত্মিক শক্তির নির্দেশে পরিচালিত হবে এবং সে ফেরেশতা স্বভাবের মূর্তরূপ ধরে প্রতিভাত হবে। কোন মানুষ যখন সুস্থ মানসিকতার অধিকারী হয়, আর তার অস্তিত্ব যখন মানবিক বিধি-বিধান পুরোপুরি ধারণের যোগ্য হয়ে যায়, তখন সে উক্ত দুর্লভ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের জন্য উদগ্রীব হয়। লোহাকে যেভাবে চুম্বক টেনে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি তখন সেই ব্যক্তি সত্তাকে উক্ত গুণটি টেনে নেয়। এটা একটা প্রকৃতিগত অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। আল্লাহ পাক এ স্বভাব দিয়েই মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

তাই দেখা যায়, যখন কোন জাতি উক্তরূপ ভারসাম্যপূর্ণ স্বভাব আয়ত্ত করে ফেলে, তখন তাদের ভেতর এরূপ মনীষী অবশ্যই দেখা দেয় যিনি তাদের সেই প্রশংসনীয় চরিত্রকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিতে যত্নবান হন। মূলত সেটাকেই তখন তারা সর্বোচ্চ সৌভাগ্য বলে ভেবে থাকে। রাষ্ট্রনায়ক ও প্রশাসনের দৃষ্টি সে দিকেই থাকে। জনগণও তাদেরই প্রভাবে অনুরূপ গড়ে উঠে। সমগ্র দুনিয়ায় তারা মানবতার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে বিরাজ করে।

সে দেশে সরকার ও জনতা তখন ফেরেশতাদের দলে শামিল হয়ে যায়। সেদেশের মানুষ এ পুণ্যময় অনুশাসনের বরকতে ধন্য হয়ে চলে। দেশে দেশে তাদের স্বাগত সম্ভাষণ শুরু হয়ে যায়। একমাত্র মানবতার সহজাত মানসিক বিধি-বিধান ছাড়া আরব-আজম, সাদা-কালো, ধার্মিক-অধার্মিক, কাছের-দূরের, উঁচু-নীচু সর্বস্তরের সকল দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার আর কোন বিধি-বিধান রয়েছে কি? নেই, তা থাকতেও পারে না। এক মাত্র মানবিক মৌলিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের ওপরেই দুনিয়ার সকল মানুষকে একমত করা যেতো, কারণ, তুমি দেখতে পেলে যে প্রতটি মানুষের ভেতর ফেরেশ্তা স্বভাবের বিবেক বিদ্যমান। তাদের মর্যাদা যে কত বড় আর তাদের ভেতরকার উত্তম চরিত্রের লোকদের আসন যে কত উর্ধ্বে তাও তুমি দেখতে পেয়েছ। আল্লাহ্ই সর্বশক্তিমান।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মানবিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য

জেনে রেখো, বীরত্ব ও অন্যান্য নৈতিক কল্যাণ সব মানুষের এক হয় না। তাতে মানুষে মানুষে বিভিন্নতা দেখা দেয়! কোন কোন মানুষের ভেতরে তো বীরত্ব গুণ একেবারেই অনুপস্থিত। হয়ত এমন কোন প্রতিকূল পরিবেশ তার অভ্যন্তরে বিরাজ করছে যার ফলে তার কাছ থকে বীরত্ব আশাই করা যায় না। যেমন, নপুংসক কিংবা অত্যন্ত দুর্বল চিত্তের লোক বীরত্ব গুণ থেকে বঞ্চিত। কিছু লোক এমন আছে যে, সাধারণত তারা বীর নয়, কিন্তু সাহস সৃষ্টির কাজ, কথা ও সাহসী নেতৃত্বের আনুগত্য তাকে বীর বানায়। বীর নেতা ও সহকর্মীদের দৃষ্টান্ত, কথা ও কাজ তাকে বীরত্বপূর্ণ কাজে পা বাড়াতে উৎসাহিত করে।

মূলতঃ বেশ কিছু লোক এমন রয়েছে যাদের ভেতরে সুপ্ত যোগ্যতা বিদ্যমান। তবে শুরুতে তা দেখাতে গিয়ে স্বভাবতই ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে। তখন যদি তাকে থামিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তার উৎসাহ দমে যায় ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও চুপ হয়ে যায়। তখন যদি কেউ তার জন্মগত সুপ্ত প্রতিভার অনুরূপ কোন নির্দেশ দেয় তা তখন গন্ধককে আগুন লাগার মতই জ্বলে ওঠে।

কিছু লোক এমন রয়েছে যার ভেতরে বিশেষ কোন যোগ্যতা পূর্ণ মাত্রায়ই দেয়া হয়েছে। সে কখনও চুপ থাকতে পারবে না, তার জাগ্রত গুণ তাকে চাংগা করে সামনে এগিয়ে নেবে। সে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই ছুটে চলবে। কোন কাপুরুষ তাকে হাজার ডেকেও ফেরাতে পারবেনা। এমন কি সমাজের কোন রীতি-নীতির প্রতিকূলতা কিংবা অনুকূলতার তোয়াক্কা না করেই সে তার বিশেষ গুণের সহজ বাস্তবায়ন ঘটিয়ে চলে। এ ধরনের ব্যক্তিই উক্ত গুণের লোকদের নেতৃত্ব দেয়। তার কোন নেতা বা প্রশিক্ষকের প্রয়োজন দেখা দেয় না। যারা এ যোগ্যতায় তার চেয়ে পেছনে, তাদের জন্য জরুরী হল তার পদ্ধতি, রীতি-নীতি, কার্যধারা অনুসরণ করা ও তার ঘটনাবলী স্মরণ করা! তাহলেই তার গুণ, কৃতিত্ব ও যোগ্যতার ততটুকু সে অর্জন করতেপারবে যতটুকু তার জন্যে নির্ধারিত রয়েছে।

এভাবে মানুষের যোগ্যতার তারতম্যের প্রকৃতি ও পরিবেশগত অবস্থাও সক্রিয় থাকে, যেমন, খিযির (আঃ) যে ছেলেটিকে হত্যা করেছিলেন সে প্রকৃতিগতভাবেই কাফির ছিল।

যেমন আল্লাহ বলেন, 'সে বধির, বোবা ও অন্ধ তাই পথে আসবে না।'

কিছু লোক এমন রয়েছে, যার গুণ ও যোগ্যতা প্রকাশ না পেলেও সংস্কারের মাধ্যমে তা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। তবে সে জন্যে তার কঠোর সাধনা প্রয়োজন। তেমনি প্রয়োজন ক্রমাগত আমল করা। স্থায়ী আমলের প্রভাবে প্রবৃত্তি প্রভাবিত হয়। এ ধরনের লোকদের প্রয়োজন আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রেরণাদায়ক দাওয়াত ও সংশোধন পদ্ধতি। এ ধরনের লোকই সর্বাধিক। আম্বিয়ায়ে কেরামের মিশনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল এদের দিকেই।

একদল লোক এমন রয়েছে, যাদের ভেতর চারিত্রিক গুণাবলীর মৌল ভিত্তি প্রদত্ত হয়েছে। তাই তার কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতিও দেখা দেয়। কারণ, মূল গুণকে শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে দিয়ে সকল কাজকর্ম সঠিকভাবে করার জন্য তার পথপ্রদর্শক 'গুরু' প্রয়োজন। এদের দিকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ এরশাদ করেন, "অচিরেই তাদের প্রদীপ জ্বলে উঠবে যদিও তাতে এখনও আগুন লাগানো হয়নি।" এদের বলা হয় সাব্বাক!

মানব জাতির একটি স্তর হল আম্বিয়ায়ে কেরামের। যাদের ভেতর

মানবিক গুণাবলীর পূর্ণতা ঘটেছে। তাদের এ পূর্ণতা যথাযথভাবে অনুসরণ করা, অনর্জিত গুণ অর্জন করা, অর্জিত গুণ বহাল রাখা ও অপূর্ণকে পূর্ণতার তালিম দেয়ার ব্যাপারে তাদের জন্য কোন পথ প্রদর্শক দরকার হয়না, এমন কি তাদের কারো কিছু বলতেও হয় না। তারা স্বভাব সুলভ ভাবে যা কিছু করেন তা অন্যদের জন্য অনুসরণযোগ্য বিধান ও পদ্ধতি হয়ে দাঁড়ায়। অন্য সব মানুষ তা স্মৃতিস্থ করে নিজেদের কর্মধারায় পরিণত করে। যখন কোন কর্মকার, ব্যবসায়ী ও তাদের মত অন্যান্য পেশাদার নিজেদের পেশা চালাতে গিয়ে পূর্বপুরুষ থেকে তা শিখে নিতে হয়, তখন সেই উচ্চাংগের নৈতিক উৎকর্ষ অর্জন কি করে উৎকৃষ্ট ও পূর্ণাংগের চরিত্রের মহাপুরুষদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া সম্ভব হতে পারে? অথচ তা শুধু চেষ্টায়ও হয় না, আল্লাহ্ পাকের তওফীক অর্জন ছাড়া।

এ ব্যাপারটি এখন সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের মুখাপেক্ষী হওয়া একান্তই অপরিহার্য। তাঁদের অনুসরণ করা ও তাঁদের বাণী অনুশীলন করা অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বৈশিষ্ট্য অর্জনে মানবের বিভিন্ন পদ্ধতি

জেনে রেখো, বৈশিষ্ট্য দু'ভাবে অর্জিত হয়। একটি পদ্ধতি হল, জৈব শক্তিকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলা। সে জন্যে এমন সব উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা হয়, যাতে ইন্দ্রিয়গুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। সে সবের তৎপরতা শেষ হয়ে যায়, সেগুলোর জ্ঞান ও দহন উধাও হয়ে যায়। সার্বক্ষণিকভাবে দেহ ও মন সর্বশক্তিমানের দিকে নিবিষ্ট হয়। আত্মা সেই সব জ্ঞানই গ্রহণ করে যা স্থান ও কালের সাথে কোনই সম্পর্ক রাখে না। যে সব বস্তুতে কোনই স্বাদ নেই তার ভেতরে সেই সব বস্তুর আকাঙ্ক্ষা জাগে। এমনকি সে লোকজনের সাথে মেলামেশা ছেড়ে দেয়। তাদের আকর্ষণের বস্তুগুলো তার ভেতর বিকর্ষণ সৃষ্টি করে। তাদের ভয় পাবার জিনিসগুলোকে সে আদৌ ভয়ের চোখে দেখে না। জনমানব থেকে সে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে। বিজ্ঞ, আলোকপ্রাপ্ত ও সুফী দরবেশগণ এই স্তরে পৌছার জন্য সচেষ্ট

থাকেন। তবে তার ভেতরে খুব কম লোকই এ স্তরে পৌছতে পারেন। অন্যান্য সবাই সেটার আকাঙ্ক্ষা থাকে ও সর্বক্ষণ সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। তারপর কৃত্রিমভাবে সেরূপ হাবভাব প্রদর্শন করে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে জৈবিক শক্তিকে বিচ্ছিন্ন না করে তাকে পরিশুদ্ধ করা হয়। তার বক্রতা দূর করা হয়। কিন্তু তার মূল শক্তি বহাল থাকে। তখন অবস্থাটা এই দাঁড়ায় যে, কোন এক বোবা লোক যেভাবে বাকসম্পন্ন লোকদের বলার ভংগীকে নকল করে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে, ঠিক সেভাবেই জৈবিক শক্তিটি আত্মিক শক্তির কথা ও কাজকে অনুকরণ করে থাকে। যেমন, কোন চিত্রকর কোন ব্যক্তির মনের অবস্থা যেমন ভীতি, লজ্জা ইত্যাদি এমন ভাবে চিত্রিত করেন যা দেখামাত্র বুঝা যায়, এও ঠিক তেমনি ব্যাপার। যেমন, কোন সন্তানহারা জননী তার সন্তানের শোকে ইনিয়ে-বিনিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় যা কিছুই প্রকাশ করে তাতেই মানুষের ভেতর জননীর শোকটি রেখাপাত করে। এও ঠিক তেমনি ব্যাপার।

যখন আল্লাহ পাকের ব্যবস্থাপনা এ সিদ্ধান্ত নেয় যে, দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার সব চাইতে প্রিয় ও সবচাইতে সহজ পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হবে, গোটা মানব জাতির সংস্কার ও তাদের সকল ব্যাপার পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে এবং তাদের ইহ ও পরকালের সামগ্রিক কল্যাণ প্রদান করা হবে, তাহলে পয়লা তিনি উপরোক্ত দ্বিতীয় পদ্ধতিটি কায়েমের ব্যবস্থা নেন। তখন সেদিকে মানুষকে ডাকার ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য দুনিয়ায় নবী-রাসূলদের পাঠান। তারপর পয়লা পদ্ধতিটির দিকে শুধুমাত্র প্রাসংগিক ইংগিত-ইশারা করে ছেড়ে দেন! পরিপূর্ণ দলীল-প্রমাণ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত।

খোলাসা কথা এই যে, পয়লা পদ্ধতিটি শুধু তাদের জন্যে যাদের ভেতরে "লাহুতী" আকর্ষণ সর্বাধিক! এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এ পদ্ধতির পথ দেখান তারাই যারা সংসার জীবন ত্যাগ করে এবং দুনিয়ায় তাদের দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব থাকে না! অবশ্য এ পদ্ধতির পরিপূর্ণতা কখনও দ্বিতীয় পদ্ধতির সামগ্রিক ব্যাপারটি সামনে না রেখে অর্জিত হয় না। তাছাড়া এ পদ্ধতিতে কোন না কোন মানবিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত হতে হয়। হয় তাব থেকে দুনিয়ার কোন সংস্কার

সাধিত হবেনা, হয়তো পরকালের জন্যে তার আত্মিক পরিশুদ্ধি ঘটবে না। যদি সবাই সে পথ ধরে তাহলে পৃথিবী বিরান হয়ে যাবে। যদি তা করার জন্যে লোকদের নির্দেশ দেয়া হয়,তাহলে অসাধ্য সাধনের নির্দেশ দেয়া হয়। কারণ, কল্যাণকর ব্যবস্থাপনা মানবের স্বভাবজাত ব্যাপার বই নয়। তাই সমঝদার ও সংস্কারবাদী লোক দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তারাই দ্বীন দুনিয়ার নেতৃত্ব লাভ করেন। তাদের পদ্ধতিই কবুল হয় আর তাদের পদ্ধতিই অনুসৃত হয়। তাদেরই পদ্ধতির মাধ্যমে পূর্বসুরী পুণ্যাত্মাবৃন্দ ডান হাতে আমলনামা প্রাপকগণের সাফল্য অর্জন হযেছে। এ শ্রেণীর লোকই দুনিয়ায় সর্বাধিক। এ পদ্ধতি মেধাবী, নির্বোধ, ব্যস্ত ও অবকাশ প্রাপ্ত সবারই অনুসরণযোগ্য। এতে কোন অসাধ্যতা ও কষ্ট নেই। আখেরাতের মুক্তির জন্যে নিজেকে যতখানি পরিশুদ্ধ ও সজ্জিত করা প্রয়োজন তা এতে রয়েছে। কারণ, এতে যে সব পুণ্য কাজ নির্ধারিত রয়েছে পারলৌকিক শান্তির জন্যে তা যথেষ্ট। এখন থাকে নিঃসংগ থাকার বিধান। তা করবে, গেলে পাওয়া যাবে, যদিও স্বভাবত সে সময়টি কারো জানা নেই। তাই কবি বলেন–

সে দিন তোমার আসছে ধেয়ে
যে দিনটিকে জানতে না
আসবে এমন বার্তা নিয়ে
প্রস্তুতি যার রাখতেনা॥

মোটকথা মানবিক কল্যাণ ও সৌভাগ্যের সব পদ্ধতি পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় সাধ্যাতীত ব্যাপার! তাই সে সব ব্যাপারে অজ্ঞতায় ক্ষতির কিছু নেই।

পরিচ্ছেদ ঃ বত্রিশ

বৈশিষ্ট্যের দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্জনের নীতিমালা

জেনে রেখো, দ্বিতীয় স্তরের কল্যাণ অর্জনের অসংখ্য পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করে আমাকে বুঝিয়েছেন যে, সেগুলো এমন চারটি স্বভাবে সীমিত যা জৈবিক শক্তি মেনে নেয়। যখন মানুষ তার জৈবিক শক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সেটাকে সে সঠিক অবস্থার

অনুকূল হতে বাধ্য করে নেয়, তখন সর্বাবস্থায় সে অবস্থা সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্যদের গুণাবলীর সাথে অনেকটা একাকার হয়ে যায়। সে গুণাবলীর কারণে মানুষ সর্বোচ্চ পরিষদের সাথে মেলামেশার ও তাদের দলভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

আল্লাহ্‌পাক আমাকে বুঝিয়েছেন, এ শিক্ষা ও প্রেরণা প্রদানের জন্যে আল্লাহ পাক আম্বিয়ায়ে কেরামকে প্রেরণ করেছেন। সমগ্র শরীঅতের বিধি-বিধান সেই পদ্ধতিরই বিশ্লেষণ মাত্র। সব কিছুর লক্ষ্য হচ্ছে দ্বিতীয় পদ্ধতি। তার ভেতরে একটি স্বভাব বা গুণ হল পবিত্রতা। তার তাৎপর্য এই যে, যখন মানুষ বিবেকবান হয় ও তার মন-মেজাজ সুস্থ্ থাকে, তখন তার অন্তর সব ধরনের নিম্নমানের কাজ যা তার কর্মের পথে অন্তরায় হয় তা থেকে মুক্ত হয়। তাই এরূপ অবস্থায় যখনই সে অপবিত্র কিছুর সংস্পর্শে আসে আর তাকে জৈবিক প্রয়োজনে কাজে লাগাতে হয়, যেমন পায়খানা-প্রস্রাব বা স্ত্রী মিলন ইত্যাদি, তখন তার মন অস্বস্তি বোধ করে থাকে। তার চেহারায় অন্তর্জ্বালা ও বেদনাক্লিষ্টতার ছাপ পড়ে যায়। সে নিজকে খুব হেয় অবস্থায় দেখতে পায়। তারপর যখন উভয় ধরনের অপবিত্রতা দূর হয় এবং নিজের অংগ-প্রত্যংগ ধৌত করে ও গোসল করে, আর ভাল কাপড়-চোপড় পরে, খোশবু লাগায়, তখন তার সেই ক্লিষ্টতা দূর হয়ে যায়। তখন তার অন্তর তৃপ্ত ও প্রশস্ত হয়ে যায়। এটা কোন লোক দেখানো বা রুস্‌ম-রেওয়াজ পালনের জন্যে নয়; বরং মানুষ হিসেবে তার মানবিক চেতনা থেকেই এটা করে থাকে।

এক্ষণে উপরোক্ত দু'অবস্থার প্রথমটিকে অপবিত্রতা ও দ্বিতীয়টিকে পবিত্র বলা হয়। যে লোক মেধাবী তার কাছে বিধি-বিধানের যথার্থতা সুস্পষ্ট। তার মেধা অবস্থানুপাতে বিধান সম্পর্কিত ব্যাপারটি সহজেই বুঝতে পায়। সে উক্ত উভয় অবস্থার পার্থক্য উপলব্ধি করে এবং একটি অবস্থাকে অপছন্দ ও অপর অবস্থাটিকে পছন্দ করবে। তবে নির্বোধ লোকও যদি জৈবিক শক্তি দুর্বল হয়, আর নিষ্ঠার সাথে পবিত্রতা অবলম্বন করে চলে এবং যদি দু'অবস্থা নিয়ে ভেবে দেখার অবকাশ পায় তা হলে সেও এ দুটোর তারতম্য বুঝতে পায়।

জৈবিক দেহের অপবিত্রতাকে ওযু ও গোছলের মাধ্যমে পবিত্র করে

মানুষ নিজকে একদিকে যেমন তৃপ্তির আনন্দে উদ্বেল হয়, অন্যদিকে তেমনি সর্বোচ্চ পরিষদের পরিমণ্ডলের সাথে নিজের সাযুজ্য খুঁজে পায়। এ কারণেই পবিত্রতা মানবিক কল্যাণের ক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জনের কার্যকলাপে মানুষকে যথেষ্ট শক্তি জোগায়।

পক্ষান্তরে অপবিত্রতা যখন একাধারে চলতে থাকে আর তা কোন মানুষকে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে রাখে, তখন তার ভেতরে শয়তানের কুমন্ত্রণা গ্রহণের, তাদের এমনকি সামনা-সামনি দেখার, ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের তিমিরে আচ্ছন্ন থাকার ও ভয়ংকর জীব-জানোয়ারের মূর্তি চোখের সামনে মূর্ত হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ যখন পবিত্রতা অবলম্বন করে এবং একাধারে তা নিষ্ঠা সহকারে চলতে থাকে, তখন তার ভেতর ফেরেশতার ইলহাম গ্রহণের, তাদের দেখার, ভাল ভাল স্বপ্ন দেখে আনন্দ লাভের, ভাল ভাল বস্তু, সুন্দর সুন্দর আকৃতিতে দেখার এবং অত্যন্ত পবিত্র ও মহান জিনিস দেখার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় স্বভাব বা গুণটি হল আল্লাহপাকের সামনে বিনীত থাকা। তার তাৎপর্য এই যে, যখন কাউকে আল্লাহপাকের বাণী ও গুণাবলী উল্লেখ করে কিছু বুঝানো হয়, তখন সে সতর্ক হয়ে যায় ও তার দেহ ও মন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তা গ্রহণ করে। কারণ, সে অস্থির হয়ে যায় আল্লাহপাককে পাবার জন্যে।

সাধারণ লোক মহা প্রতাপান্বিত বাদশার দরবারে হাজির হলে তার সে অবস্থা দেখা দেয় তার করুণা ও বখশিশ পাবার জন্যে সেরূপ বিনয় ও স্তুতির আশ্রয় নেয়। আল্লাহর দরবারেও মানুষের সে অবস্থাই সৃষ্টি হবে। কারণ, তাঁর অসীম প্রতাপ ও অশেষ মহত্ত্বের সামনে নিজেকে অসহায়ভাবে বিলীন করার মাধ্যমে সে সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্যদের সর্বাধিক সামঞ্জস্য সৃষ্টি কবতে পারে। তার এ অবস্থাটি তাকে মন মগজে আল্লাহর পরিচয় চিত্রিত করে কল্যাণের ক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জনের এবং এক অবর্ণনীয় উত্তম অবস্থায় তার দরবারে উপস্থিত হবার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

তৃতীয় স্বভাবটি হল, ঔদার্য্য। অর্থাৎ, পৌরুষ ও বদান্যতা। তার তাৎপর্য এই যে, জৈবিক বাসনা-কামনার কাছে নতি স্বীকার না করা, তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা এবং মন-মানসিকতায় তার ছাপ পড়তে না দেয়া।

মূলত মন যখন জীবিকার ধাঁধাঁয় নিমগ্ন হয়, নারী সম্ভোগের চিন্তায় বিভোর হয়, স্বাদ-আহ্লাদে অভ্যস্ত ও ভাল ভাল খাওয়ার আকাংক্ষী হয় তখন তা অর্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে উদ্দেশ্য সফল করতে ব্যস্ত থাকে। তেমনি যখন কোন ব্যাপারে জিদ্ সৃষ্টি হয়, কিংবা লালসা দেখা দেয়, তখন তাতে সাফল্য অর্জনের জন্য সর্বশক্তি নিয়ে আত্মনিয়োগ করে। এরূপ ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই সে অন্য কিছুর দিকে চোখ তুলে তাকাবার সুযোগ পায় না। তারপর যখন এ অবস্থা দূর হয়, তখন তার ভেতর যদি মনোবল বিদ্যমান থাকে, তাহলে তা থেকে এরূপ দূরে সরে আসে, যেন কোনদিনই সেসব কাজে লিপ্ত ছিল না। কিন্তু যদি মনোবল শূন্য হয়, তাহলে উক্ত অবস্থাগুলো তার মনে সেভাবে দানাবেঁধে অবস্থান করে যেভাবে মোমের উপর মহর অংকিত হয়ে থাকে। পৌরুষ দীপ্ত প্রশস্ত অন্তরের লোক যখন জৈবিক বাসনা-কামনা থেকে মুক্ত হয়ে ও নিজের আসল অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তখন দুনিয়ার কোন লোক তার ভেতর ফেরেশতা স্বভাবের পরিপন্থী কোন কাজই দেখতে পায় না। এ কারণেই পরিণামে সে প্রীতিময়তা ও সফলতার অধিকারী হবে।

পক্ষান্তরে, লোভ-লালসায় ডুবে থাকা দুর্বল চিত্তের লোকের অন্তরে সীল পড়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায়, কোন পৌরুষদীপ্ত দানশীল লোকের কোন মূল্যবান জিনিস চুরি হলেও সে তার পরোয়া করে না। কিন্তু সংকীর্ণমনা ব্যক্তি সেরূপ ক্ষেত্রে পাগলের মত হয়ে যায়। তার চোখে শুধু সে বস্তুটিই জুড়ে থাকে!

ঔদার্য্য ও সংকীর্ণতার এ বিপরীতমুখী অবস্থা দুটোর অনেক পরিভাষা রয়েছে। যদি তা সম্পদের বেলায় হয়, তাহলে বলা হয় বদান্যতা ও কৃপণতা তেমনি যদি যৌনতৃপ্তি ও উদরপূর্তির ব্যাপার হয়, তাহলে বলা হয় রক্ষণশীলতা ও কামনা শক্তি। যদি শ্রমলব্ধ ও আয়াস সাধ্য ব্যাপার হয়, তাহলে বলা হয় ধৈর্যশীল ও অধৈর্য। যদি দ্বীনি বিধি-বিধান সম্পর্কিত ব্যাপারে হয়,তাহলে বলা হয় পুণ্যবান ও পাপী।

মানুষের ভেতর যখন এ সাহস ও ঔদার্য্য দানা বাঁধে তখন তার মন জৈবিক বাসনা-কামনা থেকে মুক্ত হতে পারে ও তার ভেতরে উন্নত পর্যায়ের নিঃসংগতার আনন্দ লাভের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। সৎসাহস ও ঔদার্য্য

এমন এক মানসিক অবস্থা যা মানুষকে পূর্ণতা অর্জনের শিক্ষা ও কাজ অনুসরণের সকল অন্তরায় দূর করে।

চতুর্থ স্বভাব বা গুণ হল ন্যায়পরায়ণতা। এটা এমন এক আত্মিক যোগ্যতা, যার দৌলতে দেশ ও জাতির সমস্যাগুলোর সহজ সমাধান সম্ভব হয়। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজগুলো তার স্বভাবগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এর রহস্য এই যে, জৈবিক প্রভাবমুক্ত আত্মার সাথে ফেরেশতার সম্পর্ক কায়েম হয়। আর ফেরেশতা ও পুণ্যাত্মা লোকদের ইচ্ছানুযায়ী আল্লাহপাকের ইচ্ছা সক্রিয় হয় এবং পার্থিব ব্যবস্থাপনায় আল্লাহপাক ন্যায়ানুগ পরিবর্তনের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে দেন। মূলত এ স্বভাবটি কেবল জৈবিক প্রভাবমুক্ত সুস্থ আত্মায়ই দেখা দেয়। সে আত্মাই শুধু পক্ষপাতহীন হক ইনসাফের কাজে আনন্দ পেয়ে থাকে। পার্থিব স্বার্থান্ধরা তা পেতে পারে না। তাই জৈবিক জ্ঞান স্বভাবতঃই এসব কাজে সংকুচিত ও বিমর্ষ হয়ে থাকে। মানুষ যখন এ ধরনের স্বার্থান্ধ হয়, তখন তা দূর করে ইনসাফ কায়েমের পরিমণ্ডল সৃষ্টির জন্য আল্লাহ পাক নবী-রাসূলদের পাঠিয়ে থাকেন।

এ কারণেই যে ব্যক্তি ইসলাম কায়েমের জন্যে অগ্রসর হয় এবং জনগণের ভেতরে তা নিয়ে আন্দোলন শুরু করে, সে আল্লাহর রহমত পাবার যোগ্য হয়ে যায়। মানুষের ভেতর যখন ন্যায়পরায়ণতার স্বভাব স্থায়ী হয়ে যায়, তখন তাদের সাথেও আরশবাহী নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের সাথে সম্পর্ক কায়েম হয়ে যায়। ফলে তা আল্লাহপাকের রহমত ও বখশিশের উপলক্ষ হয়ে যায়। তখন তাদের ও ফেরেশতাদের মাঝে পুণ্য প্রভাবের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এ স্বভাবের ওসিলায় ফেরেশতারা তাদের মদদগার হয়। তাদের অন্তরে ফেরেশতাদের ইলহাম নাযিল হয়। তারাও সে ব্যাপারে জানার জন্য উৎসাহী থাকে।

যখন এ চারটি স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে যাবে, তখন কি ভাবে ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে পূর্ণতা হাসিল হয়, তাও জেনে নিতে হবে। এও জানতে হবে যে, কি করে এ স্বভাববিশিষ্ট লোকদের সাথে ফেরেশতাদের সম্পর্ক কায়েম হয়। এটাও ভালভাবে জানতে পাবে যে, উক্ত গুণাবলীর দ্বারা কিভাবে সর্ব যুগে যুগোপযোগী খোদায়ী বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা যায়।

শেষ কথা, তখন তুমি অনেক মংগল ও কল্যাণ প্রাপ্ত হবে এবং দ্বীনের আইন প্রণেতা হয়ে যাবে। তুমি তাদের ভেতর গণ্য হবে, যাদের জন্য আল্লাহ কল্যাণ মঞ্জুর করেছেন। উক্ত চারগুণ দ্বারা যে অবস্থা সৃষ্টি হয়, তাকেই বলা হয় প্রকৃতি বা মানবিক স্বভাব। এ স্বভাব অর্জনের কয়েকটি উপায় রয়েছে। তার কোন কোনটি হচ্ছে বিদ্যাগত এবং কোন কোনটি হচ্ছে কর্মগত। তারপর এমন কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা মানুষকে স্বভাবের উদ্দেশ্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে। সে প্রতিবন্ধকতা দূর করার বাহানাও রয়েছে। আমি চাই তোমরা সে ব্যাপারগুলো সম্পর্কে অবহিত হবে।

সে জন্যে আল্লাহর তওফিক অনুযায়ী আমি যা কিছু বলি তা তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন। আল্লাহই সর্ব শক্তিমান।

পরিচ্ছেদ ঃ তেত্রিশ

স্বভাব চতুষ্টয় অর্জন, অপূর্ণত্ব পূর্ণ করা ও হৃতবস্তু উদ্ধার করার পদ্ধতি

জেনে রেখো, উক্ত চারটি স্বভাব হাসিলের দুটি ব্যবস্থা রয়েছে। একটি জ্ঞানগত ও অপরটি কর্মগত। জ্ঞানগত পদ্ধতি এজন্যে প্রয়োজন যে, স্বভাব প্রকৃতি জ্ঞান শক্তির অনুগত ও অনুসারী হয়। তাই তুমি দেখতে পাবে যে, যখন মানুষের অন্তরে লজ্জা ও ভীতি সৃষ্টিমূলক কথা বলা হয়,তখন তার কামনার ও নারী সম্ভোগের স্পৃহা স্তিমিত হয়ে আসে। তারপর যখন তার অন্তর স্বভাবের অনুকূল জ্ঞানে পূর্ণ হয়ে যায়, তখন সে জ্ঞাত ব্যাপারগুলো তার অন্তরে মজবুত ভাবে বসে যায়। আর তা এভাবে হয় যে, সে এ কথা বিশ্বাস করে যে, আমার আল্লাহ্ সকল মানবিক দুর্বলতা ও ত্রুটি থেকে মুক্ত পবিত্র। তাঁর কাছে আসমান ও যমীনের বিন্দু-বিসর্গও গোপন থাকে না। যখনই তিন জন মানুষ গোপন পরামর্শ করে, তখন তিনি সেখানে চতুর্থ হয়ে বিরাজ করেন। তেমনি যেখানে পাঁচজন মিলে শলা-পরামর্শ করে, সেখানে ষষ্ঠ হয়ে বিরাজ করেন। তিনি যা চান তা-ই করেন এবং যাকে চান নির্দেশ দেন। তার নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা কারো নেই। ক্ষমতা নেই কারো ঠেকিয়ে রাখারও। নিজ অনুগ্রহে তিনি সব কিছুরই

অস্তিত্ব দান করেন। তিনিই সেসব বস্তুকে দৈহিক ও আত্মিক নিয়ামতরাজি দান করেন। বান্দাকে তিনি কর্ম অনুসারে ফল দান করেন। সে যদি ভাল কাজ করে, তাহলে তিনি ভাল ফল দেন আর খারাপ কাজ করলে খারাপ ফল দেন। স্বয়ং আল্লাহ বলেন ঃ "আমার এই যে বান্দা পাপ করে সে জানে, আমার এক প্রভু আছেন যিনি পাপের জন্য পাকড়াও করেন, আবার ক্ষমাও করবেন। তাই আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।"

মোটকথা, সে এরূপ দৃঢ় মনোভাব পোষণ করে যে, তার অন্তরে অত্যধিক আল্লাহভীতি ও আল্লাহর মর্যাদাবোধের ফলে তাতে সর্বদা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর তিলমাত্র ভয় বা মর্যাদাবোধ অবশিষ্ট থাকে না। সে খুব মজবুত ভাবেই এ ধারণা পোষণ করে যে, মানুষের মূল কৃতিত্ব আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট চিত্তে রুজু হয়ে তাঁর গোলামী করার ভেতরেই রয়েছে। আর মানুষের সর্বোত্তম অবস্থা হল ফেরেশতাদের মত হয়ে আল্লাহর সরাসরি সান্নিধ্য লাভ করা। আল্লাহ্ পাক বান্দার কাছ্ থেকে এটাই চান আর বান্দার ওপর আল্লাহর এটা দাবী যে, তারা অবশ্যই সব কিছু যথা সময়ে করবে।

সারকথা হল, মানুষের কল্যাণ উক্ত ব্যাপারগুলো বাস্তবায়নের ভেতরেই রয়েছে এবং তা বর্জনের ভেতরে রয়েছে চরম অকল্যাণ। বিশেষতঃ পাশব প্রবৃত্তিকে সতর্ক ও শায়েস্তা করার জন্যে শক্ত চাবুক দরকার যা দিয়ে তার খারাপ ইচ্ছেগুলো স্তব্ধ করা যায়। উক্ত বিদ্যাগত ও বিশ্বাসগত অবস্থা সৃষ্টির জন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তার ভেতরে সর্বোত্তম পদ্ধতি আল্লাহপাক ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে নাযিল করেছেন। তা হচ্ছে এই, মানুষকে আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শন দ্বারা, তাঁর সর্বোচ্চ গুণাবলী দ্বারা, তাঁর প্রদত্ত আত্মিক ও দৈহিক নেয়ামতরাজি দ্বারা বুঝানো যাতে তার কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহপাকের জন্যে পার্থিব সকল সুখ-শান্তি বিসর্জন দেয়ার সকল যোগ্যতা তাঁর রয়েছে। তাই সকল ভাবনার ওপরে তাঁর ভাবনা ঠাঁই পাবে এবং তাঁকে সর্বাধিক ভালবাসবে ও তাঁর ইবাদতের জন্যে সার্বিকভাবে যত্নবান হবে।

মুসা (আঃ) এসব পন্থার সাথে তাঁর ভীতি সৃষ্টির পথও অনুসরণ করেছেন। তিন এ ভাবে আল্লাহর কঠোরতা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি অনুগত ও অবাধ্যদের দুনিয়ার বুকেও পুরস্কার ও শাস্তি দিয়ে থাকেন এবং

নিয়ামতকে কখনও শাস্তিতে রূপান্তরিত করেন। উদ্দেশ্য হল, মানুষের অন্তর থেকে যেন পাপাসক্তি বিলুপ্ত হয় ও আনুগত্যের স্পৃহা যেন মন-মগজে শিকড় গেড়ে বসে।

আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম উপরোক্ত ব্যবস্থাদির সাথে কবর ও হাশরের অবস্থা সম্পর্কিত সুসংবাদ ও দুঃসংবাদ শোনান ও সতর্ক করেন। তিনি পাপ-পুণ্যের প্রকৃতি বর্ণনা করেন। সেগুলো শুধু জেনে নেয়াই যথেষ্ট নয়; বরং সর্বদা তার আলোচনা ও অধ্যয়ন প্রয়োজন। ব্যাপারগুলো যেন অহরহ চোখের সামনে ভাসতে থাকে। ফলে যেন সে সম্পর্কিত জ্ঞান পূর্ণ হয়ে যায়। তার সব অংগ-প্রত্যংগ যেন তা বুঝে-শুনে সক্রিয় হয়। বিশেষতঃ আল্লাহর বাণী স্মরণ করা, আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করা ও রোজহাশরের ঘটনাবলী স্মরণ করার তিন বিদ্যা স্মৃতিস্থ হতে হবে। তার সাথে আরও দু'বিদ্যা যথা হালাল-হারামের বিধান ও কাফেরের সাথে দ্বন্দ্ব-বিরোধের বিধি-বিধান জানতে হবে। এ পাঁচ বিদ্যাকেই কোরআনের উত্তম শিক্ষা বলে গণ্য করা হয়।

এক্ষণে কর্মগত ব্যবস্থার উত্তম পদ্ধতি হল এই, মানুষ এমন চাল-চলন, কাজকর্ম ও ব্যাপারাদি অবলম্বন করবে যা ইপ্সিত গুণাবলী স্মরণ করে দেয় ও মনকে সদা সতর্ক রাখে! পরন্তু উক্ত গুণাবলীর দিকে উৎসাহিত করে। এটা এ কারণেও হতে পারে যে, সে কার্যাবলী ও উদ্দিষ্ট গুণাবলী পরস্পর সম্পৃক্ত। অথবা সে কাজগুলো স্বভাবতঃই উক্ত গুণাবলী অর্জনের ধারণাকে জোরদার ও বিজয়ী করে দেয়। তার উদাহরণ এই, মানুষ চায় যে, সে নিজকে উত্তেজিত করবে তখন সে প্রতিপক্ষ যেসব বকাবকি করেছে ও দুর্ণাম বদনাম রটিয়েছে তা স্মরণ করে থাকে। এ ধরনের বহু উদাহরণ রয়েছে। পুরো ব্যাপারটি সে আয়ত্ত করতে চায়। তার সামনে সেগুলো সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে।

এ ভাবে উক্ত গুণাবলী বা স্বভাব অর্জনের বিভিন্ন উপায় উপকরণ রয়েছে। সেগুলোর সাহায্যে তা হাসিল করা যায়। প্রথমতঃ সেগুলোর পরিচিতি লাভের জন্য মার্জিত রুচি ও সুস্থ বুদ্ধি অপরিহার্য। যেমন অপবিত্রতার কারণসমূহ দেখা দিলে মন সংকুচিত হওয়া এবং যেমন যৌন তৃপ্তি মেটাবার জন্যে স্ত্রী সহবাস করা ও হাওয়া নির্গমনে সংকুচিত হওয়া,

শরীর ময়লামুক্ত হওয়া, কফ, থুথু ও সর্দী বের হওয়া, নাভির নিম্নভাগ ও বগলের কেশ বড় হওয়া, শরীর কিংবা কাপড়ে নাপাক বস্তু লাগা ইত্যাদি।

তাছাড়া নিম্নস্তরের খেয়াল ও আলোচনা যাতে জঘন্য মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়। যেমন, নোংরা মুখরোচক কথাবার্তা, লজ্জাস্থান দেখা, পশুদের সঙ্গম মনোযোগ দিয়ে দেখা, ফেরেশতা কিংবা নেককার লোকদের গালমন্দ বা সমালোচনা করা, মানুষকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করা ইত্যাদি। সেসব জিনিসই অবলম্বন করতে হবে যা স্বভাবতঃই পবিত্রতার সহায়ক হয়। যেমন, গোছল করা, ওযু করা, পরিষ্কার পোশাক পরা, খোশবু ব্যবহার করা ইত্যাদি। কেননা এসব জিনিস ব্যবহার করলে মন পবিত্রতার দিকে আকৃষ্ট হয়।

তেমনি বিনয় সৃষ্টির উপায় হচ্ছে আল্লাহপাকের তাযীমের সর্বোচ্চ অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখা। যেমন, তাঁর সামনে আনত শিরে দাঁড়ানো, সিজদা করা। এমন সব শব্দ ব্যবহার করা যা দিয়ে প্রার্থনা, বিনয় ও প্রয়োজনীয় বস্তু কামনা করা হয়। কারণ, এসবের মাধ্যমে আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশের উঁচু স্তর অর্জিত হয়।

তেমনি ঔদার্য সৃষ্টির উপায়সমূহের ভেতর দান-দক্ষিণায় অভ্যস্ত হওয়া, উৎপীড়ককে ক্ষমা করা, কঠিন অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা ইত্যাদি রয়েছে।

তেমনি আদালত বা ন্যায়নীতির স্বভাব সৃষ্টির উপায় হচ্ছে খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে ন্যায়নীতির রীতি-নীতির সব কিছু সবিস্তারে জেনে তা সংরক্ষণ ও অনুসরণ করা। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

পরিচ্ছেদ ঃ চৌত্রিশ

মানবিকতা বিকাশের অন্তরায়

জেনে রেখ, মানবিক বৈশিষ্ট্য বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় তিনটি। প্রকৃতিগত অন্তরায়, রীতিগত অন্তরায় ও বুদ্ধিগত অন্তরায়।

এ অন্তরায়গুলোর মূলে রয়েছে মানুষের খাওয়া-পরা ও কামনা-বাসনা চরিতার্থের দৈনন্দিন চিন্তা ও প্রয়াস। মানুষের অন্তর প্রকৃতির আবেগ ও ইচ্ছার বাহন। আর এ ভার বহন করতে গিয়ে তাকে খুশী, অসুখী ও রাগ-ভয় ইত্যাদির শিকার হতে হয়। ফলে মানুষের মন সর্বদা তাতেই ডুবে

থাকে। উদ্দিষ্ট বস্তু অর্জনের উপায়-উপকরণ নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। বিবেক-বুদ্ধিকে যথোপযোগী বস্তু হাসিলের জন্য কাজে লাগাতে হয়। এসব কারণেই মন এসব বস্তুগত সমস্যায় ব্যস্ত থাকে। পরিণামে অন্যসব ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যায়। তাই মানবিক চরিত্র বিকাশের ভাবনা তার আদৌ থাকে না।

বহুলোক অনুরূপ মনের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চোরাবালিতে ধসে গেছে। তারপর সারা জীবনও সেখান থেকে উঠে আসার সৌভাগ্য হয়নি।

তেমনি অনেক লোক আছে, যাদের ভেতরে জৈব প্রবৃত্তি প্রাধান্য পেয়েছে। তারা রীতি-নীতি ও বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে বেপরোয়া হয়েছে। এটাকেই বলা হয় প্রবৃত্তিগত অন্তরায়।

পক্ষান্তরে যার ভেতর বিবেক-বুদ্ধি চাংগা রয়েছে আর তার বিবেক-বুদ্ধি পূর্ণতা অর্জন করেছে সে ব্যস্ততার মাঝেও সময় বের করে নেয়, প্রবৃত্তির তাড়া পেয়েও সংযত থাকে এবং নিজের মনকেও অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। ফলে তার মন প্রবৃত্তির চাহিদা ছেড়ে বিবেক-বুদ্ধির প্রভাবে চলার যোগ্যতা অর্জন করে। তখন সে বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার সংযোগে মানবতার ক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জনের জন্যে উৎসাহী হয়। তার এ সচেতনতাই তাকে স্বজাতির আচার-আচরণ, লেবাস-পোশাক, মান-মর্যাদা, গর্ব-ঐতিহ্য ইত্যাদি অধ্যয়ন ও অনুশীলনে যত্নবান করে। কারণ, সেসব তার মন-মগজে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। ফলে তার তা অর্জনের জন্য দৃঢ় ইচ্ছা ও বলিষ্ঠ সাহস সৃষ্টি হয়। এটাই হল রীতিগত প্রতিবন্ধক। এটাই হল পার্থিব উন্নতির উৎস। বহু লোক সর্বদা এতেই মত্ত থাকে। এমনকি এর জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়।

মূলতঃ এ কৃতিত্ব ও সাফল্য অস্থায়ী এবং আসে আর যায়। কারো সাথে স্থায়ী থাকে না। কারণ, এর সম্পর্ক জড়জীবনের সাথে এবং পার্থিব উপায়-উপকরণ নির্ভর। তাই মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে এ সাফল্য তার বিপক্ষে চলে যায়। এটা তো সেই বাগানের মত যা আগুনে ভস্মীভূত হয় আর তার ছাইগুলো হাওয়ায় উড়ে যায়। এরূপ ব্যক্তি যদি যথার্থই সচেতন ও বিচক্ষণ হয়, তাহলে সে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে কিংবা অনুমান-আন্দাজ করে অথবা ধর্মীয় বিধি- বিধান অনুসরণ করে অবশ্যই বিশ্বাস করে যে, তার

একজন পালনকর্তা রয়েছে। তিনি তাঁর সকল বান্দার ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে আছেন। তাদের সকল উপায়- উপকরণ তিনিই সরবরাহ করেন। তাদের তিনি অজস্র অবদানে ধন্য করেছেন। এর ফলে তার অন্তর সেই পালনকর্তা প্রভুর দিকে ঝুঁকে যায় ও তাঁর প্রেমে পূর্ণ হয়। এমনকি সে প্রভুর নৈকট্য লাভের জন্য আগ্রহী হয় এবং যেসব কাজ করলে তা অর্জিত হয় তা-ই সে খুঁজে বেড়ায়। তখন সে তাঁর দরবারে কান্নাকাটি করে। সেরূপ ক্ষেত্রে কেউ তাঁকে পায়, কেউ বা ব্যর্থ হয়।

ব্যর্থতার কারণ দুটো। এক, স্রষ্টার ভেতর সৃষ্টির গুণ খেয়াল করা। দুই, সৃষ্টির ভেতর স্রষ্টার গুণ বিশ্বাস করা। পয়লা অবস্থাটি হল উপমাগত ভ্রান্তি। তার তাৎপর্য এই যে, অদৃশ্যকে দৃশ্য বস্তুর সাদৃশ্য ভাবা। দ্বিতীয় অবস্থাটি শির্ক। তার তাৎপর্য এই যে, সৃষ্টির ভেতরে অলৌকিক কাজ দেখে সেটাকে তারই কৃতিত্ব ভাবা।

আমি যা কিছু বললাম তার সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য তোমরা গোটা মানব জাতির প্রতিটি মানুষকে পরীক্ষা করে দেখতে পার, কোথাও তার ব্যতায় দেখবেনা। তখন অবশ্যই দেখতে পাবে যে, একদল প্রকৃতির তাড়নার শিকার হয়ে বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দেয়ায় তাদের মানবতার বিকাশ ঘটছে না। আরেকজন লোক প্রচলিত রীতি-নীতির বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের যথার্থ স্বভাবের বিকাশ ঘটাতে পারছে না। সমাজে কে কি বলছে না বলছে এটা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। গায়েবী প্রত্যাদেশেও তাঁর জীবন ব্যবস্থার দিকে তাদের কান দেবার অবসর হয় না।

পরিচ্ছেদ ঃ পঁয়ত্রিশ

অন্তরায় দূর করার পথ

জেনে রাখুন, প্রকৃতিজাত প্রতিবন্ধক দূর করার দুটি ব্যবস্থা রয়েছে! এক, তার ওপর হুকুম চালান, তাকে উৎসাহ জোগানো ও তাকে উদ্যোগী করা। দুই, সে চাক বা না চাক পয়লা ব্যবস্থার ব্যাপারগুলো তার থেকে জোর করে আদায় করা এবং সে সব ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করা। এখানে পয়লা পদ্ধতিটি হল সেই সাধনা যদ্বারা জৈব প্রকৃতিকে দুর্বল ও অনুগত করা হয়। যেমন রোযা রাখা ও রাত জাগা ইত্যাদি। কিছু লোক

তো এ সব ক্ষেত্রে এত বাড়াবাড়ি করেছে যে, আল্লাহর সৃষ্টিই বিগড়ে দিয়েছে। যেমন পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা, অথবা অনশনে হাত-পা শুকিয়ে অবশ করা। এ সব চরম ধৃষ্টতা। মধ্যম পন্থাই উত্তম পন্থা। আর সেটা রোযা রাখা ও রাত জাগাই এর অব্যর্থ ব্যবস্থা। তাও প্রয়োজন মতে হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় পথ হচ্ছে, রিপুতাড়িত পথচ্যুতদের প্রতি বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা সৃষ্টি করা। তাদের সে সব ব্যবস্থা প্রদান করা উচিত যা থেকে সে প্রবৃত্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে। এ জন্যে কাউকে খুব বেশী কষ্ট দেয়া ঠিক নয়। তবে কেউ অন্যায় করবে না বললেই যথেষ্ট মনে করা উচিত নয়। তাকে বেত্রদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেয়া চাই। অবশ্য মারপিট সেসব অপরাধে করা উচিত যে সব অপরাধ সংক্রামক। যেমন ব্যভিচার ইত্যাদি।

প্রথাগত প্রতিবন্ধকতা উচ্ছেদের উপায় হল এই, প্রতিটি কাজে আল্লাহকে স্মরণ রাখা। তিনি কি কি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন আর কোন কাজের কি সীমা-শর্ত নির্ধারণ করেছেন সর্বদা তা খেয়াল রাখা। দ্বিতীয়ত, সকল ইবাদতকে প্রথা বানিয়ে নেবে আর তা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে পালন করবে। যারা তা বর্জন করবে তাদের নিন্দা করবে। যদি কখনও তা বর্জন হয়ে যায় সে জন্যে নিজকে সুখ-শান্তি ও আনন্দদায়ক কাজ থেকে বিরত রাখবে। এর ফলে প্রচলিত পদ্ধতির সংস্কার মন থেকে দূর হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর ইবাদতে মন লাগালেই তা সহজ হয়ে যাবে।

আল্লাহকে পাবার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা দেখা দেয়ার যে দুটো কারণ (তাশবীহ ও শিরক) রয়েছে তা থেকে বাঁচার উপায় হল এই যে, আল্লাহ যেহেতু মানবীয় জৈব স্বভাব ও কাজ থেকে পবিত্র তাই তাঁকে তার সাথে তুলনা করা এবং কোন মানুষকে তাঁর গুণ ও কাজের কোন কিছুর যোগ্য মনে না করা। পরন্তু সাধারণ মানুষের সামনে এমন প্রসংগ না আনা যা তাদের বোধগম্য হবার নয়।

এর তাৎপর্য হল এই যে, এমন কোন উপস্থিত, অনুপস্থিত, শরীরী, অশরীরী বস্তু নেই যার সাথে মানুষের জ্ঞান জড়িত হয় না। হয় সে সশরীরে কিছু দেখে সে সম্পর্কে জানে, অথবা উপস্থিত বস্তুর ওপর অনুমান ও কেয়াস করে অনুপস্থিত জিনিস সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করে। এ ভাবে না থাকা বস্তু এমনকি অজ্ঞাত বস্তু সম্পর্কেও ধারণা নিয়ে থাকে। তার পদ্ধতি

এই যে, পরলা সে অস্তিত্বমান বস্তুর অর্থ জেনে নিয়ে অনস্তিত্ব বস্তুকে তার আলোকে বুঝে নেয়। তেমনি অজ্ঞাত বস্তুর নাম ও অর্থ জেনে নিয়ে তার সাথে জ্ঞাত বস্তু মিলিয়ে সেটা সম্পর্কে একটা কল্পিত যৌগিক ধারণা সৃষ্টি করে থাকে। হয়তো সেটা বস্তুর অর্থ জেনে নিয়ে অনস্তিত্ব বস্তুকে তার আলোকে বুঝে নেয়। তেমনি অজ্ঞাত বস্তুর নাম ও অর্থ জেনে নিয়ে তার সাথে জ্ঞাত বস্তু মিলিয়ে সেটা সম্পর্কে একটা কল্পিত যৌগিক ধারণা সৃষ্টি করে থাকে! হয়ত সেটা বস্তু জগতে তো নেইই, কল্পনার জগতেও তার অস্তিত্ব অনুপস্থিত। যেমন, মানুষ কোন খেয়ালী বস্তু কল্পনা করে নিজের বুদ্ধিমতে তার আকৃতি-প্রকৃতি ঠিক করে সেই কল্পিত বস্তুটিকে বাস্তব রূপ দেয়। এটা সম্পূর্ণই তার খেয়ালী বস্তু হয়।

আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে মানুষকে এ কথাই বলতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব আছে কিন্তু তা আমাদের মত নয়। মোটকথা আল্লাহ তা'আলার এমন গুণাবলী চিন্তা করা উচিত যা দৃশ্যমান, প্রশংসনীয় গুণাবলীর উৎস মনে করা হয় এবং সে ক্ষেত্রে তিনটি তাৎপর্যের প্রতি খেয়াল রাখা প্রয়োজন। আমরা প্রকাশ্যে যা কিছু দেখছি তার তিন অবস্থা। এক, এমন বস্তু যা প্রশংসার যোগ্য এবং তাতে প্রশংসার নিদর্শনও রয়েছে! দুই, এমন বস্তু রয়েছে যা না বর্তমানে প্রশংসনীয়, না ভবিষ্যতে তার প্রশংসনীয় হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তিন, এমন বস্তু যার আপাততঃ গুণ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তা প্রশংসার যোগ্য। যেমন জীবিত পাথর কিংবা মৃত।

আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে গুণ নির্ণয় করা হয় তবে নিদর্শনের আলোকে। তাই উক্ত তাশ্‌বীহ বা উপমাজনিত ভ্রান্তি এভাবে দূর করা যায় যে, তিনি আমাদের মত নন। আল্লাহকে না বুঝার ও তাঁর ব্যাপারে পাপমূলক ধারণা সৃষ্টির কারণ এই যে, দৃশ্যমান বস্তুর সৌন্দর্য ও স্বাদ সর্বদা দৃষ্টিতে থাকায় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো অহরহ তাতে ভরপুর থাকায় মন স্বভাবতই তাতে প্রভাবিত থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহর যথার্থ গুণাবলী সম্পর্কে কোন ধারণা বা খেয়াল থাকে না। এর প্রতিকার হচ্ছে কঠিন ও কষ্টকর আত্মিক সাধনা; তাছাড়া এমন সব আমল অনুসরণ করা, যার ফলে উঁচুস্তরের তাজাল্লী বা নূর ধারণের ক্ষমতা অর্জিত হয়। যদিও তার প্রকাশ আখেরাতেই ঘটবে। এ জন্যে এ'তেকাফ করা চাই। আর যথাসম্ভব পার্থিব আকর্ষণীয় দৃশ্যাবলী থেকে দূরে থাকা চাই। যেমন, রাসূল (সঃ) চিত্রাংকিত পর্দা ও জরী-বুটিদার চাদর ছিঁড়ে ও ছুঁড়ে ফেলেছিলেন।

পরিচ্ছেদ ঃ ছত্রিশ

পাপ-পুণ্যের বিবরণ

পাপ-পুণ্যের তাৎপর্য ঃ পুরস্কার ও শাস্তির বর্ণনা যখন আমরা শেষ করে এলাম আর মানুষের যে সব প্রকৃতিগত বিভিন্ন সমস্যাদি পর্যালোচনা শেষ করলাম, যার বাইরে মানুষের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, তখন আমরা মানুষের বিভিন্ন স্তর ও তা অর্জনের পথ নির্দেশ করেছি। এক্ষণে আমরা মানুষের পাপ-পুণ্য বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করতে যাচ্ছি।

মানুষ সর্বোচ্চ পরিষদের আনুগত্য প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহর ইশারা-ইংগীত সর্বতোভাবে মেনে নিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে যে কাজ করে তাকেই বলা হয় পুণ্য। তাছাড়া মানুষের যে কাজ তার প্রকৃতিগত ব্যবস্থাপনার সাথে সামঞ্জস্যশীল সেটাও পুণ্য। পরন্তু যে কাজ আনুগত্যের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তার অন্তরায়গুলো দূর করে সেটাও পুণ্য। তেমনি যে কাজের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতে পুরস্কৃত করা হয়, সেটাকেই পুণ্য বলে।

পক্ষান্তরে মানুষ শয়তানের আনুগত্য প্রদর্শন ও তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে যে কাজ করে তাকে বলা হয় পাপ। তাই যে কাজের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি দেয়া হবে সেটাও পাপ। তেমনি যে কাজ মানুষের স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থায় বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করে সেটাই পাপ। পরন্তু যে কাজ স্রষ্টার আনুগত্যের পরিপন্থী পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে ও তাঁর কাজের অন্তরায়গুলো দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে সেটাও পাপ।

যে ভাবে জ্ঞানীসমাজ বস্তুজগতের নিয়ম-শৃংখলার জন্যে আইন-কানুন প্রণয়ন করে চলে এবং পর্যায়ক্রমে দুনিয়ার সর্বত্র দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ তাতে একমত হয়ে নিজ এলাকায় অনুসরণ করে থাকে, পুণ্য প্রচলনের পদ্ধতিও ঠিক তাই।

আল্লাহ পাক যাদের অন্তরে ফেরেশতাসুলভ নূরের অস্তিত্ব পয়দা করার জন্য ইলহাম করেছেন, তারা তা করে চলে ও তার ওপরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অতঃপর তারা মানুষকে তা শিক্ষা দেয় ও তা করার জন্য প্রেরণা যোগায়। ফলে তারা তার অনুসারী হয়। আস্তে আস্তে সকল ধর্মপ্রাণ লোকেরা স্বভাবগত সাযুজ্যের কারণে ও জাতিগত প্রয়োজনের খাতিরে তার প্রচারিত নীতিমালার ওপরে একমত হয়। এভাবেই মানব সমাজে পুণ্য

কাজের প্রচলন হয়। মধুমক্ষিকা যেভাবে আল্লাহ দত্ত ইলহামের মাধ্যমে নিজেদের সুন্দর ও সুশৃংখল জীবন জীবিকার বিধিব্যবস্থা চালু করেছে, মানব সমাজেও সেভাবে তা চালু হয়ে থাকে।

বলাবাহুল্য, পুণ্য কাজের এ গ্রহণযোগ্যতা দেশ বা ধর্মের দূরত্বও ঠেকাতে পারে না। মানুষ যখন কোন মূলনীতিতে একমত হয়ে যায়, তখন তার শাখা-প্রশাখার পার্থক্য কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না। তেমনি গোত্র বা গোষ্ঠীবিশেষ তা না মানলেও কিছু আসে যায় না। কারণ, সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন লোক এটা সুস্পষ্টই দেখতে পায় যে, সে লোকদের প্রকৃতিই মানব-জাতির সহজাত প্রকৃতির পরিপন্থী। তাই সে মানবের স্বভাবগত বিধি-বিধানও মানতে পারছে না। এ লোকগুলো হল কোন মানব দেহের ব্যতিক্রম ধর্মী বাড়তি অংশের মত যা থাকার চেয়ে না থাকাই উত্তম ও শোভন।

পুণ্য প্রচলন পদ্ধতিগুলোর বিবিধ বড় বড় উপায় ও ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহর ওহী প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ যে পদ্ধতিগুলো দৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, তাদের ওপর আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ বর্ষিত হোক–তারা মানব জাতির স্থায়ী কল্যাণ সাধন করে গেছেন। এখন আমি আপনাদের সামনে তাদের সেই সর্ববাদীসম্মত নীতিমালা তুলে ধরতে চাই, যার ওপরে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের বড় বড় দল, অভিজাত সম্প্রদায়, রাষ্ট্রনায়কবৃন্দ, জ্ঞানী গুণীকুল, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, আরব-অনারব, ইয়াহুদী, হিন্দু, মাজুসী প্রভৃতি একমত হয়েছে। অতঃপর আমি সে নীতিমালা সৃষ্টি হওয়ার পটভূমিও ব্যাখ্যা করব যা জৈব প্রবৃত্তির আত্মিক শক্তির আনুগত্যের মাধ্যমে জন্ম হয়। তারপর তার কল্যাণকারিতার সেসব দিকও তুলে ধরব যা আমি ব্যক্তি জীবনে বারংবার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করেছি এবং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি যা নির্দেশ করে থাকে।

পরিচ্ছেদ ঃ সাইত্রিশ

তাওহীদ

সকল পুণ্যের উৎস হল তাওহীদ বা একত্ববাদ। সকল শ্রেণীর পুণ্যের ভেতর এটাই সর্বোত্তম। কারণ, নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালকের সামনে একাগ্রভাবে সবিনয়ে আত্মনিবেদন করার কাজটি সর্বতোভাবে এর ওপর নির্ভরশীল। মানবিক মৌলিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের এটাই নৈতিক ভিত্তি। এটাই সেই জ্ঞানগত ব্যবস্থা যা উভয় ব্যবস্থাপনার ভেতর সর্বাধিক কল্যাণপ্রদ। এর

মাধ্যমে মানুষ অদৃশ্য জগতের দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়। তার আত্মা এক পবিত্র বন্ধনের সাহায্যে অদৃশ্য শক্তির সাথে সংযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাওহীদের বিরাট মর্যাদার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি এটাকে সকল পুণ্যের আত্মা বলে আখ্যায়িত করেছেন। আত্মা যদি ঠিক থাকে তাহলে যেমন গোটা দেহ ঠিক থাকে, আর আত্মা যদি বেঠিক হয় তো সারা দেহ বেঠিক হয়ে যায়, এও তেমনি ব্যাপার।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মারা গেল এবং আল্লাহর সাথে শিরক করল না, সে জান্নাতে গেল। তিনি আরও বলেন–তার ওপর দোযখের আগুন হারাম। তিনি আরও বলেন ঃ কোন বস্তুই তাকে জান্নাত থেকে ফেরাতে পারবে না। তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী উদ্ধৃত করে বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার সামনে এক পৃথিবী পাপ নিয়ে এল এবং আল্লাহর সাথে শিরক না করা অবস্থায় এল, আমি তার সাথে এক পৃথিবী ক্ষমা নিয়ে মিলিত হব।

মনে রাখবেন, তাওহীদের চারটি প্রাণ সত্তা ঃ

১। ওয়াজিবুল ওজুদ বা অপরিহার্য সত্তা হবার গুণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। আল্লাহ্ ব্যতীত কারো অস্তিত্বই স্থায়িত্ব পাবে না।

২। আরশ, আকাশ, পৃথিবী ও সকল মৌলিক বস্তুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্।

মূলত কোন ঐশী গ্রন্থই উপরোক্ত দু'ব্যাপারে দ্বিমত দেখায়নি। আরবের মুশরিকরাও উক্ত ব্যাপারে একমত। ইয়াহুদী নাসারাও তা অস্বীকার করেনা। কুরআন বলছে, উক্ত ব্যাপারে সবাই একমত।

৩। আসমান ও যমীন এবং তাতে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন।

৪। একমাত্র আল্লাহই ইবাদত বা উপাসনা লাভের যোগ্য। কারণ ইবাদত তো একমাত্র মাবুদের অবিচ্ছেদ্য ভূষণ! ইবাদত ছাড়া কোন মা'বুদ চিন্তা করা যায় না। এ কারণেই দুনিয়ায় ইবাদত ও মা'বুদ নিয়েই যত মতান্তর দেখা দিয়েছে। এ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও

ধর্মগোষ্ঠি, তার ভেতরে তিন সম্প্রদায় বড়।

১। **নক্ষত্র পূজক ঃ** তারা মনে করে, নক্ষত্রমণ্ডলীই উপাসনা লাভের যোগ্য। নক্ষত্র পূজা থেকেই পার্থিব কল্যাণ আসে। তার সামনে কিছু প্রার্থনা করাই সঠিক কাজ। তারা বলে, আমরা গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পেরেছি যে পৃথিবীতে দৈনন্দিন যা ঘটে, মানুষের যা কিছু সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য তাদের সুস্থতা ও রুগ্নতা সব কিছুর ব্যাপারেই নক্ষত্রের হাত রয়েছে। নক্ষত্রের আত্মা আছে যা তাদের গতিবিধি থেকেই প্রতীয়মান হচ্ছে। তাই সেগুলো তাদের উপাসনায় সাড়া দেয় ও তাঁদের ব্যাপারে উদাসীন নয়। এ কারণে তারা তারকার জন্য উপাসনালয় তৈরী করেছে। তাতে তারা সেগুলোর উপাসনা করছে।

২। **অংশীবাদী ঃ** এ সম্প্রদায়টি মূল স্রষ্টার ব্যাপারে আমাদের সাথে একমত। এমন কি বড় বড় কাজগুলো যে সেই স্রষ্টার তাতেও তারা দ্বিমত পোষণ করে না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে আল্লাহর হাতে তাও তারা মানে, কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে তারা ভিন্ন মত পোষণ করে। তাদের ধারণা, পূর্ববর্তী যেসব নেককার বুযুর্গ আল্লাহর নৈকট্য পেয়ে গেছেন, তাদেরকেও আল্লাহ তাঁর কার্যকলাপের কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন। তাই আল্লাহর তারা সৃষ্টিজীব হলেও ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। যেমন, কোন বাদশাহকে কেউ বহু খেদমত করে খুশী করে থাকে এবং বাদশাহ তাকে পুরস্কার স্বরূপ বিশেষ খেতাব দিয়ে কোন এলাকার দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন। তখন সে এলাকার লোকের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় তার আনুগত্য করা! এ যুক্তির ভিত্তিতেই মুশরিকরা বলে থাকে, সেই বুযুর্গদের ইবাদত না করলে আল্লাহর ইবাদত কবুল হবে না। কারণ, আল্লাহ অনেক বিরাট ব্যাপার ও তিনি অনেক ঊর্দ্ধে রয়েছেন। তাঁর কাছে নৈকট্য প্রাপ্ত বুযুর্গদের ইবাদত করে তাদের মাধ্যমে সেখানে পৌছতে হবে। অংশীবাদীরা বলে, মৃত বুযুর্গরা সব শুনতে ও দেখতে পান এবং নিজ নিজ উপাসকদের কাজ দেখাশোনা করেন ও তাদের সাহায্য করেন। বস্তুতঃ তারা সে বুযুর্গদের পাথরের মূর্তি বানিয়ে নিয়েছে। তারপর সে মূর্তির সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে মূলত আল্লাহ্র কাছেই প্রার্থনা করত। পরবর্তী স্তরে যারা এল তারা সে বুতগুলোকেই আল্লাহ ভেবে প্রার্থনা জানাত এবং বুত ও আল্লাহর মাঝে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করত না।

তাই মুশরিকদের সতর্ক করতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক কোথাও বলেছেন, রাষ্ট্র ও তার বিধি-বিধান একমাত্র আল্লাহর। কোথাও বলেছেন, এগুলো তো নিছক পাথর মাত্র। তারপর বলেছেন, তাদের কি পা আছে, যে চলবে, তাদের কি হাত আছে, যে ধরবে, তাদেরকি চোখ আছে, যে দেখবে এবং তাদের কি কান আছে, যে শুনবে?

৩। নাসারাদের ধারণা, ঈসা মসীহ (আঃ) আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত সত্তা, তিনি অতি মানব। তাই তাঁকে বান্দা বলা যাবে না। তাহলে তিনি অন্যান্যের পর্যায়ে নেমে যাবেন। সেটা হবে তাঁর বেআদবী ও তাঁর সাথে আল্লাহর ঘনিষ্ঠতার অবমূল্যায়ন। তাদের একদল তাঁকে এ বৈশিষ্ট্য প্রদান করল যে, তিনি আল্লাহর পুত্র। এ কারণে যে পিতা-পুত্রের ওপর সর্বাধিক সদয় থাকেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। পুত্রের মর্যাদা স্বভাবতঃই ভৃত্যদের ওপর। তাই তাঁর আল্লাহর পুত্রবৎ হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

তাদের একদল তো তাঁকে স্বয়ং আল্লাহই বানিয়ে ফেলেছে। কারণ, তিনি তো আল্লাহ্রই অংশ। তাই তাঁর ভেতর অপরিহার্য সত্তার অস্তিত্ব বিদ্যমান। তাই তাঁর থেকে এমন সব কাজ প্রকাশ পেয়েছে, যা সাধারণ লোক থেকে প্রকাশ পেতে পারে না। যেমন, মৃতকে জীবিত করা ও মাটি দিয়ে পাখী বানিয়ে জীবে পরিণত করা। সুতরাং তাঁর বাণীই আল্লাহর বাণী ও তাঁর ইবাদত করাই আল্লাহর ইবাদত করা।

পরবর্তী স্তরের নাসারা সমাজ ঈসা মসীহকে আল্লাহর প্রকৃতি পুত্র বলে ঘোষণা করল। তাই আল্লাহ্ পাক এ ধারণা বাতিল করে কোথাও বলেন, আল্লাহর কোন স্ত্রী নেই। কোথাও তিনি বললেন, আল্লাহই আকাশ ও পৃথিবী শূন্যাবস্থা থেকে সৃষ্টি করেন। তারপর বলেন, তিনিই একক সত্তা ও নির্দেশ শুধু তাঁরই চলে। যখন তিনি কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলেন "হয়ে যাও" অমনি হয়ে যায়।

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত তিন সম্প্রদায়ের বহুবিধ ধ্যান-ধারণা ও অশোভন কথাবার্তা রয়েছে যা চিন্তাশীল গবেষকদের অজানা নয়। কুরআনে শেষোক্ত দু'দলের ওপর আলোচনা রয়েছে এবং তার সাথে অবিশ্বাসীদের সংশয়াদি নিরসন ঘটানো হয়েছে।

পরিচ্ছেদ ঃ আটত্রিশ

শিরকের হাকীকত

স্মরণ রাখবে, ইবাদত বলতে পরম বিনয় ও কাকুতি-মিনতি বুঝায়। আর কারো সামনে বিনীত হওয়ার দুটো পদ্ধতি রয়েছে।

এক– বাহ্যিক নিয়ম। যেমন, কেউ আনত শিরে কারো কাছে দাঁড়াল বা তার উদ্দেশে ভূমিতে মাথা লুটাল বা সিজদা করল।

দুই–আন্তরিক বিনয় বা বিনয়ের নিয়তঃ যেমন, কেউ মনে-প্রাণে কারো জন্যে সম্ভ্রম বোধ সঞ্চিত করল! এ বোধ থেকেই বান্দা তার প্রভুকে, প্রজা তার রাজাকে ও শিষ্য তার গুরুকে সম্মান দেখিয়ে থাকে।

বিনয় ও সম্ভ্রম দেখাবার তৃতীয় কোন পথ নাই। এক্ষণে ফেরেশতারা যে আদম (আঃ)-কে সিজদা করেছেন কিংবা ইউসুফ (আঃ)-কে যে তার ভায়েরা সিজদা করেছে তা ছিল সম্মান প্রদর্শনের সিজদা। যদিও তা সম্মান প্রদর্শনের সর্বোচ্চ রূপ, তথাপি তা যেহেতু ইবাদতের নিয়তে ছিল না, তাই তা ইবাদত নয়। এতেই জানা যায় যে, ইবাদতের বিষয়ে নিয়ত অপরিহার্য।

কথাটা আরও স্পষ্ট হওয়া দরকার। যেমন, প্রভু শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে যেখানে উপাস্য প্রভু বুঝবে সেখানে সিজদা দ্বারা ইবাদত বুঝাবে। এর ব্যাখ্যা এভাবে হবে যে, বিনয়ের দাবী হচ্ছে, বিনয় প্রকাশকের চেয়ে বিনয়প্রাপ্ত বড় ও সবল এবং বিনয় প্রকাশক অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ছোট। তাই সবল দুর্বলের কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের অধিকারী। মানুষ চিন্তা-ভাবনা করলে অবশ্যই দেখতে পাবে, তাদের ভেতরেও শক্তি, মর্যাদা, কর্তৃত্বের অস্তিত্ব রয়েছে। সেটাকেই বলা হয় কামালিয়াত তথা পরিপূর্ণতা। এটা দু'ধরনের ঃ একটি স্তর হল নিজের ও নিজের সমস্তরের! দ্বিতীয় স্তর হল হওয়া না হওয়ার যাবতীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে সত্তা। পয়লা স্তরটিতে দ্বিতীয় স্তর থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য প্রদত্ত হয়ে থাকে।

ইলমে গায়েবের দু'টি স্তর।

এক ঃ স্বপ্ন কিংবা বিশেষ ব্যবস্থা বা সাধনার মাধ্যমে প্রাপ্ত ইলমে গায়েব।

দুইঃ –ইলহাম প্রাপ্ত ইলমে গায়েব। সেটা ব্যক্তিগত কামালিয়াতের মাধ্যমে সরাসরি বিনা চেষ্টায় পাওয়া যায়।

তেমনি প্রভাব সৃষ্টি, প্রশাসন ব্যবস্থা ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও দুটো স্তর থাকে। এক, অংগ-প্রত্যংগ ও বুদ্ধি-কৌশল খাটিয়ে তা অর্জন করতে হয়। তা আবার পরিবেশ ও পরিমণ্ডলগত অবস্থা কাজে লাগিয়ে তা করতে হয়। দুই, আপনা থেকেই কোন কিছুর সাহায্য ছাড়াই সরাসরি অর্জিত হয়। আল্লাহ পাকের নিম্নের বাণী তার প্রমাণ ঃ–

অর্থাৎ, আল্লাহ যখন কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, তখন শুধু বলেন "হয়ে যাও" অমনি হয়ে যায়।

তেমনি প্রভাব-প্রতিপত্তি, মর্যাদা ও ক্ষমতার দুটো স্তর রয়েছে। এক প্রজা-পুঞ্জের ওপর বাদশাহর প্রভাব-প্রতিপত্তি। কারণ, তার আমীর-ওমারা, সেনা সামন্ত, ধন-সম্পদ প্রচুর থাকে। তেমনি দুর্বলের ওপর শক্তির প্রাধান্যের জন্য সবলের ও শিষ্যের ওপর জ্ঞানের প্রাধান্যের জন্য গুরুর প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখা দেয়। কারণ যাই হোক, প্রভাব-প্রতিপত্তির মূল রূপ সব ক্ষেত্রেই সমান! দুই–এ স্তরের শেষ্ঠত্ব অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের হয়ে থাকে। এর রহস্য আপনাদের সামনে ততক্ষণ পর্যন্ত অনুদ্ঘাটিত থাকবে, যতক্ষণ আপনাদের এ প্রত্যয় না হবে যে, সমস্ত নশ্বর বস্তুই এক অবিনশ্বর সত্তায় গিয়ে শেষ হয় এবং সেই অবিনশ্বর সত্তার অসীম প্রভাব-প্রতিপত্তির মৌল অংশটি তাঁর থাকে ও তাঁর নৈকট্যের প্রভাবে অপর নশ্বর সত্তাও প্রভাবশালী হয়। তাই যেসব শব্দ এরূপ হয় যা উভয়ের জন্যে প্রযুক্ত ও ব্যবহৃত হয়, তার তাৎপর্যও খুবই কাছাকাছি হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রটি খুবই সূক্ষ্ম ও নাজুক ক্ষেত্র। এখানেই পদস্খলনের ব্যাপারটি সর্বাধিক সংঘটিত হয়। অনেক সময় আল্লাহর রীতি-নীতির প্রয়োগ স্বাভাবিক ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে ঘটানো হয়। ফলে মানুষ তার স্বজাতি কিংবা ফেরেশতা অথবা অন্য কোন সৃষ্টি হতে এমন কিছু প্রকাশ পেতে দেখে, যা তারা ভাবতেও পারে না এবং সঙ্গত ভাবেই অসম্ভব মনে করে। ফলে তার সকল অনুভূতি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়। এ থেকেই উক্ত ব্যক্তি বা সৃষ্টি তাদের ওপর খোদায়ী প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং তারা আল্লাহর কুদরত ও মানুষের প্রভাবের মধ্যে তারতম্য খুঁজে পায় না।

অবশ্য আল্লাহ্র কুদরত বুঝার শক্তি সকলের সমান নয়। কেউ নিজের অভ্যন্তরে সৃষ্ট নূরের বদৌলতে এ ধরনের ঐশী শক্তির ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিতে পারেন। অনেকের আবার সে ক্ষমতা থাকে না। তাই মানুষকে যার যার ক্ষমতা অনুসারে জবাবদিহি করা হবে এবং সে অনুসারেই প্রত্যেকের ওপর দায়িত্ব চাপানো হয়। নবী করীম (সঃ)-এর একটি বর্ণনায় এ ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। তিনি বলেন– "আল্লাহ্ পাক সেই লোকটিকে মুক্তি দিয়েছেন যে ব্যক্তি নিজ পরিবারবর্গকে নির্দেশ দিয়েছিল যে, মৃত্যুর পর আমাকে জ্বালিয়ে ফেলবে ও আমার ছাই হাওয়ায় উড়িয়ে দেবে। কারণ, তার ভয় ছিল যে, আল্লাহ তাকে আবার জীবিত করে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। সে আল্লাহ্র কুদরতে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু তার ধারণা ছিল যে, তার সম্ভাব্য সকল ব্যাপারই রয়েছে বটে, তবে অসম্ভব ব্যাপারে তা নেই। তাই সে ভাবল, সর্বত্র বিক্ষিপ্ত ছাইগুলো জমা করে তাকে পুনরায় জীবিত করা এক অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, তার অর্ধেক দরিয়ায় ভাসানো হবে ও অর্ধেক হাওয়ায় উড়ানো হবে।তার এ অসম্পূর্ণ ধারণায় আল্লাহর অস্তিত্বের বিশ্বাসে কোন ক্ষতি দেখা দেয় না। তার জ্ঞান মোতাবেক সে আল্লাহর মর্যাদা দেয়ায় যে শিরক জন্ম নেয় সেটাই তাশবীহ। মানুষের ভেতর এটা পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে চলে এসেছে। প্রত্যেক নবীকেই এ সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং তাদের জন্য অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে শিরকের আসল রূপ বুঝিয়ে দেয়া। তাদের কাজ ছিল কুদরত ও কারামতের মধ্যকার তারতম্য বুঝিয়ে দেয়া এবং মহান কুদরতের সম্পর্ক শুধুমাত্র আল্লাহ্ পাকের সাথে সংযুক্ত করা। অবশ্য দুটো স্তরের পরিভাষার তাৎপর্যই খুব কাছাকাছি বটে। যেমন, রাসূল (সাঃ) এক ডাক্তারকে বললেন; তুমি তো শুধুমাত্র চিকিৎসক, নিরাময়কারী তো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা! তিনি আরও বলেন ঃ সর্দার তো কেবল আল্লাহ্ পাক। হাদীসের এ দু'জায়গায়ই তিনি পরিভাষাদ্বয়ের মূল অর্থ গ্রহণ করেছেন।

অতঃপর যখন রাসূলের (সঃ) সহচর দ্বীনের ধারক-বাহকগণ বিদায় নিলেন এবং তারপর সে সব লোকের আগমন ঘটল যারা নামাজ তরক করল ও বাসনা- কামনা চরিতার্থের পেছনে লেগে গেল, তারা এ ধরনের

দ্ব্যর্থবোধক পরিভাষা অপাত্রে ব্যবহার করল, যেমন আল্লাহ্ পাক তাঁর বিধানে তাঁর বন্ধুত্ব ও শিক্ষা খাতকে খাস বান্দাদের ভেতরে সীমিত করে দিয়েছেন। কিন্তু এসব লোক তা যত্রতত্র ব্যবহার করে গেছে। যেমন অলৌকিক ঘটনা। কাশ্‌ফ ও তাজাল্লীর ক্ষমতা তারই ভাবা হয় যার থেকে তা প্রকাশ পায়। সে অসাধারণ জ্ঞান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে গেছে। অথচ সত্য ও সঠিক এই যে, এ সবকিছুরই উৎস হল আত্মিক শক্তি ও সে সব সাধনা লব্ধ আধ্যাত্মিক ঐশী কুদরতের নগণ্য প্রতিফলন মাত্র। এটা কোন সৃষ্টির নিজস্ব কৃতিত্ব নয়। তাছাড়া আল্লাহ পাকের খাস কুদরতের সাথে এর সম্পর্ক নেই।

শির্‌ক কয়েক প্রকারের। একদল মুশরিক তো আল্লাহ পাককে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে গায়রুল্লাহ্‌র উপাসনা করে ও তাদের সামনে সব কিছু প্রার্থনা করে। তারা আল্লাহ্‌কে নিয়ে আদৌ ভাবে না। অথচ তারাও যুক্তি-বুদ্ধি ও দলীল-প্রমাণ দ্বারা বুঝতে পারে যে, সব কিছুই আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে!

অপর দলের বিশ্বাস, আল্লাহই মূল কর্তা ও সকল কার্যকারণের উৎস। কিন্তু কখনও তিনি কোন বান্দাকে মর্যাদা ও কর্তৃত্ব দান করেন এবং তার ওপর বিশেষ বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। এমনকি বান্দাদের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে তার সুপারিশ কবুল হয়। যেমন, কোন শাহানশাহ বিভিন্ন এলাকায় একেকজন শাসক পাঠিয়ে কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যাপার ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ণ দায়িত্ব তাদের অর্পণ করেন, এও ঠিক তেমনি ব্যাপার। তাই এ ধরনের লোককে তারা আল্লাহর বান্দা বলতেও সাহসী হয় না। তাহলে সে হয়ত অন্যান্যদের পর্যায়ে থেকে যাবে। তাই তারা তাকে আল্লাহর পুত্র ও তার বন্ধু বলে আখ্যায়িত করে থাকে এবং নিজের নামের মাধ্যমে নিজকে তার বান্দা বলে প্রকাশ করে। যেমন, আবদুল মসীহ্, আবদুল উম্মা ইত্যাদি। এ ধরনের শির্‌কে ইয়াহুদী, নাসারা ও মুশরিকরা সবাই একাকার। এমনকি এ যুগে আমাদের মুসলমানদের ভেতরেও এ ধরনের বাড়াবাড়ি ও মুনাফিকী দেখা দিয়েছে।

যেহেতু শরীয়তের বুনিয়াদী কথাই হচ্ছে আসল শির্‌কের মতই শিরকের আশংকাযুক্ত কাজও সমান পরিত্যাজ্য, তাই সেসব ব্যাপারকেও

কুফর বলা হয়েছে, যাতে শিরকের সম্ভাবনা থাকে। যেমন, প্রতিমাকে সিজদা দেয়া, তার নামে উৎসর্গ করা, তার নামে শপথ নেয়া ইত্যাদি। এই ইলম আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে তখনই যখন আমার সামনে এমন একটা সম্প্রদায় হাজির হল যারা ক্ষুদ্র এক বিষাক্ত মৌমাছিকে সিজদা করত এবং সেটা সর্বদা নিশ্বাস নিত ও পাখা-পা দোলাতে থাকত। তখন আমার অন্তর বলে উঠল, তুমি কি এর ভেতর শিরকের আঁধার দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম, আমি তো এর ভেতর শিরকের আঁধার দেখতে পাচ্ছি না। কারণ, মক্ষিকাকে সে শুধু সিজদার কিবলা স্থির করেছে, কিন্তু বিনয়ের সাথে সে মর্যাদাকে মিলায়নি। অমনি আওয়াজ এল, তুমি রহস্যের দ্বারোদঘাটন করেছ। ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে আমার অন্তর তওহীদের জ্ঞানে পরিপূর্ণ হল। এ ক্ষেত্রে আমার দূরদৃষ্টি অর্জিত হল যে, তওহীদ ও শিরককে শরীয়ত ও ঈমানের ভিত বলে নির্ধারণ করেছে তা ভালভাবেই জানতে পেলাম। আর ইবাদতের সাথে কাজের কি সম্পর্ক তাও বুঝতে পেলাম। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

পরিচ্ছেদ ঃ উনচল্লিশ

॥ শিরকের প্রকার ভেদ ॥

শিরকের তাৎপর্য হল এই, মানুষ বুযুর্গ লোকদের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করে যে, তাদের থেকে যেসব নিদর্শন ও কারামত প্রকাশ পায় তা তাদের সেই গুণ ক্ষমতার কারণে যা মানুষের থাকতে পারে না; বরং তা শুধু আল্লাহরই থাকে। তবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ভেতর তখনই তা দৃষ্ট হয়, যখন আল্লাহ তাঁর ক্ষমতার কিছু অংশ তাকে অর্পণ করেন কিংবা তার সাথে আল্লাহ একাকার হয়ে যান অথবা এ ধরনের অন্য কোন বাতিল ও ভ্রান্ত ধারণা তার ব্যাপারে পোষণ করা হয়। যেমন, হাদীস শরীফে আছে ঃ "মুশরিকরা হজ্জের তালবিয়া এভাবে পড়ে থাকে– "হাজির আছি হাজির আছি, তোমার কোন শরীক নেই, সেই শরীক ছাড়া যে শরীকের তুমিই মালিক, আর তার মালিকানারও তুমিই মালিক। মূলতঃ মুশরীকেরা সেই শরীকদের সামনে অশেষ বিনয় প্রকাশ করত এবং তাদের সাথে সে সব ব্যাপারই করত যা আল্লাহর সাথে বান্দারা করে থাকে।

এ ধরনের শিরকের কয়েকটি রূপ ও শ্রেণী রয়েছে। শরীয়ত সেসব রূপ ও শ্রেণী নিয়ে আলোচনা করেছে। সেসব শির্ক মানুষ নিয়ত বেঁধেই করে এবং তারা স্বভাবগতভাবেই মুশরিক বলে বিবেচিত। শরীয়ত এসলাহ ও ফাসাদের কারণগুলোকেই এসলাহ্ ও ফাসাদের স্থলাভিষিক্ত করে থাকে।

এক্ষণে আমি সে ব্যাপারগুলোই তুলে ধরব শরীয়তে মোহাম্মদী যেগুলোকে শিরকের স্থান বলে নির্দেশ করে সে ক্ষেত্রে পদচারণা নিষিদ্ধ করেছে। মোটকথা, মুশরিকরা যেহেতু প্রতিমা ও নক্ষত্রকে সিজদা করত তাই শরীয়ত আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করতে নিষেধ করেছে। বরং যে আল্লাহ্ সেগুলো সৃষ্টি করেছেন, তাকেই সিজদা করতে বলা হয়েছে। মূলতঃ সিজদায় কোন বস্তুকে শরীক করা মানেই হচ্ছে আল্লাহর কার্যাবলীতেও তাকে শরীক করা। এদিকে আমি আগেই ইংগিত করে এসেছি।

অবশ্য এ ক্ষেত্রে কোন কোন কালাম শাস্ত্রবিদ যা ধারণা করেছে, তা ঠিক নয়। তারা বলে, আল্লাহ পাকের ইবাদতের বিধানের একটি হল তাওহীদ। তাই বিভিন্ন দ্বীনে ভিন্ন ভিন্ন তাওহীদের ধারণা থাকা সম্ভব। তার জন্যে কোন নিশ্চিত দলীল জরুরী নয়। এটা কি করে হতে পারে? যদি তাই হত তাহলে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যে এটা অপরিহার্য করতেন না যে, সৃষ্টি ও তার পরিচালনার কার্যে কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করবে না। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা ও পালন পরিচালনকর্তা। যেমন, আল্লাহ বলেন ঃ

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى * آللَّهُ خَيْرٌ الخ *

সূরা নামল ঃ আয়াত ৫৯

"তুমি বলে দাও, সব প্রশংসাই আল্লাহর এবং তাঁর সেই বান্দাদের প্রতি সালাম, যাদের তিনি বেছে নিয়েছেন। আল্লাহ কতই উত্তম।" (পরবর্তী ৫ আয়াত।

মূলতঃ সত্য কথা এটাই যে, মুশরিকরা বড় বড় কাজে আল্লাহকেই স্রষ্টা ও কর্মকর্তা ভাবত। তারা এটাও মানত যে, এ সৃষ্টি তার পরিচালন কার্যের জন্যে তিনি ইবাদত পাবার যোগ্য। তাওহীদের তাৎপর্য বর্ণনা

প্রসংগে আমি সেদিকে ইংগিত দিয়েছি। তাই আল্লাহ পাক মুশরিকদের ওপর এ অভিযোগ এনেছেন যে, তারা এ মূল ইবাদতেই অন্যকে শরীক করছে। আল্লাহর জন্যেই চূড়ান্ত দলীল- প্রমাণ।

মুশরিকরা নিজেদের প্রয়োজনাদি, রুগীর আরোগ্য, দরিদ্রের ধনী হওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে গায়রুল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাত। সেজন্যে তাদের নামে মানত করে ভেট দিত ও বিশ্বাস করত যে, এসব মানতের ভেট দিলেই তাদের প্রার্থনা পূর্ণ হবে। তারা বরকতের জন্যে গায়রুল্লাহর নাম ব্যবহার করত। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যে অপরিহার্য করে দিয়েছেন যে, নামাযে তারা এ দোয়া পড়বে–"আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করছি এবং একমাত্র তোমারই সাহায্য কামনা করছি।" অন্যত্র তিনি বলেন–"তাই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেক না।"

তফসীরকারগণ দোয়াকে যে ইবাদত বলেছেন তাহা ঠিক নয়। কারণ, দোয়া হচ্ছে আল্লাহর মদদ চাওয়া। কারণ, আল্লাহই শিখিয়ে দিলেন, " তোমার যা চাওয়ার তা কেবল আল্লাহর কাছেই চাও যেন তিনি তোমাদের সে চাহিদা পূর্ণ করেন।"

এক দল মুশরিক তাদের নির্ধারিত শরীকদের কাউকে আল্লাহর পুত্র ও কাউকে তাঁর কন্যা বলত। তাই তাদের তা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোর আলোচনায় এ ব্যাপারটির রহস্য আমি সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। তারপর একটি ব্যাপার এই যে, তারা তাদের আহ্বার ও রোহ্বান অর্থাৎ, তারা এ বিশ্বাস রাখত যে, তারা যে বস্তুকে হালাল বলবে সেটাই হালাল এবং যে বস্তুকে হারাম বলবে সেটাই হারাম। আর এজন্য তাদের পাকড়াও করা হবে না। এ প্রসংগে আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ *

সূরা তাওবাহ্ ঃ আয়াত ঃ ৩১

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আহ্বার ও রোহবানদের প্রভু বানিয়েছে।"

তখন আ'দী ইবনে হাতিম এ ব্যাপারে রাসূল (সঃ)-এর কাছে জানতে চাইলেন। রাসূল (সঃ) বললেন ঃ এ আহ্বাররা তাদের জন্যে যেসব বস্তু হালাল বলে তারা সেগুলো হালাল মনে করে, আর যেগুলোকে হারাম বলে দেয় সেগুলোকে তারাও হারাম বলে মেনে নেয়।

আসল কথা হল, হালাল-হারাম নির্ধারণের ব্যাপারটি পার্থিব ব্যাপার নয়। এটা আত্মিক জগতের ব্যাপার। সে জগতে এ নির্দেশ জারী হবে যে, অমুক বস্তুর ব্যাপারে জবাবদিহি করা হবে, আর অমুক বস্তুর ব্যাপারে ধরপাকড় হবে না। মূলত এ ঐশী ফরমানই পাকড়াও হওয়া না হওয়ার কারণ। আর এ ক্ষমতা তো আল্লাহ পাকের খাস ব্যাপার! রাসূল (সঃ) কোন কোন বস্তু হালাল কিংবা হারাম করেছেন বলে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, তার যে কোন নির্দেশ এ কথার দলীল যে, মূলত তা আল্লাহর তরফেরই নির্দেশ। অর্থাৎ, তা হালাল বা হারাম করেছেন স্বয়ং আল্লাহ। মুজতাহেদীনরাও হালাল-হারাম নির্ধারণ করেছেন বলে যে কথা রয়েছে তার তাৎপর্য্য হল এই, তারা শরীয়ত প্রণেতার আয়াত থেকেই তা ইজতেহাদ করে বের করে নিয়েছেন, তারা নিজেরা কিছুই নির্ধারণ করেননি।

স্মরণ থাকা দরকার, আল্লাহ পাক যখন তাঁর রাসূলকে পাঠান, মু'জিযার মাধ্যমে তার রিসালাত প্রমাণিত হয়। তখন সেখানে কোন কোন জিনস হারাম ছিল। আল্লাহ পাক তাঁর মুখে সেগুলোকে হালাল ঘোষণা করালেন। তখন কিছু লোকের মনে খটকা দেখা দিল ও সেগুলো হারাম রাখার দিকে তাদের ঝোঁক থেকে গেল। কারণ, পূর্ববর্তী দ্বীনে তা হারাম ছিল। তাদের এ বৈধ কারণকে অস্বীকার ও অবৈধ কারণের দিকে ঝোঁক থাকার দুটো কারণ হতে পারে।

এক–যদি বর্তমান দ্বীন ও শরীয়ত সত্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকা। তাহলে তা এ নবীকে অস্বীকার করা ও তাঁর সাথে কুফরী করার পর্যায়ে চলে যায়।

দুই-- যদি পূর্ববর্তী হারামকে এরূপ হারাম ভাবে যা বাতিল হবার নয়, তা হলেও তা বৈধকরণকে অস্বীকার করা হয়। এরূপ ধারণা সৃষ্টির কারণ এটাই হতে পারে, যিনি তা হারাম করে গেছেন, তিনি আল্লাহর সাথে

একাকার সত্তা বিধায় আল্লাহর এক বান্দার ঘোষিত বিধানের চেয়ে তার ঘোষিত বিধানের গুরুত্ব বেশী। ফলে তা লংঘন করতে গেলে জান-মালের ক্ষতি দেখা দেবে।

নিঃসন্দেহে এরূপ ব্যক্তি মুশরিক। সে গায়রুল্লাহর ভেতরে আল্লাহকে দেখছে এ তার অসন্তোষ থেকে গযবের আশংকা করছে। এমনকি গায়রুল্লাহকে হালাল-হারাম বানাবার মূল অধিকারী ভেবে বসেছে।

শিরকের এও এক পদ্ধতি যে, প্রতিমা ও নক্ষত্রের নৈকট্য লাভের জন্য জীব-জানোয়ার জবাই করে সেগুলোর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা। এ পদ্ধতি মুশরিকরা সে জীব-প্রতিমার জন্যে নির্ধারিত পূজার বেদীতে জবাই করত আর জবাই করার সময়ে প্রতিমার নাম নিত। এ ধরনের শিরকও নিষিদ্ধ হয়েছে।

শিরকের আরেক পদ্ধতি এরূপ ছিল যে, বাহীরা ও সায়েবা নামক উট তারা দেবতার নামে উৎসর্গ করে মুক্ত ভাবে ছেড়ে দিত। এ পদ্ধতি নিষিদ্ধ করে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করলেন, আল্লাহ্ কান কাটা কিংবা মুক্ত ষাঁড়কে তাঁর শরীয়তের বিধান বানাননি।

শিরকের এও এক রূপ ছিল যে, কোন কোন মহান পূর্বপুরুষের নাম খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত এবং তাদের নামে মিথ্যা শপথ নিলে জান-মালের ক্ষতি দেখা দেবে বলে বিশ্বাস করা হত। তাই তারা নিজেদের কায়-কারবারে সে সব নামে শপথ করত। আল্লাহ পাক তাও নিষিদ্ধ করেছেন। নবী করীম (সঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে কসম করল সে শিরক করল।

কোন কোন মুহাদ্দিস তাঁর এ বক্তব্যকে সতর্কতা ও ধমকমূলক বক্তব্য বলে এড়াতে চান। আমি তা বলি না। আমার নিকট উক্ত শপথের তাৎপর্য পূর্বোল্লেখিত আকীদার শপথ! তাই তা শিরক হবে।

শিরকের আরেকটি রূপ হল, গায়রুল্লাহর মাযার, দরগাহ্ বা খানকা যিয়ারত করা। এ যিয়ারতকারীরা ভাবে যে, উক্ত স্থান অত্যন্ত বরকতময়। কারণ, অমুক বুযুর্গের সাথে জড়িত। তাই সেখানে গেলে তার নৈকট্য ও অনুগ্রহ পাওয়া যাবে। এ ধরনের শিরকও নিষিদ্ধ হয়েছে। নবী করীম (সঃ) বলেন--- তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থান যিয়ারতের জন্যে বাহনে উঠবেনা!

শিরকের আরেক রূপ হল, নিজ সন্তানদের নাম দেবতার নামের সাথে জুড়ে রাখা। যেমন, আবদুল উয্যা আব্দুস শামস ইত্যাদি। তাই আল্লাহ পাক বলেন ঃ

هُوَالَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشّٰهَا *

সূরা আ'রাফ ঃ ১৮৯

অর্থাৎ, তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে, তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন যেন সে তাতে তুষ্টি পায়! তারপর যখন সে তাকে ঢেকে নিল .....।

হাদীসে এসেছে, হাওয়া (আঃ) তার সন্তানদের নাম আবদুল হারিস রাখেন এবং তা শয়তানের কুমন্ত্রণা মোতাবেক ছিল। তাছাড়া অসংখ্য হাদীস থেকে প্রমাণ মিলে যে, হুজুর (সঃ) তার সাহাবাদের মধ্যকার আবদুল উয্যা ও আবদুস শামস নাম বদল করে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান রেখেছেন।

এসবই হল শিরকের বিভিন্ন রূপ ও পদ্ধতি। তাই শরীয়ত প্রণেতা একে নিষিদ্ধ করেছেন।

পরিচ্ছেদ ঃ চল্লিশ

আল্লাহর গুণাবলীর ওপর ঈমান

জেনে রাখুন, পুণ্যের সকল শ্রেণীর ভেতর সর্বোচ্চ স্থান হল আল্লাহর গুণাবলীর ওপর ঈমান আনা এবং সেগুলোর সাথে আল্লাহর গুণান্বিত হওয়ার ওপর বিশ্বাস রাখা। কারণ, এ ব্যাপারটি আল্লাহ ও তাঁর বান্দার সম্পর্কের দুয়ার খুলে দেয়। আর এর মাধ্যমেই আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

মনে রাখবেন, কোন জ্ঞানগত ও বস্তুগত জিনিসের সাথে তুলনীয় হওয়া থেকে আল্লাহ পাক মুক্ত ও পবিত্র। কেননা, কোন সৃষ্টি বস্তু ও জীবের যেভাবে গুণ অর্জন হয় বা তার ওপরে গুণ আরোপিত হয় অথবা তার

ভেতরে গুণ প্রবিষ্ট করা হয়, এ ক্ষেত্রে তার কোনটিই প্রযোজ্য নয়। সুতরাং সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি, যুক্তি- প্রমাণ ও উপমা দ্বারা তাঁর গুণাবলীর প্রকাশ বা পরিমাপ চলে না।

অথচ মানুষকে সে গুণাবলী প্রকাশও করতে হবে যেন সে যথাসম্ভব তার দায়িত্ব পূর্ণ করতে পারে। তাই আল্লাহর গুণ দ্বারা তার ফলাফল ও ব্যাপ্তি অর্থ নিতে হবে! তার আদি রূপ বলা সম্ভব নয়! যেমন, রহমত দ্বারা বুঝতে হবে, নিয়ামত প্রদান। যেখানে অন্তরের নম্রতা ও ঝোঁক অর্থ নেয়া যাবে না। সেভাবে সমগ্র সৃষ্টবস্তু আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে আছে বলতে এমন অর্থ নিতে হবে, যা সাধারণ্যে বোধগম্য। যেমন, কোন বাদশাহর কোন শহর নিয়ন্ত্রণে আনা, কারণ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ বুঝাবার জন্যে এর চেয়ে সুন্দর ভাষা ও পদ্ধতি মানুষের থাকতে পারে না। তাঁর ব্যাপারে কোন উপমা উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করলেও তা যথাযথ অর্থে ব্যবহার করা যাবে না! আর এমন উপমা হতে হবে যার পরিচিত অর্থের সাথে উক্ত গুণের মোটামোটি সাযুজ্য রয়েছে। যেমন দরাজ হস্ত বলতে দান-দাক্ষিণ্য বুঝায়। পরন্তু এসব উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে, যেন তা থেকে শ্রোতারা তাঁর গুণের ভেতরে জৈবিক গুণের মিশ্রণ খুঁজে না পায়। কারণ, একই কথার প্রতিক্রিয়া শ্রোতার বিভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই বলতে হবে, আল্লাহ শুনেন ও দেখেন, কিন্তু তিনি স্বাদ নেন ও ছুঁয়ে থাকেন বলা যাবে না। এটাও জরুরী যে, বিভিন্ন অর্থ ও প্রভাবযুক্ত একই শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন, রাযযাক (রুযীদাতা) ও মুসাব্বের (চিত্রশিল্পী)। তেমনি যেসব গুণ আল্লাহ পাকের শান ও মর্যাদার পরিপন্থী ও তাঁর জন্যে অশোভন তা তাঁর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না, ব্যবহার করা চলবে না। তাই বলতে হবে যে, আল্লাহর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন!

সকল ঐশী গ্রন্থ আল্লাহর গুণাবলী প্রকাশের উপরোক্ত রীতি-নীতি ও শর্তাদির সাথে একমত। তারা এ ব্যাপারেও একমত যে, এ পথে অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং এ নিয়ে কোন তর্ক-বিতর্ক চলবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষিত উত্তম যুগত্রয়ের সবাই এ পন্থাই অনুসরণ করে গেছেন। তাদের পরে ইসলামানুসারীদের একটি

দল কোন আয়াতের সমর্থন ও অকাট্ট প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর গুণাবলী, অর্থ ও তাৎপর্য নিয়ে অনুসন্ধান ও বিতর্ক জুড়ে দিল। অথচ রাসূল (সঃ) বলেছেন, সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা কর কিন্তু স্রষ্টা নিয়ে গবেষণা করো না।

আল্লাহ পাকের বাণী ঃ "সব কিছুর শেষ সীমা হল তোমার পালনকর্তা এ প্রসংগে তিনি বলেন, প্রভুকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা চলে না।

মূলতঃ আল্লাহর গুণাবলী সৃষ্টও নয়, নশ্বরও নয়। তাই তা নিয়ে গবেষণা অনাবশ্যক। তা নিয়ে গবেষণা করতে গেলেই প্রশ্ন আসবে, তিনি এ সব গুণে কিভাবে কখন থেকে গুণান্বিত হলেন? তখনই তাঁকে সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার সাথে একাকার করা হয়। ইমাম তিরমিজীর এক হাদীসে আছে, "আল্লাহর হাত ভরপুর।' এ সম্পর্কে হাদীসের ইমামগণ বলেন–আমরা এ হাদীসের উপর সেভাবেই ঈমান রাখি যেভাবে তা বর্ণিত হয়েছে। তার কোন ব্যাখ্যা কিংবা তাতে কোন সংশয় ছাড়াই আমরা ঈমান রাখি। তেমনি সুফিয়ান সাওরী, ইমাম মালিক, ইবনে উয়াইনা ও ইবনে মুবারক বলেন–এ ধরনের কথা যেভাবে যা বর্ণিত আছে, সেভাবেই তার উপর ঈমান রাখি। এ প্রশ্ন তোলা যাবে না যে, তা হল কি ভাবে?

ইমাম তিরমিজী অপর এক স্থানে বলেন–উক্ত গুণাবলী যেভাবে বর্ণিত আছে সেভাবেই উদ্ধৃত করা হবে। এটা কোন সৃষ্টির সাথে তুলনীয় ব্যাপার নয়, তাই এরূপ বলা যাবে না যে, তাঁর শোনা আমাদের শোনার মত এবং তাঁর দেখা আমাদের দেখার মত।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেন ঃ রাসূল (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে এমন কোন বর্ণনা নাই যাতে বুঝা যায় যে, অনুরূপ রূপক বর্ণনা ব্যাখ্যা করা ওয়াজিব কিংবা তা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। এটাও অসম্ভব কথা যে, আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলকে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা মানুষের কাছে প্রচার করতে বলছেন এবং এও বলছেন যে, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, অথচ মুতাশাবিহা বা রূপক শব্দ কিভাবে প্রচার করতে হবে, তার কোন বিধান নেই। তাই মানুষ জানতে পারে না যে, কোন ব্যাপার তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে আর কোনটা করা যাবে না। অথচ হুযুর (সঃ) নিজেও আল্লাহ রাসূলের বাণী প্রচারের ওপর সুস্পষ্ট জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যারা

উপস্থিত আছে তারা অনুপস্থিতদের কাছে কথাগুলো পৌছে দেবে। তাই সহচররা তাঁর বাণী, কাজ, অবস্থা এমনকি সেসব ব্যাপার যা তার সামনে সংঘটিত হয়েছে তা সবই যথাযথভাবে পরবর্তী উম্মতের কাছে পৌছে দিয়েছেন। সুতরাং তা থেকে এটাও জানা গেছে যে, এটা এজমায়ে উম্মত হিসাবে চলে আসছে যে, মুতাশাবিহা বা রূপক আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ যা বুঝাতে চেয়েছেন তার ওপর ঈমান রাখা চাই। কারণ, সৃষ্টির সাথে কোনরূপ তুলনা থেকে তাঁকে পবিত্র রাখা অপরিহার্য। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

সূরা শূরা ঃ ১১

অর্থাৎ তাঁর তুলনা তিনি নিজেই, অন্য কিছুই নয়!

আমি বলছি, শ্রবণ, দর্শন, ক্ষমতা, হাসি, কথাবলা, সমাসীন হওয়া ইত্যাদির মধ্যে কোন তারতম্য নেই। কারণ, ভাষাবিদ মাত্রই এসব শব্দের অর্থ এরূপ নিয়ে থাকেন, যা আল্লাহ পাকের জন্য কোন ভাবেই উপযোগী নয়। হাসি তার জন্যে এ কারণে অসম্ভব ব্যাপার যে, তার জন্যে বিশেষ ধরনের মুখ প্রয়োজন। তেমনি কথার জন্যেও মুখ চাই এবং ধরা ও চলার জন্যে বিশেষ গড়নের হাত-পা চাই। শোনা ও দেখার ব্যাপারটিও তদ্রূপ। তাতে কান ও চোখ প্রয়োজন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এসব চিন্তা ও ভাবনাকারীরা মুহাদ্দিসদের সমালোচনা করেছেন। তারা তাঁদের সম্পর্কে বলে থাকেন যে, তাঁরা মূলতঃ দেহবাদী ও উপমাবাদী, কিন্তু তাঁরা তা গোপন রাখে।

আমার কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তাদের এ সমালোচনা অর্থহীন। সব ধরনের বর্ণনা ও তাৎপর্যের আলোকে তাদের সমালোচনা ভ্রান্তিপূর্ণ। হেদায়েতের ইমাম মুহাদ্দিসদের ওপর অপবাদ দেয়ার কাজটি ভ্রান্ত কাজ। তার ব্যাখ্যায় দুটো অবস্থা রয়েছে।

১। আল্লাহ পাক এসব গুণাবলীর সাথে কিভাবে গুণান্বিত হলেন? এ গুণাবলী কি তাঁর ব্যক্তিসত্তার বাহনের অতিরিক্ত কিছু, না মৌল সত্তার

অংশ? তাঁর শ্রবণ, দর্শন ও কথোপকথন ইত্যাদির তাৎপর্য কি? কারণ,সাধারণ অভিমত অনুসারে সেসব শব্দ তার ক্ষেত্রে শোভন নয়। এ ক্ষেত্রে সত্য কথা এটাই যে, হুযুর (সঃ) এ ব্যাপারে কিছু বলেননি। পরন্তু উম্মতকে তিনি এ ব্যাপারে মুখ খুলতে ও বিতর্ক তুলতে নিষেধ করেছেন। তাই হুযুর (সঃ) যা নিষেধ করেছেন সে ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার কারো অধিকার নেই।

২। শরীয়তে এমন কোন জিনিস রয়েছে যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার গুণ প্রকাশ করা যায় আর কোন জিনিস দ্বারা তাঁর গুণ প্রকাশ বৈধ নয়।

সত্য কথা এই যে, তাঁর গুণ ও নামসমূহ তাওফিকী বা শর্ত সাপেক্ষ। অর্থাৎ, অবশ্য আমরা সেই রীতি-নীতি বুঝি যার ওপর আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর বর্ণনার বুনিয়াদ রাখা হয়েছে। এ অধ্যায়ের শুরুতে আমি সেগুলো বর্ণনা করে এসেছি। অধিকাংশের ধারণা, যদি গুণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা বৈধ রাখা হয়, তাহলে যে বৈধ করবে সে গোমরাহ হবে এবং অন্যদেরও গোমরাহ বানাবে। অবশ্য এমন কতক বিশেষণ রয়েছে যদ্দারা আল্লাহর গুণ বর্ণনা করা মূলতঃ বৈধ। কিন্তু কাফেররা সে বিশেষণগুলো অপাত্রে ব্যবহার করে তা জনসাধারণে সেভাবেই খ্যাত করে ফেলেছে। ফলে শরীয়ত ক্ষতিকর দিক এড়াবার জন্য তা ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। তেমনি কিছু বিশেষণ আছে, যা প্রকাশ্য অর্থে ব্যবহার করা গেলেও ব্যবহারিক অর্থে ভুল বুঝার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তা ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। এসব কারণেই শরীয়ত তাঁর গুণাবলী ও নামসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা অবৈধ করেছে।

মোটকথা হাসি, খুশী, উৎফুল্লতা, অসন্তোষ ও সন্তুষ্টি শব্দ আল্লাহর শানে ব্যবহার করা চলে। তবে কান্না ও ভয় ইত্যাকার শব্দ ব্যবহার করা চলে না। যদিও উভয় শ্রেণীর অনুভূতির উৎস প্রায় একই। আমাদের তাহকীক মতে প্রমাণ ও জ্ঞান দ্বারা এটা সমর্থিত হয়। এর ধারে-কাছেও বাতিলের অস্তিত্ব নেই। উক্ত চিন্তা-ভাবনাকারী দলের মতামত ও যুক্তিতর্কের আলোচনা অন্যত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষণে সেই গুণাবলীর বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য এমন ভাবে করা দরকার যা তাদের বক্তব্য থেকে অধিকতর উপযোগী ও কাছাকাছি।

কারণ, এসব অর্থ কোন দলীল-প্রমাণ দ্বারা নির্ধারিত নয়। তা মেনে নেয়ার জন্য কাউকে বাধ্য করা চলে না। তেমনি ভাবে অন্য ব্যাখ্যার ওপর প্রাধান্য দেয়ারও উপায় নেই। তেমনি এক ব্যাখ্যা অপর ব্যাখ্যার ওপর মর্যাদা দাবী করতে পারে না। তেমনি এ ব্যাখ্যাকে আল্লাহ নির্দেশিত ব্যাখ্যা বলেও দাবী করা যায় না। এটাও বলার উপায় নেই যে, এ ব্যাখ্যার ওপর উম্মতের ইজমা হয়েছে। এখন আমি বলছিঃ আমাদের সামনে তিন শ্রেণীর অস্তিত্ব রয়েছে। জীবন্ত, মৃত ও এ দুয়ের বহির্ভূত জড় পদার্থ। এ তিনের ভেতরে জীবন্তই সজ্ঞান। তাই সৃষ্টির ভেতরে তা প্রভাবশালী। এ কারণেই আল্লাহর সাথে তার সাজুয্য রয়েছে, তাই তাঁর নাম "হাই" হওয়া অপরিহার্য, তার অর্থ জীবন্ত। তেমনি যেহেতু আমাদের কাছে ইলম বা জ্ঞানই সব রহস্যের আঁধার বিলুপ্ত করে সব কিছু আমাদের সামনে উজ্জ্বল করে তুলে ধরে। আল্লাহর কাছে সব কিছুই যেহেতু উজ্জ্বল হয়ে আছে এবং শুরুতেই সামষ্টিক ভাবে ও পরে সবিস্তারে বিদ্যমান রয়েছে, তাই তাঁর নাম "আলীম" বা সর্বজ্ঞ রাখা অপরিহার্য। তেমনি দেখা-শোনার দ্বারা সব কিছুর জ্ঞান যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন তাঁর নাম "সামিউন" ও "বাসীরুন" রাখা জরুরী। তেমনি আমরা যখন বলি, অমুক ব্যক্তি অমুক কাজ করার ইচ্ছা করেছে, তখন এ কথাই বুঝিয়ে থাকি যে, সে ব্যক্তি সে কাজ করা বা না করার ইচ্ছা পোষণকারী হতে পারে। আল্লাহ পাক যেহেতু অনেক কাজ কোন শর্ত পূরণ হলে কিংবা সৃষ্টি জগতে তার শর্ত ও উপযোগীতা দেখা দিলে করে থাকেন, ফলে যা হওয়া আগে জরুরী ছিল না তা শর্ত ও উপযোগীতা দেখা দেয়ায় জরুরী হয়ে থাকে, কখনও তাঁর অনুমতি ও নির্দেশক্রমে কোন কাজে মতৈক্য সৃষ্টি হয়, যা আগে মতানৈক্যের ব্যাপার ছিল, তাই তাঁর নাম 'মুরীদ" বা ইচ্ছা পোষণকারী।

তেমনি যেহেতু তিনি আদিতেই অনেক কিছুর সামষ্টিক ইচ্ছা পোষণ করে রেখেছেন যা দিনের পর দিন যথাক্রমে প্রকাশ পেয়ে চলছে, তাই প্রতিটি ঘটনাকেই স্বতন্ত্র রূপ দিয়ে বলা যায় যে, তিনি ইচ্ছা করায় এ ঘটনা ঘটছে।

তেমনি যখন আমরা বলি অমুক ব্যক্তি ক্ষমতাবান, তখন আমরা এ অর্থই বুঝিয়ে থাকি যে, সে ব্যক্তি কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে এবং

কোন বাহ্যিক প্রতিকূলতা তাকে সে কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারে না। তারপর যদি ক্ষমতাবান তার ক্ষমতাধীন কাজের একটি করে অপরটি না করে, তা হলে বলা যায় না যে, সেটা করার সে ক্ষমতা রাখে না। এটা সুস্পষ্ট কথা যে আল্লাহ সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন। তবে নিজ অনুগ্রহে ও ইচ্ছানুসারে তিনি এক কাজের ওপর অন্য কাজকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাই এটা জরুরী হয়ে দাঁড়ায় যে তাঁর নাম হবে "কাদের।"

তেমনি আমরা যখন বলি, অমুক অমুকের সাথে কথা বলেছে তখন আমরা এটাই বুঝিয়ে থাকি যে, সে নিশ্চয়ই কোন অর্থপূর্ণ কথা বলেছে। রাহমানুর রাহীম অনেক সময় বান্দার ওপর ইলমের তুফান সৃষ্টি করেন। কখনও আবার এমন জ্ঞান অবতীর্ণ করেন যা বান্দার বোধগম্য হয়। ফলে তা বান্দার জন্য অর্থবহ করা হয়ে থাকে। এ কারণেই জরুরী হল যে, তাঁর নাম হবে "মুতাকাল্লিম" বা প্রবক্তা। তাই আল্লাহ বলেন ঃ-

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ *

সূরা শূরাঃ আয়াত ৫১

অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে (সরাসরি) কথা বলার ক্ষমতা কারো নেই, হ্যাঁ, তিনি ওহীর মাধ্যমে কিংবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা কোন ফেরেশতার মাধ্যমে ওহী নাযিল করে যা চান বলে থাকেন। নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ স্তরের মহা কুশলী।

মূলতঃ ওহী হচ্ছে কখনও বা কারো অন্তরে তন্দ্রাযোগে কোন কথা ঢেলে দেয়া। তেমনি কখনও বা আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট মনে ধ্যানকারীর অন্তরে জাগ্রত ভাবেই প্রয়োজনীয় জ্ঞান উপস্থিত হওয়া। পর্দার পেছন থেকে শোনার তাৎপর্য এই যে, সে অদৃশ্য থেকে ক্রমাগত সুবিন্যস্ত কথা শুনতে পায় অথচ বক্তাকে দেখতে পায় না। কিংবা তিনি কোন বাণীবাহক পাঠান এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সামনে ফেরেশতা এসে সশরীরে হাজির হন। কখনও আল্লাহর দিকে ধ্যানমগ্ন অর্ধ চেতন অবস্থায় ঘন্টার আওয়াজের মত কথা

শুনা যায়, এ যেন অর্ধচেতন অবস্থায় চোখে লাল-নীল রং দেখা।

যখন হাদিরাতুল কুদস বা পবিত্র দরবারের নির্ধারিত নেযাম মানব জগতে কায়েম করা উদ্দেশ্য হয়, তখন যে ব্যক্তি তা অনুসরণ করে সে সর্বোচ্চ পরিষদের সাথে সংযুক্ত হয়। তখন আল্লাহ তাকে আঁধার থেকে উদ্ধার করে আলোর জগতে নিয়ে আসেন এবং তাঁর প্রশস্ততার আশ্রয়ে তাকে ঠাঁই দেন। ফলে রহমতের দ্বার তার জন্যে অবারিত হয়। ফেরেশতা ও মানব কুলে ইলকা হয়ে যায় যে, তার সাথে সবাই সুসম্পর্ক রাখবে। তেমনি কেউ যদি সে বিধানের বিরোধিতা করে, তাহলে তাকে সর্বোচ্চ পরিষদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় এবং উক্ত পরিষদের অসন্তোষের কারণে তার ওপর দুর্যোগ নেমে আসে। অতঃপর পূর্বোল্লেখিত পদ্ধতিতে তার শাস্তি হয়ে থাকে। এ কারণেই এটা জরুরী হয়ে দাঁড়ায় যে, আল্লাহর সন্তোষ ও অসন্তোষের ভিত্তিতে পুরস্কার ও শাস্তি এসে থাকে। এসব কিছুর মূল সূত্র হল সৃষ্টিজগতের উদ্দেশ্য মোতাবেক চলা বা না চলা। তাই বলা যায়, যদি বিধানদাতার মর্জি রক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতে পরিবেশ সৃষ্টি করে দোয়া করা হয়, তাহলে তা স্বভাবতঃই কবুল হয়।

রুইয়াত বা দেখা অর্থ হল কোন কিছু সুস্পষ্টভাবে কারো সামনে প্রকাশ পাওয়া। তাই মানুষ যখন পরকালে সেসব জিনিসের সামনে হাজির হবে যেগুলো সম্পর্কে তাদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, তখন মেছালী দুনিয়ার মাধ্যমে তার দৃষ্টিতে তাজাল্লী সৃষ্টি হবে। তখন সবাই আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখবে এবং তখনই বাণী বাস্তবায়িত হবে। 'শীঘ্রই তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে যেভাবে তোমরা চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে পাও।'

পরিচ্ছেদ ঃ একচল্লিশ

॥ তাকদীরে বিশ্বাস ॥

পুণ্যের শ্রেণীসমূহের ভেতরে তাকদীরের ওপর ঈমান রাখা বড় স্তরের পুণ্য। কারণ, এর মাধ্যমে মানুষ গোটা সৃষ্টি জগতের নিয়ন্তা একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি তাকদীরের ফয়সালার ওপর যথাযথ ভাবে বিশ্বাস রাখে, তার দৃষ্টি সর্বতোভাবে সেদিকেই নিবদ্ধ

থাকে যা কিছু আল্লাহর কাছে রয়েছে। সে গোটা দুনিয়া ও তার তাবৎ সম্পদকে সেই অমূল্য সম্পদের অন্তরায় ও পরিপন্থী মনে করে। আল্লাহর ফয়সালার সামনে বান্দার ক্ষমতাকে সে আয়নায় প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মতই অস্তিত্বহীন মনে করে। তাকদীরে বিশ্বাসের ফলে সে পার্থিব জীবনে আল্লাহর একক ব্যবস্থার জ্ঞান অর্জন করে থাকে। অবশ্য এ সম্পর্কিত পূর্ণ জ্ঞান সে পরকালেই অর্জন করবে।

রাসূল (সঃ) তাকদীরের গুরুত্ব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন–

যে ব্যক্তি কল্যাণ-অকল্যাণের তাকদীরের ওপর বিশ্বাসী নয়, আমার সাথে তার সম্পর্ক নেই। তিনি আরও বলেন–কোন মানুষ কল্যাণ-অকল্যাণের তাকদীরে বিশ্বাস ছাড়া মোমেনই হতে পারে না। তেমনি মোমেন হতে পারে না যতক্ষণ সে এ বিশ্বাস না রাখবে যে, যা কিছু তার ব্যাপারে ঘটার তা ঘটবেই এবং যা তার জন্যে ঘটার নয় তা কখনও ঘটবে না।

জেনে রাখুন, আল্লাহ পাকের আদি জ্ঞানে, জন্ম নেয়া বা না নেয়ার প্রতিটি ব্যক্তির সব কিছু বিধৃত রয়েছে। এটা কখনও হতে পারে না যে, এমন কোন কিছু সৃষ্টি হয়েছে যা তিনি জানেন না। এমন ঘটনা কারো মনে দেখা দিলে সেটা হবে অজ্ঞতা, সেটাকে জ্ঞান বলা যায় না। এ প্রশ্নটি হল ইলম বা জ্ঞানের সামগ্রিকতা সংশ্লিষ্ট, তাকদীর সম্পর্কিত নয়। কোন ইসলামী ফেকাহ্‌ই এ ব্যাপারে মতানৈক্য পোষণ করে না।

উল্লেখিত হাদীস থেকে যে তাকদীরের গুরুত্ব জানা যায়, পূর্বসুরী নেক্‌কারগণ যে তাকদীরে বিশ্বাসী ছিলেন, এবং মুহাক্কিকবৃন্দ যে তাকদীর সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করছেন, সে তাকদীর সম্পর্কে এ প্রশ্ন তোলা হয় যে, কাউকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে তা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অবস্থা যদি তাই হয়, তাহলে কাজ-কর্মের কি প্রয়োজন? তাকদীর তো অপরিহার্য, যে কোন ঘটনা ঘটার বহু আগেই তা ঘটবে বলে নির্ধারিত হয়ে আছে। তা আগে থেকেই অপরিহার্য করে রাখা হয়েছে বলেই তো ঘটছে। তা থেকে না কেউ পালাতে পারে, না তা কেউ ঠেকাতে পারে, এ তাকদীর পাঁচবার ঘটেছে।

এক, আদিতে আল্লাহ পাক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, সৃষ্টি জগতকে প্রয়োজন মোতাবেক এরূপ উত্তমভাবে সৃষ্টি করা হবে, যাতে সর্ববিধ প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা থাকবে এবং তার অস্তিত্ব লাভের সময় তার যাবতীয় বাড়তি সৌন্দর্য সৃষ্টির উপযোগিতাও প্রদত্ত হবে। এ জন্যে আল্লাহ তাআলা সর্ববিধ পরিকল্পনার ভেতর থেকে একটি পরিকল্পনা নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন যেন অন্যকোন পরিকল্পনা সে ক্ষেত্রে ঠাঁই না পায়। তেমনি সেখানকার ঘটনাপ্রবাহকে এমন ভাবে বিন্যস্ত করেছেন যেন তা একটি সুসংবদ্ধ একক ব্যাপার আর তাতে আধিক্যের কোন অবকাশ নেই। এভাবে সর্বজ্ঞ আল্লাহ পাকের সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব দানের ইচ্ছাটাই সৃষ্টি জগতের সর্ব ঘটনা প্রবাহের শেষ ঘটনাটি পর্যন্ত ঘটে যাওয়া।

দুই, আল্লাহ পাক সব কিছুর পরিমাণ আদি থেকেই সুপরিজ্ঞাত। বর্ণিত আছে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সকল সৃষ্টির সংখ্যা ও পরিমাণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তা এভাবে যে, তাঁর আদি অনুগ্রহ মোতাবেক সকল সৃষ্ট বস্তুকে আরশের অস্তিত্বের আওতায় সন্নিবেশিত করেছেন। সেখানে তিনি সব কিছুর নমুনা সৃষ্টি করেছেন। শরীয়তের পরিভাষায় সেটাকে বলা হয় যিক্‌র। যেমন, যেখানে তিনি মোহাম্মদ (সঃ)-এর নমুনা চিত্রিত করে নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, তাকে অমুক সময়ে মানব জাতির কাছে পাঠানো হবে এবং তিনি তাদের খোদায়ী বিধান অবহিত করবেন। তাছাড়া আবু লাহাব তাকে অস্বীকার করবে ও তার পাপ তাকে দুনিয়ায়ই গ্রেপ্তার করবে এবং আখেরাতে তাকে আগুন ঘিরে রাখবে ইত্যাদি, তখনই সেখানে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ঠিক এভাবেই পৃথিবীর ঘটনা প্রবাহের প্রতিটি ব্যাপার সেখানে নির্ধারিত হয়ে আছে, আর সে কারণেই তা সেভাবেই ঘটে থাকে। আমাদের যেমন ধারণা যে, দেয়ালের ওপর রাখা কাষ্ঠটি স্থির হয়ে থাকার সুযোগ না থাকায় ফসকে পড়েছে এবং ভূমির ওপর রাখলে তা ফসকাত না, এও তেমনি ব্যাপার।

তিন, আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)-কে মানব জাতির পিতা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকেই মানব জাতির সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। তাই মেছালী-দুনিয়ায় তিনি তাঁর প্রতিটি বংশধরের নমুনা সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের পাপ-পুণ্য কাজের ভিত্তিতে এক দলকে আঁধার পূর্ণ ও এক

দলকে আলোকময় করে সেখানে প্রকাশ করেছেন। অতঃপর তাদের সবাইকে জবাবদিহি হওয়ার উপযোগী করে দায়িত্বশীল করে বানিয়েছেন। তাদের ভেতর তাঁর ইবাদত ও মা'রিফতের যোগ্যতা দিয়ে দিয়েছেন। তার ফলেই তারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করে এসেছেন, তাকে প্রভু বলে মেনে চলার। তাদের জবাবদিহির কারণ এটাই। অবশ্য তারা তা ভুলে গেছে। আজকের জগতে যারাই বিদ্যমান, তারা সবাই সেই নমুনা জগতের সৃষ্ট মানুষেরই বাস্তব রূপ। সুতরাং সেখানে তাদের যার ভেতর যে বস্তু রাখা হয়েছে সেটাই তো আজ বাস্তবায়িত হয়ে চলছে।

চার–যখন মাতৃগর্ভে বাচ্চার প্রাণ ফুঁকে দেয়া হয়, সে প্রাণ তার নির্ধারিত ঘটনাপ্রবাহ নিয়েই দেহে প্রবিষ্ট হয়। যে ব্যক্তি কোন বৃক্ষের বীজ বপন করে সে ব্যক্তি বিজ্ঞ হলে বীজ, মাটি ও আবহাওয়া যাচাই করে বলে দিতে পারে যে, গাছটি কিরূপ সতেজ কিম্বা শুকনা হবে। তেমনি যে ফেরেশতা বাচ্চার দেহে প্রাণ ফুঁকে দেয় সে তার পরিস্থিতি-পরিবেশ থেকে জানতে পারে যে, এ লোকটি কি ধরনের রুযী-রোযগার করবে আর কি সব কাজ-কারবার করবে। সে এও জানতে পায়, তার ভেতর কি জৈব প্রকৃতি সবল হবে, না ফেরেশতা খাসলত জয়ী হবে। ফলে এটাও সে ফেরেশতা বুঝে নেয় যে, সে ব্যক্তি নেককার হবে, না বদকার হবে।

পাঁচ-ঘটনাপ্রবাহ ঘটার আগেই তা নির্ধারিত হয়ে আছে। মূলতঃ পবিত্র দরবারে রক্ষিত নমুনার জগতে পয়লা ঘটনাটি চিত্রিত হয়। তারপর পৃথিবীতে তার ব্যবস্থাপনা চালু হয়ে যায়, এবং সে ঘটনাটি প্রকাশ পেয়ে থাকে।

আমি বারংবার এ ব্যাপারটি দেখেছি যে, একদল লোক পরস্পর লড়াই করছিল। তাদের ভেতর সংকীর্ণতা ও হিংসা জন্ম নিল। আমি আল্লাহ পাকের কাছে এ ব্যাপারে আবেদন জানালাম। তখন আমি দেখতে পেলাম, পবিত্র দরবার থেকে পৃথিবী পর্যন্ত একটি নূরানী রেখা দেখা দিল ও আস্তে আস্তে তা সম্প্রসারিত হয়ে চলল। তারপর যতদূর তা ছড়াল,ততদূর পর্যন্ত হিংসা সংকীর্ণতা বিলুপ্ত হল। আমার মজলিস খতম হবার আগেই তারা পরস্পর মিলে-মিশে গেল এবং হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে পূর্বেকার মিল-মহব্বতের জীবনে ফিরে গেল।

আমার কাছে এটা আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর অপার লীলার এক নিদর্শন বৈ নয়। একবার আমার ছেলে অসুস্থ হল। আমার মন সেদিকে নিবিষ্ট ছিল। তারপর জোহর নামায পড়ার অবস্থায় আমি দেখলাম, তার মৃত্যু এসে গেছে! শেষ পর্যন্ত সে রাতেই তার মৃত্যু হল। এ থেকে এটা সুস্পষ্ট হল যে, পৃথিবীতে যা ঘটে, তা ঘটার আগে আল্লাহ্ তাআলা সে ঘটনা সৃষ্টি করেন। তারপর তা পৃথিবীতে এসে সেভাবেই রূপ লাভ করে যেভাবে আল্লাহ পাক তাকে রূপ দিয়েছেন। এ ভাবেই তিনি অনস্তিত্বকে অস্তিত্বে ও অস্তিত্বকে অনস্তিত্বে রূপান্তরিত করে থাকেন। আল্লাহ্ বলেন–

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتٰبِ *

সুরা রা'দঃ আয়াত ৩৯

অর্থাৎ, আল্লাহ যা চান বিলুপ্ত করেন ও যা চান কায়েম করেন, তাঁর কাছে (সব কিছু লিপিবদ্ধ করা) মূল গ্রন্থ রয়েছে।

যেমন, আল্লাহ পাক কোন এক ধরনের বিপদ সৃষ্টি করেন। তারপর সেটাকে কোন বিপদযোগ্য ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ করার উপক্রম করেন। তখন যদি তার তরফ থেকে তওবা ও দোয়া উর্ধ্ব জগতে পৌছে যায় সে বিপদ তিনি রহিত করেন। তেমনি কখনও তিনি কারো জন্যে মৃত্যু সৃষ্টি করেন। কিন্তু এদিক থেকে তার বিশেষ কোন পুণ্য উর্ধ্ব জগতে পৌছে যায়। তখন আল্লাহ পাক সে মৃত্যু রদ করেন।

এর ভেতর রহস্য হল এই যে, উপর থেকে সৃষ্টি হয়ে যেটা আসে তা ঘটনাটি ঘটার একটি কারণ হয়ে আসে। যেমন, খানা-পিনা বেঁচে থাকার কারণ হয়। তেমনি বিষ পান বা তরবারির আঘাত মৃত্যুর কারণ হয়। বহু হাদীসে প্রমাণ মিলে যে, এমন এক জগত রয়েছে যেখানে কার্যকারণ রূপ লাভ করে। তারপর তাদের উদ্দিষ্ট বস্তু সংযুক্ত হয় এবং পৃথিবীতে তা বাস্তব হয়ে দেখা দেয়। যেমন, রহমত আরশে চলে যাওয়া, বৃষ্টির ফোঁটার মত ...খিল হওয়া, সিদরাতুল মুন্তাহার তলদেশ থেকে নীল ও ফোরাত ...সারিত হওয়া, ও তা পরে পৃথিবীতে প্রবাহিত হওয়া, লোহা ও

চতুষ্পদ জন্তুর পৃথিবীতে অবতরণ, সমগ্র কোরআন পয়লা আসমানে নাযিল করা, হুযুর (সঃ)-এর সামনে এবং তাঁর ও মসজিদের দেয়ালের মাঝখানে জান্নাতের উত্তাপ অনুভূত হওয়ার মত অবস্থান নিয়ে দোযখের উপস্থিত হওয়া, বিপদ ও দোয়ার পারস্পরিক লড়াই, আদম সন্তান ও বুদ্ধি সৃষ্টি করা, তারপর বুদ্ধির একবার অগ্রসর হওয়া ও আরেকবার পিছিয়ে যাওয়া, সূরা বাক্বারা ও সূরা-আলে ইমরানের দুই ঝাঁক পাখীর রূপ নিয়ে প্রকাশ পাওয়া, আমলের পরিমাপ হওয়া, জান্নাত তার অনভিপ্রেত জিনিসে ও দোযখ তার অভিপ্রেত জিনিসে পূর্ণ হওয়া ইত্যাকার এরূপ বহু উদাহরণ হাদীসের সাধারণ পারদর্শীর কাছেও গোপন নয়।

জেনে রাখুন, তাকদীর কখনও কার্যকারণের পৃথিবীর নিয়ম-নীতির অন্তরায় নয়। কারণ, তাকদীরের সম্পর্ক হল সেই সামগ্রিক ব্যবস্থার সাথে যা একবার করে রাখা হয়েছে। হুযুর (সঃ)-এর একটি বক্তব্যের এটাই তাৎপর্য। যখন তাঁর কাছে ঝাড়ফুঁক, ওষুধ-পত্তর ব্যবহার করা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হল যে, এসব কি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের পরিবর্তন ঘটাতে পারবে? তিনি জবাব দিলেন, এ ঝাড়ফুঁক ও ওষুধ-পত্তরও আল্লাহর নির্ধারিত তকদীর।

হযরত উমর ফারূক (রাঃ)-এর বক্তব্য থেকেও এ তাৎপর্য মেলে। তিনি সরস এলাকার সতেজ ঘাসের ক্ষেতে উট চরাবার প্রশ্নে বলেছিলেন–এটা কি ঠিক নয় যে, তোমরা উট কোন সবুজ সতেজ ঘাসের মাঠে চরাও তাহলে সেটাই উটের তাকদীর?

মূলতঃ বান্দার নিজ কাজের স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু সে স্বাধীনতায় তার কিছু করার থাকে না। কারণ, উদ্দিষ্ট বস্তুর নকশা ও তার ফায়দা অন্তরে জাগরূক হওয়া ও তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার ইচ্ছা পোষণ করায় এ স্বাধীনতা জন্ম নেয়। অথচ তা কিভাবে হল সে খবর বান্দার নেই। তাহলে স্বাধীনতা কোথায়? হুযুর (সঃ) সেদিকে ইংগিত করেই বলেছেন, "অন্তর তো আল্লাহর দু'আংগুলের ফাঁকে অবস্থান করছে। তিনি যেদিকে ইচ্ছা করেন সেদিকেই সেগুলো ফিরে থাকে।"

পরিচ্ছেদঃ বিয়াল্লিশ

॥ ইবাদতের উপর ঈমান ॥

স্মরণ রাখবেন, পুণ্যের শ্রেষ্ঠতম কাজ হচ্ছে এই, মানুষ পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে এ আকীদা পোষণ করবে, এমন কি এ বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন ভাবনাই আসবে না যে, ইবাদত মূলতঃ বান্দার ওপর আল্লাহর হক এবং অন্যান্য হকদাররা যেভাবে নিজ নিজ হক দাবী করে থাকে ঠিক তেমনি আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে বান্দার কাছে ইবাদত দাবী করা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়ালাইহে অসাল্লাম হযরত মা'আজ (রাঃ)-কে বলেন- "হে মা'আজ! জান কি বান্দার ওপর আল্লাহর কি হক রয়েছে? তেমনি আল্লাহর উপরই বা বান্দার কি হক আছে? মা'আজ (রাঃ) জবাব দিলেন, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল তা ভাল জানেন। হুযুর (সঃ) তখন বললেন, "বান্দার ওপর আল্লাহর হক হচ্ছে বান্দা আল্লাহরই ইবাদত করবে আর আল্লাহর সাথে কোন প্রকার শিরক করবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহর ওপর বান্দার হক হল, যে বান্দা তাঁর সাথে কোন শরীক করবে না, তাকে তিনি শাস্তি দেবেন না।

তার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি অনুরূপ মজবুত আকীদা না রাখবে তার এরূপ ধারণা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে যে, মানুষের তো কিছুই করার নেই। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই হয় এবং সব কাজের তিনিই মালিক মোখতার। তাই তার কাছে না তিনি ইবাদতের দাবীদার, আর না তিনি সেজন্যে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মূলতঃ এ ধরনের আকীদা পোষণকারী নাস্তিক। যদিও সে বাহ্যত ইবাদত করে থাকে, কিন্তু সে ইবাদত তার ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না। তাই তার ইবাদত আদৌ আন্তরিক হবে না। এ কারণেই তার ও তার প্রতিপালকের সাথে কোন সম্পর্ক সৃষ্টি হবে না। তখন তাঁর অন্যান্য পার্থিব অভ্যাসের মত এটাও একটা অভ্যাস মাত্র হয়ে দাঁড়াবে।

এক্ষেত্রে আসল ব্যাপার এই যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাঁদের ওয়ারিশদের জ্ঞান ও আত্মিক সাধনার মাধ্যমে এ সত্যটি সুপ্রমাণিত যে, বাধ্যতামূলক জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ভেতর একটা ক্ষেত্র এরূপ যেখানে

ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সাক্রিয় রয়েছে। এক্ষেত্রে আসল কথা হচ্ছে এই, আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাঁর ওয়ারিশদের জ্ঞানে এ সত্যটি প্রতিভাত হয়েছে য, অপরিহার্য বিধানের জগতেও এমন একটি ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে ইচ্ছা ও অভিলাষ অর্থাৎ, কোন কিছু করা বা না করার অনুমোদন রয়েছে। অথচ উর্ধ্ব জগতের কল্যাণকর বিধানে এরূপ ঝুলন্ত কোন ব্যাপার নেই। সেখানে হয় করা অপরিহার্য, অন্যথায় না করা অপরিহার্য হবে!

যেসব দার্শনিক বলে থাকেন যে, ইচ্ছার ভেতরেও কিছু করা বা না করার সিদ্ধান্ত নিহিত থাকে, তারা কিছু জিনিস আয়ত্ত করেছেন ও অনেক জিনিস তাদের কাছে ধরা দেয়নি। অপরিহার্যতার জগতের সেই বিশেষ ক্ষেত্রটি তাদের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। তাই ঐশী ও জড়জগতের বিধানে সূক্ষ্ম পার্থক্য তাদের কাছে ধরা পড়েনি। কারণ, সেই বিশেষ ক্ষেত্রের কোন পথ প্রদর্শক তাদের নেই। সে ক্ষেত্রটি শ্রেষ্ঠতম তাজাল্লী ও উচ্চতম পরিষদের মাঝখানে রয়েছে। সূর্য ও কিরণের মাঝখানে যে সম্পর্ক রয়েছে এও ঠিক তাই।

তাদের পথে অন্তরায় হচ্ছে এটাই যে, তাদের এমন কোন পথপ্রদর্শক নেই যা' 'মালা-এ-আ'লা ও তাজাল্লীয়ে আজমের মধ্যবর্তী যোগসূত্রের মত যোগাযোগের কাজ দেবে। ওয়া'লিল্লাহিল মাসালুল আলা (সর্বোচ্চ উপমা তো শুধু আল্লাহর জন্য)। বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে ক্রিয়া ও নিষ্ক্রিয়ার ব্যাপারটি একই ছিল।

উক্ত দার্শনিকদের জবাবে আমাদের দলীল হল এই যে, আমাদের সকলেই এ কথাটি সুস্পষ্টভাবে জানে যে, যখন কোন লোক হাত বাড়ায় ও কলম ধরে তখন সে ইচ্ছা করে ও সক্রিয় হয়। তার এ ইচ্ছা ও সক্রিয়তা বিবেচনায় তার করা বা না করার অধিকার সমানই থাকে। অথচ ওপরওয়ালার করা বা না করার ব্যাপারটি অপরিহার্য হয়ে থাকে। এ অবস্থাই সে সব ব্যাপারে বুঝে নাও যার কারণে বিভিন্ন যোগ্যতা জন্ম নেয়। বস্তুতঃ অবস্থা সৃষ্টিকারীর তরফ থেকে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হয় যা সৃষ্টি হওয়ার উপাদান ও যোগ্যতা বস্তুর ভেতর রয়েছে। যেমন, দোয়া করলে তা কবুল হওয়া। এ কবুল বস্তুটি সৃষ্টি হওয়ার পেছনে দোয়ার কোন না কোন ভাবে হাত রয়েছে। তুমি হয়ত বলবে যে, কোন কিছু হওয়ার ব্যাপারে যে

উভয় দিকের সম্ভাবনাকে আমরা সমান ভেবে থাকি, তা তো ওপরওয়ালার অপরিহার্য সিদ্ধান্তটি না জানার কারণে। তাহলে উভয় দিকের সমান সম্ভাবনা ভাবার জ্ঞানটি সঠিক জ্ঞান হল কি করে?

আমি বলছি, এটাই তো সঠিক জ্ঞান। এ জ্ঞানই অবস্থাটির সঠিক ধারণা দেয়। অজ্ঞতা তো এটাই যে, ওপরওয়ালার ব্যাপারটিকে অপরিহার্য নয় বলে জানা। এরূপ অজ্ঞতা সব শরীয়তেই নিষিদ্ধ। সব শরীয়তেই তাকদীরের ওপর ঈমান আনতে বলা হয়েছে। তাই এটা মানতেই হবে যে, তুমি যা পাবার তা তোমার কাছে পৌঁছবেই আর যা তোমার হারাবার তা তোমার কাছে থেকে যাবেই। এ প্রেক্ষিতে যদি বলা হয়, আমাদের কাছে ব্যাপারটি হওয়া না হওয়ার সমান সম্ভাবনা থেকে যায়, তাহলে তা সঠিক জ্ঞানেরই পরিচায়ক হবে। তুমি যে কোন চুতষ্পদ পুরুষ জন্তুকে ঠিক পুরুষ জন্তুর মতই কাজ করতে দেখবে; তেমনি স্ত্রী জন্তুকে স্ত্রী জন্তুর মতই কাজ করতে দেখবে। এখন যদি তুমি এ সিদ্ধান্ত নাও যে, এ কাজটি জবরদস্তির সাথে যেভাবেই করানো হচ্ছে যেভাবে পাথরকে ধাক্কা দিয়ে নড়াচড়া করানো হয়, তাহলে তুমি ভুল করবে।

তেমনি তুমি যদি বল, কোন কারণ বা অন্তর্নিহিত যোগ্যতা ছাড়াই পুরুষ জন্তু পুরুষোচিত এবং স্ত্রী জন্তু স্ত্রীসুলভ কাজ করছে তাহলে তুমি ভুল বলবে। তেমনি যদি তুমি বল, উক্ত জন্তুদের ভেতর ওপরওয়ালার ইচ্ছার যে ছাপ রয়েছে, তারা তারই প্রতিফলন ঘটাচ্ছে, তাদের ভেতরে স্বতন্ত্র কোন প্রেরণা বা উদ্দীপনা কাজ করছে না, তাহলেও তোমার ভুল বলা হবে।

মূলতঃ সত্য ও সঠিক কথা রয়েছে এ ব্যাপার দুটোর মাঝখানে। আর তা হচ্ছে এই যে, ইচ্ছাটা মূলতঃ কোন কারণের সাথে সম্পৃক্ত। তাই তা সেটা তার কারণের প্রতিকূলে যেতে পারে না। উক্ত কারণই কাংক্ষিত কাজটিকে অপরিহার্য করে দেয়। তাই এটা অসম্ভব কথা যে, কারণ মওজুদ থাকা সত্ত্বেও কাজটি হবে না পরন্তু ইচ্ছা শক্তিটির অবস্থা তো এই যে, সে নিজের ওপর অন্য কোন শক্তি দেখতে পায় না। এখন যদি তুমি ইচ্ছা শক্তির এ অবস্থাটি মেনে নাও আর তা নিজের ভেতরেও দেখতে পাও, তাহলে দেখবে করা না করার সম্ভাবনার সমতা তোমার কাছেও স্বীকৃত সত্য হয়ে ধরা দেবে এবং বলবে, আমার ইচ্ছার কারণে কাজটি হয়েছে।

তেমনি এরূপ বলাটা সত্যেরই প্রতিধ্বনি হবে। মোটকথা, আল্লাহ পাকের বিধি-বিধান এক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে উক্ত ইচ্ছাশক্তির কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

মোদ্দাকথা, যে ইচ্ছা নতুন নতুন কাজ সৃষ্টি করে সেরূপ ইচ্ছার অস্তিত্ব শরীয়তে প্রমাণিত সত্য হয়ে আছে। তাই দুনিয়া ও আখেরাতে শুভাশুভ পলাফলও সুপ্রমাণিত সত্য বই নয়।

এটাও সুপ্রমাণিত যে, নিখিল সৃষ্টির নিয়ন্তা শরীয়ত অনুসরণ করাকে অপরিহার্য করেই সৃষ্টির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছেন যেন মানুষ তা অনুসরণ করে কল্যাণ পেতে পারে। ব্যাপারটি এরূপ যেন কোন প্রভু তার ভৃত্যদের খেদমতে নিয়োজিত করলেন ও তার কাছে যথাযথ খেদমত দাবী করলেন। যে ভৃত্য তার খিদমত করল তার ওপর তিনি খুশী। বস্তুতঃ ঠিক এ দৃষ্টিকোণ থেকেই আল্লাহর শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে। আমি আগেই বলে এসেছি যে, আল্লাহর বিধি-বিধান তাঁর গুণাবলী ও আনুসংগিক ব্যাপারের সাথে এরূপ ওতপ্রোত সম্পৃক্ততা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে যা দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট। আভ্যন্তরীণ কি বাহ্যিক কোন সত্যই এর চাইতে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিতে পারে না।

আল্লাহর শরীয়ত এ সূক্ষ্ম ও রহস্যপূর্ণ বস্তুর (ইবাদত যে আল্লাহর স্বাভাবিক পাওনা) পরিচয়টি তিন ভাবে ব্যক্ত করেছেন। এ তিনটি ব্যাপারই তাঁর অনুমোদিত ও সর্বজন বিদিত সত্য।

এক ঃ আল্লাহ্‌ পাক নিয়ামতদাতা, নিয়ামতদাতার কৃতজ্ঞতা অপরিহার্য, তাঁর নিয়ামতের জন্যে তাঁর ইবাদত করাই কৃতজ্ঞতা।

দুইঃ তিনি অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দান করেন। তাই পৃথিবীতে যে তাঁর ইবাদত করবে না তাকে তিনি কঠিন শাস্তি দেবেন।

তিন ঃ তিনি পরকালে তাঁর অনুগত ও অবাধ্যদের যার যার কর্মফল প্রদান করবেন।

এ থেকে তিনটি জ্ঞান অর্জিত হল।

এক, তাজকীর বে আলাল্লাহ।

দুই, তাজকীর বে আইয়ামিল্লাহ।

তিন, তাজকীর বিল মাআদ।

সমগ্র কুরআন পাক এ তিন জ্ঞানের ব্যাখ্যা হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। এ তিনটি জ্ঞাতব্য বিষয়কে খোলামেলা ভাবে সকলের সামনে তুলে ধরার দিকেই কুরআন বেশী নজর দিয়েছে। কারণ, মানুষের সৃষ্টিই এভাবে হয়েছে যে, স্রষ্টার দিকে তার আকর্ষণ স্বভাবতঃই দেখা দেয়। এ আকর্ষণ একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার। এটা মানুষের প্রকৃতিতেই নিহিত রয়েছে। এ কারণেই তার সুস্থ বিবেক এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহর ইবাদত করাটা বান্দার কাছে আল্লাহর পাওনা। কারণ, তিনি তার নেয়ামতদাতা ও তার কৃতকর্মের ফলাফলদাতা। এখন যারা বান্দার ইচ্ছা শক্তির বা বান্দার ওপর আল্লাহর অধিকারের সত্যটি অস্বীকার করে কিংবা কৃতকর্মের ফলাফল দানের ব্যাপারটি মানেনা তারা নাস্তিক। তাদের সুস্থ বিবেক বিলুপ্ত হয়েছে। কারণ, সে তার প্রকৃতিগত আকর্ষণের অনুভূতিও হারিয়ে বসেছে। তার স্বভাবে যে বস্তুটি নিহিত রয়েছে আর সে যে বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করছে তা উধাও হয়ে গেছে। তুমি যদি উক্ত স্বভাবগত আকর্ষণের হাকীকত জানতে চাও তাহলে স্মরণ রেখ, মানবাত্মার একটি নূরের লতিফা রয়েছে যাতে প্রকৃতিগত ভাবেই আল্লাহর প্রতি আকর্ষণ বিদ্যমান। লোহা যেভাবে চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট থাকে এও তেমনি ব্যাপার। আত্মিক অনুভূতির মাধ্যমেই এটা জানা যায়।

তাই যে ব্যক্তি নিজ আত্মার লতিফাগুলো জানার জন্যে গভীর গবেষণা ও সাধনা করবে এবং প্রতি লতিফার অবস্থা বুঝে নেবে, সে অবশ্যই সেই নূরানী লতিফার সন্ধান পাবে তখন সে তাতে আল্লাহর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ সম্পর্কে অবগত হবে। আধ্যাত্মিক সাধকদের নিকট সে আকর্ষণই আল্লাহ-প্রেম নামে অভিহিত। অন্যান্য আত্মিক ব্যাপারের মত এ ব্যাপারটিও আত্মিক অনুভূতির মাধ্যমেই পরিজ্ঞাত হয়, দলীল-প্রমাণ দ্বারা অর্জিত হয় না। যেমন ক্ষুধার্তের ক্ষুধা ও পিপাসার্তের পিপাসা আত্মা দিয়েই বুঝা যায়। অতঃপর যখন কোন মানুষের লতিফাগুলো আঁধার পর্দায় আবৃত হয়ে যায় তখন সে আর সেই নূরানী লতিফার সন্ধান পায় না। দেহ যে ভাবে ইনজেকশন দিয়ে অবশ করে নিলে গরম কি ঠাণ্ডা সব অনুভূতি বিলুপ্ত হয়, এও তাই।

মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যুর কারণে যখন নিম্নস্তরের লতিফাগুলো যেভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়, সেভাবে আত্মার অধিকাংশ ব্যাপারের সক্রিয়তা বিলুপ্তি হয়, কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কেউ মৃত্যুর পর্যায়ে নিজেকে নিয়ে যায়, তখন আর তার ওপর কোন অবশকারী বস্তুর প্রভাব কাজ করে না। বিভিন্ন বিস্ময়কর পন্থা অর্থাৎ আত্মিক ও দৈহিক সাধনা দ্বারা মানুষ জীবন কালেও মরণোত্তর স্থায়ী আত্মার পর্যায়ে পৌছতে পারে এবং সেটাকেই স্বেচ্ছামৃত বলা হয়েছে। যদি কেউ মরে গিয়েও আল্লাহর দিকে নিছক অজ্ঞতা মূর্খতার কারণে রুজু হতে না পারে, তাহলে মানবিক যোগ্যতা হাজারো থাকা সত্ত্বেও সে হতভাগা। মরণোত্তর বার্যাখী জিন্দেগীর অবস্থাগুলো তার কাছে উদ্ঘাটিত হবে বটে, কিন্তু আত্মিক যোগ্যতার অভাবে সে তার সমাধান খুঁজে পাবে না। তাই সেখানে সে হয়রান ও হতভম্ব হবে। তারপর যদি তার জ্ঞানগত কর্মগত কোন্ অসংগতি থাকে তাহলে তো সে অত্যন্ত সমস্যা ও টানাপোড়েনে পড়ে যাবে। তার জৈব আত্মা আল্লাহর ও অজৈব আত্মা বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী অবস্থার শিকার হয়ে তাকে নিম্নগামী করবে। ফলে তার ভেতরে এক ভয়ংকর অবস্থার উদ্রেক হবে। এ অবস্থাটি তার অজৈব আত্মায় প্রভাব ফেলবে। পরিণামে অধিকাংশ সময়ে তার সামনে ভয়াবহ ঘটনাবলী দেখা দেবে। কোন জণ্ডিসগ্রস্তের স্বপ্নে আগুন ও স্ফূলিংগ দেখার মতই সে তা দেখতে থাকবে। আত্মার পরিচিতির রহস্যের এটাই মৌল তাৎপর্য। সে লোকের ওপর সর্বোচ্চ পরিষদের ক্রোধ ও গজবের দৃষ্টি পড়তে থাকবে। এ কারণেই সেখানে কর্মরত ফেরেশতা ও অন্যান্য অধিকার প্রাপ্তদের অন্তরে এটাই জাগ্রত হবে যে, তাকে শাস্তি ও দুঃখ-কষ্ট দিতে হবে।

মূলতঃ মানুষের অন্তরে যে সব বাসনা-কামনা ও খটকা সৃষ্টি হয় তার মূল কারণ সম্পর্কিত সঠিক ব্যাখ্যা এটাই। মোট কথা, আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হওয়া ও তাঁর বিধি-বিধানকে অপরিহার্য্য করে নেয়ার মাধ্যমে মানুষ তার নিম্নস্তরের লতিফাগুলোর টানাপোড়েন থেকে মুক্ত হতে পারে। তখনই সে অপরিহার্য কাজ বর্জনের জন্যে সেগুলোকে জবাবদিহি করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মানুষের ভেতর এরূপ যোগ্যতা ও প্রভাব দিয়ে

দিয়েছেন যার সাহায্যে মানুষ স্বভাবতঃই উক্ত অবস্থা অর্জন করতে পারে। এরূপ অবস্থায় মানুষ শুধু ভাসা ভাসা আমল ও রুসম-রেওয়াজ অনুসরণের মাধ্যমে হাসিল করতে পারে না। কেবল মাত্র নূরানী লতিফার প্রভাবই মানুষকে সে স্তরে উন্নীত করতে পারে। আমল তো শুধু সে লতিফার অভিপ্রায় পূরণ করা ও আত্মাকে দুরস্ত রাখার জন্যে হয়ে থাকে। এ ব্যাপারটি যেহেতু অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং এ লতিফা বুঝার লোক খুবই নগণ্য ছিল, তাই জরুরী হয়েছে সে লতিফার দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে সরাসরি আল্লাহর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। মূলতঃ নূরানী লতিফার উদ্দেশ্যও তাই। সে দিকেই তা মানুষকে আকৃষ্ট করে।

এতো গেল আত্মার সে অংশের অস্তিত্ব নির্ধারণ যা মানুষকে আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট করে। এটা আমার সে দাবীরই সার কথা যাতে বলা হয়েছে যে, মানুষকে আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট করাই মানবাত্মার নূরানী লতিফার দায়িত্ব।

আল্লাহ যখন তাঁর শরীয়ত অবতীর্ণ করেন তখন তিনি এ রহস্যটি এমন সহজ ভাবে বুঝিয়েছেন যাতে প্রত্যেকেই নিজ সহজাত জ্ঞানেই সহজে বুঝতে পারে। আল্লাহ পাক এ সূক্ষ্ম ব্যাপারটি উপমা-উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে মানুষের বোধগম্য করে নাযিল করেছেন। যেমন কোন কোন লোকের সামনে স্বপ্নের মাধ্যমে একটা নিছক উপলব্ধির ব্যাপার এমন এক বস্তুর রূপ ধরে আসে যা তার স্বাভাবিক অভ্যেস মোতাবেকই তার জন্য অপরিহার্য হয়। হুবহু সেরূপ যদি নাও হয় তবে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

বস্তুতঃ বলা হয় যে, বান্দার ওপর আল্লাহর হক হচ্ছে ইবাদত। এর ওপরেই কোরআন মজীদের হক, রাসূলের হক, মালিকের হক, পিতা-মাতার হক ও জনগণের হক কেয়াস করা উচিত। তেমনি মানুষের নিজের ওপরও নিজের হক রয়েছে। তাও আদায় করলে তার সার্বিক হক আদায় হয়। নিজে যেন সে নিজের ওপর জুলুম না করে। হক যার পাওনা আর যার সাথে হকের লেন-দেন হবে তা যেন যেনতেন ভাবে আদায় না হয়; বরং তা ভালভাবে জেনে-শুনে সঠিক ভাবে আদায় করা চাই।

পরিচ্ছেদ ঃ তেতাল্লিশ

আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

আল্লাহ পাক বলেন ঃ–

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَاللّٰهِ فَاِنَّهَامِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ *

সুরা হাজ্জঃ আয়াত ৩২

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে মর্যাদা দেয় সেটা তার অন্তরের আল্লাহ্ ভীতিরই পরিচায়ক।"

স্মরণ রাখা চাই যে, আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান প্রদর্শন ও তার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনই শরীয়তের ভিত্তিমূল। এ কথা বলে আমি সে পদ্ধতির দিকে ইংগিত দিচ্ছি যে পদ্ধতি আল্লাহ মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন। মূলতঃ তা হচ্ছে ধ্যান-ধারণার ব্যাপারগুলোকে বস্তুর মাধ্যমে রূপ দেয়া। জৈবশক্তির জন্যে সেগুলো গ্রহণ করা সহজ হয়। নিদর্শনাবলী বলতে আমি সে সব বাহ্যিক কার্যকলাপকে বুঝিয়েছি যেগুলো আল্লাহর ইবাদতের জন্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। আর সেগুলো এমন ভাবে আল্লাহর সাথে নিদিষ্ট হয়ে গেছে যে, সেগুলোকে মর্যাদা দেয়ার মানেই আল্লাহকে মর্যাদা দেয়া। তেমনি সেগুলোর প্রতি ঔদাসীন্যের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন। এগুলো মানুষের মনের গহনে এমন ভাবে বাসা বেঁধে নিয়েছে যে, তাদের অন্তরগুলো টুকরো করে ফেললেও সেগুলোর মর্যাদা বোধ তা থেকে বিচ্যুত হবে না। মূলতঃ আল্লাহর নিদর্শনের প্রভাব এরূপ স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগতই হয়ে থাকে। যেমন মানুষের মন কোন এক অভ্যেস ও স্বভাবে সুদৃঢ় ও সুস্থির হয়ে যায়। ফলে সেখানে সেটা প্রচলিত ও খ্যাত হয়ে যায়। এমন কি তা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উর্ধে উঠে সুস্পষ্ট সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তখন আল্লাহর রহমতও সে সব বস্তুর রূপ নিয়ে দেখা দেয়। ফলে তা সার্বজনীন জনপ্রিয়তা লাভ করে ও তার রহস্য সবার কাছে খুলে যায়। দূর ও নিকটের সকলের কাছেই তার প্রচার ও প্রসার ঘটে। তখন তাদের ওপর আল্লাহর সে নিদর্শনের মর্যাদা দান অপরিহর্য হয়ে যায়।

যেমন কেউ যদি আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ নেয় তখন তার বিবেক সে জন্যে তাকে দংশন ও জবাবদিহি করে থাকে। তেমনি এ নিদর্শনগুলো অস্বীকার করতে গেলে বিবেকের দংশন সহ্য করতে হয়, বরং তা মেনে চলার অনুকূলেই তার জ্ঞান সায় দেয়। তার জ্ঞানের এ আনুকূল্য ও আকর্ষণ অপরিহার্য করে দেয় যে, আমাদের আনুগত্য ও অনুসরণ আল্লাহর রহমতের প্রকাশ ঘটায়। কারণ, যে কোন কার্য ব্যবস্থার ভিত্তি হতে হয় সহজ থেকে সহজতর যাতে সবার অন্তরে তা সহজে প্রবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সর্বান্তঃকরণে মর্যাদা প্রদর্শন করা উচিত। তাতে কোনরূপ ঔদাসীন্য ও অবহেলা চলবে না।

আল্লাহ পাক নিজ বান্দাদের ওপর যা কিছু অপরিহার্য করেছেন তা তাঁর নিজের কল্যাণের জন্য নয় আদৌ। আল্লাহ তাআলা তা থেকে অনেক উর্ধে অবস্থান করছেন। বরং তাতে সৃষ্টি কুলেরই কল্যাণ রয়েছে। বান্দার অবস্থা তো এই যে আল্লাহর ব্যাপারে সর্বান্তঃকরণে সম্মান প্রদর্শন ছাড়া তার বন্দেগীর পূর্ণতা আসেনা।

এটা সুস্পষ্ট যে, শরীয়তের কাজের ব্যাপারে ব্যক্তির অবস্থাই শুধু লক্ষ্য করা হয় না বরং গোটা সমাজের অবস্থা সামনে রাখা হয়। একটি লোককে সামনে নিয়ে গোটা সমাজের বিধান চালু করা হয়। পরিপূর্ণ দলীল-প্রমাণ আল্লাহর জন্য রয়েছে! আল্লাহর সেরা নিদর্শন চারটি ঃ

(১) কুরআন মজীদ।

(২) কাবা শরীফ।

(৩) নবী করীম (সঃ)।

(৪) নামায।

কোরআন মজিদ আল্লাহর নিদর্শন। কারণ, রাজা-বাদশাদের ফরমান প্রজা-পুঞ্জের ভেতর চালু হওয়ার পদ্ধতি প্রসিদ্ধ ছিল। সে সব ফরমানকে সম্মান প্রদর্শন রাজা-বাদশাহকে সম্মান প্রদর্শন বলে বিবেচিত হত। আম্বিয়ায়ে কেরামের সহীফা ও অন্যান্য লেখকের গ্রন্থ পাশা-পাশি চালু ছিল। আম্বিয়ারে কেরামের প্রচারিত দ্বীন যারা কবুল করত তারাই শুধু সহীফাকে সম্মান দেখাত ও তা তিলাওয়াত করত। আদিকাল থেকেই প্রকাশ্যত এ ধারণাই চলে আসছে যে, কোন নির্ধারিত সহীফা ভিন্ন অন্য

কিছু থেকে জ্ঞান অর্জন করা ও তা অনুসরণ করা সহজ সাধ্য হয় না। তাই মানুষের ধারণা জন্মে গেছে আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ কিতাবের সাথে তার রহমত জড়িত থাকে। তাই তার মর্যাদাকে মানুষ অপরিহার্য ভেবে থাকে।

এ মর্যাদা দানের একটি পদ্ধতি হল এই যে, যখন তা পাঠ করা হবে তখন চুপচাপ থেকে তা শুনতে হবে। তা শোনার অন্যান্য রীতি পালন করবে। যেমন তিলাওয়াতের সিজদা ও বিভিন্ন তাসবীহর আয়াতের তাসবীহ্ সংগে সংগে আদায় করবে।

তাকে মর্যাদা প্রদর্শনের এও এক পদ্ধতি যে, ওযু ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না। কা'বা শরীফও আল্লাহর নিদর্শন। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর যুগে মানুষ সূর্য ও নক্ষত্রাদির অর্চনার জন্যে ইবাদতখানা ও হায়কাল বানাবার বাড়াবাড়িতে লিপ্ত ছিল। তারা ভাবত, নিরাকারকে ইবাদতের জন্য ইবাদতখানা বানিয়ে না নিয়ে চলতে পারে না। এ কারণেই হায়কাল বানাত। তারামনে করত, নিরাকার প্রভু এর ভেতর ঠাঁই নেন। তাই তাকে পেতে হলে হায়কালের অর্চনা করতে হবে। একটি ইবাদত ঘর এমন হতে হবে যার মাধ্যমে আল্লাহর রহমত প্রকাশ পাবে আর সে ঘরটি তাওয়াফ করে তারা আল্লাহর রহমত লাভ করবে। সর্ব সাধারণের এ ধ্যান-ধারণা দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছিল। তাই আল্লাহ পাক কাবা ঘর তৈরী করিয়ে সেদিকে লোকদের ডাকলেন এবং সেটাকে মর্যাদা দানের নির্দেশ দিলেন। তারপর যুগ যুগ ধরে এ ধারণা ও জ্ঞান বদ্ধমূল হয়ে চলল যে, কা'বা ঘরকে মর্যাদা দেয়া আল্লাহকে মর্যাদা দেয়ার নামান্তর এবং তাতে ত্রুটিকরা আল্লাহর খেদমতে ত্রুটি করার শামিল। তাই কা'বা ঘরে হজ্জ করা ফরয হল।

(১) কাবা ঘরকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য এ বিধান দেয়া হল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাকে পবিত্র হয়ে তার তাওয়াফ করতে হবে।

(২) কাবার দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে হবে।

(৩) পায়খানা-প্রস্রাবের সময় সেদিকে মুখ কিংবা পিঠ রাখতে পারবে না।

রাসূলও আল্লাহর নিদর্শন। তাঁর পদবী এ জন্যেই রাসূল হয়েছে যে, তাঁকে রাজা-বাদশাহর বার্তাবহের সাথে তুলনা করা হয়েছে। বার্তাবহের কাজ হয় প্রজা পুঞ্জের কাছে রাজা-বাদশাহর আদেশ নিষেধ পৌঁছে দেয়া। সে বার্তাবহকে সম্মান দেখানো রাজা-বাদশাহকে সম্মান দেখানোরই নামান্তর। তাই রাসূলের প্রতি সম্মান দেখানো রাসূলের প্রেরকের প্রতি সম্মান দেখানোরই নামন্তর।

(১) পয়গম্বারকে মর্যাদা দানের পদ্ধতি এই যে, তাঁর আনুগত্যকে অপরিহার্য ভাববে।

(২) তাঁর জন্যে দরূদ পাঠ করবে।

(৩) তাঁর সামনে জোরে কথা বলবে না।

নামায, এ কারণে আল্লাহর নিদর্শন যে, নামাযের মাধ্যমে মাবুদের সামনে বান্দার অবস্থার যথার্থ প্রতিফলন ঘটে। যে ভাবে কোন ভৃত্য বাদশাহর দরবারে দাঁড়িয়ে সবিনয়ে কোন দরখাস্ত পেশ করে এবং শুরুতে সে বাদশাহের গুণগান করে নেয়, এও ঠিক তাই। নামাযে মানুষকে ঠিক বাদশাহর সামনে ভৃত্যের আবেদন-নিবেদনের অবস্থাগুলোরই প্রকাশ ঘটাতে হয়, যেমন হাত বাঁধা, এদিক ওদিক না দেখা ইত্যাদি। রাসূল (সঃ) বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়।

পরিচ্ছেদ ঃ চৌচল্লিশ

ওযু ও গোসলের রহস্য

স্মরণ রেখ, মানুষ কখনও কখনও প্রকৃতিগত অন্ধকার থেকে পবিত্র মজলিসের দিকে মনোনিবেশ করে। তখন সেখানকার স্বর্গীয় দ্যুতি তার ওপরে ছেয়ে যায়। ফলে ক্ষণিকের জন্যে হলেও সে প্রকৃতিগত বিধি-বিধান থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এমন কি পবিত্র মজলিসের ফেরেশতাদের সাথে একাকার হয়ে যায়। এমন কি আত্মিক পবিত্রতার দিক দিয়ে সে তাদেরই একজন হয়ে যায়। তারপর তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেয়া হয়। তখন সে প্রথম অবস্থার ব্যাপার-স্যাপারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কারণ, প্রথম অবস্থার অবর্তমানে সে সেটাকে গনীমত ভেবেছিল এবং সেটাকে হারানো অবস্থা লাভের একটা উপকরণ মনে করে।

বস্তুতঃ সে উক্ত গুণের মাধ্যমে হারানো অবস্থা থেকে একটি অবস্থা লাভ করে। সেটা হচ্ছে অপবিত্রতা থেকে মুক্ত এবং পবিত্রতা অর্জনের বস্তুসমূহ ব্যবহার করার ফলে অর্জিত তৃপ্তি ও প্রসন্নতা। সে সেই অবস্থাটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকে তখন সে ব্যক্তি শুনতে পায় যে, সত্য সংবাদদাতা ঘোষণা করলেন, এ অবস্থায় মানবিক পূর্ণত্ব অর্জনের মর্যাদা লাভ ঘটে। সে এও শুনতে পায় যে, তার স্রষ্টা প্রভু এ অবস্থাটি পসন্দ করেন। এ ছাড়াও এতে অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে।

বস্তুতঃ সে আন্তরিক সাক্ষ্য দ্বারা এটাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে। তার প্রভু তাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সে তা পালন করেছে। তিনি তাকে যে আশ্বাস দিয়েছেন তা সত্য হয়েছে। তার ওপর রহমতের দুয়ার খুলে গেছে। সে ফেরেশতার রঙে রঞ্জিত হয়েছে।

এর পরের স্তর হল তাদের, যারা উক্ত স্তরের কিছুই জানে না, কিন্তু নবীগণ তাদের জোর করে সে পথে নিয়েছে। তাদের এমন অবস্থায় পৌঁছতে বাধ্য করেছে যাতে অন্ততঃ পরকালে ফেরেশতাদের সাথে একাকার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। এরা হল সে দল যাদের জিঞ্জিরে বেঁধে জান্নাতের দিকে টেনে হেঁচেড়ে নেয়া হবে।

যে অপবিত্রতা সাধারণ লোকের ধারণায় রয়েছে, যার প্রভাব প্রত্যেকের আত্মাই অনুভব করে, যার উৎস ও প্রতিকার সর্বসাধারণকে স্মরণ করিয়ে ও বুঝিয়ে দিতে হয় আর যা অহরহ ঘটে থাকে এবং যা লোকদের শিক্ষা না দিলে মারাত্মক ক্ষতি হয় এরূপ অপবিত্রতা দু ধরনের হয়ে থাকে ঃ-

(১) মানুষের তিনটি পরিত্যাজ্য বস্তু যথা হাওয়া ছাড়া কিংবা পেশাব-পায়খানায় লিপ্ত হওয়া। এগুলো তার পাকস্থলির প্রক্রিয়াজাত বাড়তি জিনিস। এগুলো না জানে এমন কোন লোক নেই। যখন কারো পেটে হাওয়া জমে যায় কিংবা পেশাব-পায়খানা জমা হয়, তখন তার মন খারাপ হয়ে যাবে। তখন সে কোন ভূখণ্ডের দিকে যায় এবং অত্যন্ত বিব্রতকর অবস্থার ভেতর কাটায়। তখন সে অস্থিরতা অনুভব করে। স্বস্তি ও তার মাঝখানে পর্দা পড়ে যায়। যখন তার পেট থেকে হাওয়া এবং পায়খানা-পেশাব বেরিয়ে যায়, তখন ওযু-গোসল করে নেয়। ফলে নিজকে পবিত্র মনে হয়। তখন সে স্বস্তি ও তৃপ্তি ফিরে পায়। তখন তার মনে হয়, হারানো বস্তু ফিরে পেয়েছে।

(২ যৌনাচারে মত্ত হওয়া। এ কাজটা মানুষকে পশু প্রকৃতির স্তরে নামিয়ে দেয়।

একটু ভেবে দেখুন, যখন চতুষ্পদ জন্তুকে পোষ মানানো হয়, সেটাকে বিশেষ রীতি-নীতি শেখানো হয়, শিকারী জন্তুকে ক্ষুধা ও অনিদ্রা দ্বারা অনুগত করা হয়, সেটাকে শিকার ধরে ঠিকঠাকমত নিয়ে আসার শিক্ষা দেয়া হয়, পাখীকে যখন মানুষের বুলি সেখানো হয়, এক কথায় যে জীবই হোক সেটাকে তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ভুলিয়ে বিপরীতধর্মী যে কাজই শেখানো হোক, যখনই সে সুযোগ পাবে পাশবিক যৌনাচারে লিপ্ত হবেই। তখন সব ভুলে ক্রমাগত সে কাজেই লিপ্ত থাকতে চাইবে। কেউ যদি একটু ভেবে দেখে, তা হলেই বুঝতে পারে, এ কাজটি তার মন মানসিকতাকে কতখানি অস্বস্তিকর করে দেয়। এমনকি অধিক খাওয়া ও নেশা করায়ও এত বেশী অস্বস্তি বোধ হয় না। তাই এটা প্রমাণিত সত্য যে, যৌনাচার মানুষকে অধিকতর পশু স্বভাবের অধিকারী করে। যে কেউ তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেও এটা বুঝতে পারে। এ জন্যেই ডাক্তাররা দুনিয়া ত্যাগী সন্ন্যাসীদের প্রতিষেধক হিসেবে যৌন সম্পর্কের ব্যবস্থার কথা বলেন।

সর্ব সাধারণের বোধগম্য ও সকলের জন্যে অপরিহার্য। এ দু'ধরনের অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ হল পানি। তাই আবাদ এলাকায় তা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যেহেতু ঐগুলো অহরহ ঘটে থাকে তাই তা দূর করার ব্যবস্থাকে সহজ লভ্য করা হয়েছে। যেহেতু এ দুটো ব্যাপার প্রকৃতির ধর্ম হিসেবে বিবেচ্য তাই তা আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

এক– ছোট পবিত্রতা।

দুই– বড় পবিত্রতা।

বড় পবিত্রতার জন্যে সারা শরীর পানি দিয়ে ডলে-মলে ধুয়ে সাফ করতে হবে। পানি যে পবিত্রকর ও অপবিত্রতা বিদূরক এটা সর্বজন স্বীকৃত সত্য। পানি শরীরের অবসাদ দূর করে সজীবতা ও প্রসন্নতা ফিরিয়ে আনে।

কিছুলোক শরাব পান করে নেশায় মত্ত হয়। তার প্রকৃতিতে নেশার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে কিংবা কোন মূল্যবান সম্পদ নষ্ট করে। তারপর হঠাৎ সে সচেতন হয়, সুস্থ হয়, নেশার ঘোর।

কেটে বুদ্ধি ফিরে আসে। অনেক দুর্বল লোকও নেশায় মত্ত অবস্থায় সবল হয়ে যায় আর নেশা কেটে গেলে তার নড়াচড়ারও শক্তি থাকে না। এভাবে হঠাৎ কোন ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে বা জিদের বশবর্তী হয়ে দুর্বলরা সবল হয় এবং উত্তেজনা ও জিদ চলে গেলে আবার দুর্বল হয়ে যায়।

মোটকথা মানুষের মানস জগতে কখনো হঠাৎ পরিবর্তন আসে এবং তা এক স্বভাব থেকে অন্য স্বভাবে পরিবর্তিত হয় এ জন্য মন চাংগা হয়ে উঠে। মানস জগতের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মনের এ চাংগা অবস্থা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা একটা উত্তম পন্থা। এ ধরনের সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পূর্ণাংগ পবিত্রতা অর্জন একটা কার্যকর ব্যবস্থা। এ পবিত্রতা একমাত্র পানি দ্বারাই অর্জিত হতে পারে।

পক্ষান্তরে ছোট অপবিত্রতা দূর করে পবিত্রতা অর্জনের জন্যে মুখ, হাত ও পা ধোয়াই যথেষ্ট। কারণ সকল সভ্য সমাজেই এ তিনটি খোলা অংগ ধূলা-বালি থেকে পরিষ্কার রাখার জন্যে ধোয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কারণ, তা জামা-কাপড়ের বাইরেই রাখা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও এ তিনটি অংগ কাপড় ঢাকা করতে নিষেধ করেছেন। খোলা অংগ-প্রত্যংগে স্বভাবতঃই ময়লা লাগে বলে অহরহ তা সবাই ধুয়ে থাকে। রাজা-বাদশাহর দরবারে যেতেও মানুষ এগুলো ধুয়ে সাফ করে নেয়। মানুষের নজরেও এ তিনটি ধরা দেয়। তাছাড়া অভিজ্ঞতাও বলে দেয় এ তিনটি অংগ ধুয়ে মাথা মুছে ফেললে দেহে স্বস্তি ও প্রশান্তি আসে। অচেতন কিংবা নিদ্রামগ্নকে সচেতন ও সজাগ করতে হলে মুখে পানি ছিটাতে হয়। ডাক্তারগণও তাই বলে।

পবিত্রতা অর্জন মানুষের অভ্যেসগত ব্যাপারে পারিণত হয়েছে। মানবতার পরিপূর্ণতার এটা ভিত্তিমূল। পবিত্রতা মানুষকে ফেরেশতার সংস্পর্শে পৌছায় ও শয়তান থেকে দূরে রাখে। এর বদৌলতে কবর আযাব থেকেও রেহাই মেলে। রাসূল (সঃ) বলেছেন, পেশাব থেকে সাবধান। কারণ, সাধারণতঃ পেশাবের অপবিত্রতা কবর আযাবের কারণ হয়ে থাকে। পবিত্রতার বদৌলতে মানুষ মহান মর্যাদার অধিকারী হয়। আল্লাহ বলেন ঃ "পবিত্র ব্যক্তিকে আল্লাহ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন।" যখন পবিত্রতার প্রভাব অন্তরে মজবুত ভাবে বসে যায়, তখন ফেরেশতার নূরের দ্যুতি সেখানে

অবস্থান করে। ফলে পশুত্বের তথা জৈবিকতার অন্ধকার তার থেকে দূর হয়ে যায়। পুণ্য লিপিবদ্ধ হওয়া ও পাপ বিলুপ্ত হওয়ার তাৎপর্য এটাই। রুসম-রেওয়াজ বা সামাজিক রীতিনীতির বিচারেও পবিত্রতা অত্যন্ত কল্যাণপ্রদ। রাজা-বাদশাহর দরবারে যাবার জন্যে যেভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অনুসরণ করে, যদি কেউ ঠিক তেমনি নিয়ত করে পবিত্র থাকে ও যিকর-আযকার চালু রাখে তা হলে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়।

মানুষ যখন বুঝতে পায় যে, পবিত্রতাই তার পূর্ণতা অর্জনের ভিত্তি। তখন তার জ্ঞানই তাকে নির্দেশ দেবে আর সে জ্ঞান অনুসারেই সে তা করতে থাকবে। ফলে তার স্বভাব-প্রকৃতি জ্ঞানের অনুগামী হতে বাধ্য হবে। এটাও বড় একটা লাভ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

পরিচ্ছেদ ঃ পঁয়তাল্লিশ

॥ নামাযের হাকীকত ॥

স্মরণ রাখবেন, কখনও মানুষ হাযিরাতুল কুদস বা পবিত্র মজলিস পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন সে আল্লাহ পাকের অত্যধিক নৈকট্য লাভ করে। তাই সেখান থেকে তার ওপর পবিত্র জ্যোতি অবতীর্ণ হয়। তখন সে ইন্দ্রিয়ের ওপর বিজয়ী হয়ে এমন সব অতিন্দ্রিয় ঘটনা অবলোকন করবে যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তারপর আবার যেখানে ছিল সেখানে ফিরে আসে। ফলে তার ভেতর অস্থিরতা দেখা দেয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি হয়। অবশেষে বাধ্য হয়ে সে এ নিম্ন অবস্থা মেনে নেয়। অবশ্য তার এ নিম্ন অবস্থা সাধারণের নিম্ন অবস্থা থেকে অনেক উত্তম। তখন সে আল্লাহ্-প্রেমে মগ্ন হয়ে যায় এবং সেটাকে তার হারানো অবস্থা ফিরে পাবার উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। এ অবস্থাটি আসলে কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে আবেদন-নিবেদন ও কাকুতি-মিনতি করার নামান্তর মাত্র। এটাই তার জন্য নির্ধারিত কাজ।

এর পরবর্তী স্তর হল সেই ব্যক্তির যে এক সত্য সংবাদ দাতার সত্য খবর শুনে সেটাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে এবং প্রথমোক্ত অবস্থার দিকে

তার আহ্বানকে যথার্থ বলে মেনে নিয়ে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলেছে। ফলে তাকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে রহমত লাভের তাও সে পেয়ে চলেছে। তাকে যে আশা দেয়া হয়েছে সে আশাও তার পূর্ণ হয়েছে।

তার পরের স্তরে সেই ব্যক্তি রয়েছে যাকে নামায আদায়ের জন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম বাধ্য করেছেন অথচ সে নিজে কিছুই জানত না। যে ভাবে কোন পিতা তার ছেলেকে তার অপছন্দনীয় কোন কল্যাণকর কারিগরি শিক্ষাদানে বাধ্য করে, এও ঠিক তেমনি ব্যাপার।

কখনও মানুষ তার প্রতিপালকের কাছে বিপদ বিদূরণ ও নিয়ামত অর্জনের প্রার্থনা জানায়। সে ক্ষেত্রে তার উচিত সম্মান প্রদর্শন ও বিনয় প্রকাশের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান। দোয়ার প্রাণ হল প্রার্থনাকারীর মনোভংগী। এমন মনোভংগী থাকা চাই যা প্রার্থনা কবুলে প্রভাব বিস্তার করে। ইস্তেস্কার নামায এ কারণেই সুন্নত হয়েছে।

নামাযের মূল ব্যাপার তিনটি-

১। আল্লাহ পাকের অপার মহত্ত্ব ও অশেষ প্রতিপত্তি অনুসারে অন্তরে পরম বিনয় ও ভীতি পোষণ করা।

২। সেই বিনয় ও ভীতি বিশুদ্ধ ভাষায় মুখে প্রকাশ করা।

৩। সেই ভীতি ও বিনয় মোতাবেক অংগ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করা।

জনৈক কবি খুব চমৎকার কথা বলেছেন ঃ

افادتكم النعماء منى ثلاثة

يدى ولسانى الضمير المحجب *

"তোমার অনুগ্রহরাজি আমার তিনটি জিনিসকে তোমার সেবায় নিয়োজিত করেছে। তা হচ্ছে আমার হাত, আমার মুখ ও আমার লুকানো অন্তর। অর্থাৎ এগুলো তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিয়োজিত রয়েছে।"

সম্মানসূচক কাজের একটি হচ্ছে, নিজ প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করবে এবং তাঁর দিকে পূর্ণ মাত্রায় খেয়াল রাখবে। তার চাইতেও বড় প্রভুর সামনে ভৃত্যের মতই নিজকে পেশ করবে। মাথা সর্বক্ষণ আনত রাখবে। মানব তো দূরে, পশুও বুঝে যে মাথা উঁচু রাখা বিনয়ের পরিপন্থী

দাম্ভিকতা পূর্ণ কাজ আর মাথা নত করাই বিনয়ের চিহ্ন। আল্লাহর বাণীও তাই বলছে ঃ

فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ *

সূরা শু'আরা ঃ আয়াত ৪

অর্থাৎ অতঃপর সে নিদর্শন দেখে তাদের ঘাড় আনত হত।

তার চাইতেও বড় কথা হল, শ্রেষ্ঠতম অংগ মুখমন্ডল তাঁর সিজদার জন্যে ভূমিতে বিন্যস্ত করা। মানুষের দৃষ্টির মাধ্যমে সব অনুভূতিই নিবদ্ধ থাকে এ মুখমন্ডলের দিকে।

এ তিন ধরনের সম্মানসূচক কাজ সার্বজনীন ভাবেই প্রচলিত রয়েছে। কেউ সেগুলো নামাযে আল্লাহর দরবারে এসে করে আর কেউ শাসক কিংবা কর্মকর্তার সামনে গিয়ে। সর্বোত্তম নামায সেটাই যার ভেতর এ তিনটি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তার সাথে সাথে বিনয় ও নম্রতার সাধারণ অবস্থাটি অসাধারণ পর্যায়ে উন্নীত্ত হয়েছে। শুধু বিরাট ভাবে সম্মান দেখানো কিংবা সাধারণভাবে সম্মান দেখানোর হাবভাব দ্বারা এ ক্ষেত্রে উন্নতি বা অবনতি নির্ণীত হয় না।

নামাযকে বলা হয় আল্লাহর নৈকট্য লাভের সকল কাজের ভিত্তিমূল। আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গবেষণা ও তাঁর স্থায়ী জিকর-আজকারকেও এ গুরুত্ব দেয়া হয়নি। কারণ, খুব উচ্চ মার্গের আত্মা ব্যতীত আল্লাহ পাকের মহান শ্রেষ্ঠত্বের সঠিক ধ্যান গবেষণা সম্ভব নয়। তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। সেই বিশেষ স্তরের লোক ছাড়া অন্যরা তা করতে গেলে ঈমান হারিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ পথে চলতে গিয়ে অনেকেরই মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটেছে। যে জিকরের পেছনে অংগ প্রত্যংগের সক্রিয় অংশ গ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতা থাকে না, থাকে না কোনরূপ প্রশস্ততা তা বিকৃতি ও ব্যর্থতা ডেকে আনে। অধিকাংশের ক্ষেত্রেই এ কাজ অর্থহীন হয়।

নামায মূলতঃ একটি টনিক-মিকচার। একেতো তার ভেতর আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব ভাবনার নিয়ত ও প্রয়াস রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এমন পদ্ধতিতে ও পারিপার্শ্বিকতায় সে চিন্তা-ভাবনার কাজটি হচ্ছে যা সাধারণ মানুষেরও অনুসরণ যোগ্য। এরূপ অবস্থায় তারা স্বভাবতঃই আল্লাহর ধ্যানে তন্ময়

হতে পারে। নামায এ ব্যাপারে তার সহায়ক হয়ে থাকে। নামাযের ভেতরে এমন দোয়া-কালামও রয়েছে যাতে খালেস অন্তরে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার কথা রয়েছে। তাতে আল্লাহরই সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে।

নামাযের রুকু এবং সিজদাও সম্মানসূচক কাজ। সেগুলো একে অপরের পরিপূরক ও পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এগুলো নামাযীকে সতর্কও করে। এর কারণ সাধারণ অসাধারণ সবার জন্যই নামায কল্যাণপ্রদ ও শক্তিশালী প্রতিষেধক। যে কেউ তা থেকে যোগ্যতানুপাতে কল্যাণ নিতে পারে।

ঈমানদারদের জন্যে নামায হল মিরাজ। নামায তাদের পারলৌকিক জ্যোতির্ময় জীবনের জন্যে প্রস্তুত করে! নবী করীম (সঃ) বলেনঃ তোমরা শীঘ্রই আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভ করবে। তাই ফজর ও আসর নামাযে গাফেল থেকনা। নামায পড়তে থাক, কারণ তা আল্লাহ্র মহব্বত ও রহমত লাভের বড় উপায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আরও বলেনঃ আমি তোমাদের শাফায়াত করে জান্নাতে নেব। কিন্তু তোমরাও আমাকে সাহায্য কর। তোমরা বেশী বেশী নামায পড়। আল্লাহ পাক জাহান্নামীদের সম্পর্কে বলেন যে, তারা সেদিন বলবে, وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ অর্থাৎ আমরা নামায পড়তাম না।

মুমিনের অন্তরে যখন নামাযের প্রীতি মজবুত হয়ে যায়, তখন আল্লাহর নূরে নিমগ্ন হয়ে থাকে। তখন পাপ দূর হয়ে যায়। কারণ, পুণ্য পাপ দূর করে। আল্লাহকে পাওয়া ও জানার জন্যে নামাযের চাইতে সহায়ক ও কল্যাণপ্রদ আর কোন বস্তু নাই। বিশেষতঃ নামাযের প্রতিটি কাজ যখন বিনয় ও আন্তরিকতা নিয়ে পবিত্র নিয়তে আদায় করা হয়, তখনই তা উপকারী হয়। যদি কেউ সামাজিক প্রথা হিসেবে নামায পড়ে তা হলেও সে সামাজিক অন্যায়-অনাচার থেকে বেঁচে যাবে।

নামায মুসলমানকে কাফের থেকে আলাদা করে দেয়। নবী করীম (সঃ) বলেন ঃ কাফের ও আমাদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী হল নামায। তাই যে ব্যক্তি নামায ছাড়ল সে কাফের হয়ে গেল।

সন্দেহ নেই, আত্মাকে জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণে চলার অভ্যেস সৃষ্টি করার ব্যাপারে নামাযের কোন জুড়ি নেই।

পরিচ্ছেদ-ছিচল্লিশ

॥ যাকাতের হাকীকত ॥

স্মরণ রেখ, যখন কোন গরীব-মিসকীনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সে কথায় কি হাবভাবে আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি করে থাকে, তখন আল্লাহ পাকের দানের দুয়ার খুলে যায়। কখনও তিনি কোন বান্দার অন্তরে ইলহাম করে দেন যাতে সে সেই গরীবের প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়। সে ব্যক্তি যখন তা করে তখন তিনি খুশী হন। তখন উপর থেকে, নীচ থেকে, ডান থেকে, বাম থেকে তার ওপর রহমত ও বরকত নাযিল হতে থাকে।

একদিন এক গরীব আমার কাছে তার চরম অভাবের কথা বলল। আমি তখন আমার অন্তরে ইলহামের অবতরণ অনুভব করলাম। বুঝতে পেলাম, তাকে কিছু দেয়ার জন্যে আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে। তার বিনিময়ে আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সুসংবাদ দেয়া হল। আমি তাই সেই গরীবের প্রয়োজন মিটিয়ে দিলাম। ফলে আমি আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতির যথাযথ বাস্তবায়ন দেখতে পেয়েছি। সেই গরীবের আল্লাহর বখশিশের দরজার কড়া নাড়া আর আল্লাহর তরফ থেকে তাকে সাহায্য করার জন্যে আমার প্রতি নির্দেশ হওয়া এবং নির্দেশ পালনের পুরস্কার হাতে হাতে পাওয়া, এ সবই আমার চোখের সামনে ঘটেছে।

কখনও কিছু খরচ করা আল্লাহ্র রহমত লাভের কারণ হয়ে থাকে। যেমন সর্বোচ্চ পরিষদে বিশেষ কোন ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটাবার সিদ্ধান্ত হল। তখন যারা সে ধর্মের সহায়ক হয় তাদের ওপর আল্লাহর রহমত হয়। সেদিন সে কাজে খরচ করা তবুকের যুদ্ধে খরচের মতই পুণ্য কাজ হয়। যেমন কোন সম্প্রদায় দুর্ভিক্ষের শিকার হল। অথচ আল্লাহ তাদের বাঁচাতে ইচ্ছুক হলেন। সেখানে যারাই খরচ করবে তারা বহু পুণ্যের অধিকারী হবে।

মোটকথা, সত্য সংবাদ দাতা একটি বাক্যে একটা নীতি ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি কোন গরীবকে এরূপ এরূপ খরচ করবে কিংবা এই এই অবস্থায় খরচ করবে, তার সে কাজ খুবই মকবুল কাজ হবে।

কোন এক শ্রোতা এ বাণী শুনতে পায় এবং আন্তরিক ভাবে তা সত্য জেনে কার্যকরী করে। ফলে তাতে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সে সত্য

দেখতে পায়। অনেক সময় মানুষের মনই সাক্ষী দেয় যে, তার সম্পদের লালসা ও কার্পণ্য তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তার মুক্তি লাভের পথে তাকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

ফলে সে অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত থাকে। তার এ সমস্যার সমাধান হচ্ছে এই যে, আল্লাহর পথে খরচ করার তার যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্যে সে যেন তার প্রিয় বস্তুগুলো দান করার অভ্যেস গড়ে তোলে। শক্ত হাতে এ ভাবে প্রিয়তম বস্তু দান করার মাধ্যমেই সে উপকৃত ও কৃতকার্য হবে। অন্যথায় সে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায়ই থেকে যাবে। পরিণামে পরকালে তার সে প্রিয় সম্পদ সাপ হয়ে তার গলায় জড়াবে কিংবা তা তাকে অন্যভাবে বিপদগ্রস্ত করবে। এক হাদীছে আছেঃ "সম্পদ পুঞ্জিভূত করে যে ব্যক্তি যাকাত দেয় না তার পা তপ্ত তাপে ঝলসে যাবে।"

স্বয়ং আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ *

সূরা তাওবাঃ আয়াত ৩৪

"যারা সোনা-রূপা জমা করে।"

অনেক সময় বান্দা বিপদগ্রস্ত হয় এবং নমুনা জগতে তাকে ধ্বংসের সিদ্ধান্ত হয়। বিপদে পড়ে সে বেশি পরিমাণে প্রিয় ধন-সম্পদ বিতরণ করে। তখন সে নিজে ও তার জন্যে নেককার জীবিত ও মৃতেরা কান্নাকাটা ও দোয়া করে! এভাবে সে ধন বিলিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে নেয়। নবী করীম (সঃ) বলেনঃ "নির্ধারিত মৃত্যুকে শুধুমাত্র দোয়া পিছিয়ে দিতে পারে। আর পুণ্যই কেবল আয়ু বাড়াতে পারে।"

কখনও প্রবৃত্তির তাড়নায় কেউ অন্যায় কাজ করে ফেলে। তারপর তার ভেতর অনুশোচনা জাগে ও তাওবা করে, তারপর আবার প্রবৃত্তির তাড়নায় অন্যায় করে, আবার অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে। এ ধরনের লোকদের সংশোধনের উপায় হচ্ছে নিজের উপর মোটা অংকের জরিমানা করা। তা হলে তার সামনে সর্বদা সে বিরাট আর্থিক ক্ষতি বাধা হয়ে দেখা দেবে ফলে অন্যায় থেকে বিরত থাকবে।

কখনও কেউ খান্দানী মান-মর্যাদা সংরক্ষণ ও ভদ্রতা, সামাজিকতা বজায় রাখার জন্য খুব খাওয়ায়, সালাম-কালাম চালায়, সাহায্য সহানুভূতি দেখায় বিভিন্নভাবে খরচ পত্র করে। এটাও আল্লাহর মর্জিতে হয় এবং এগুলোকে সদ্কা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

যাকাত দেয়ায় আয়ু বাড়ে। যাকাত আল্লাহর রহমত টেনে আনে ও গজব দূর করে। কার্পণ্যের জন্যে সৃষ্ট পারলৌকিক আজাব থেকে যাকাত রেহাই দেয়। পার্থিব জীবনেও যাকাত দাতার শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সর্বোচ্চ পরিষদে দোয়ার ব্যবস্থা হয়।

পরিচ্ছেদ ঃ সাতচল্লিশ

॥ রোযার হাকীকত ॥

স্মরণ রেখ, অনেক সময় মানুষ সত্য এলহামের মাধ্যমে এটা বুঝতে পায় যে, আভ্যন্তরীণ পাশব প্রবৃত্তি তাকে মানবিক পূর্ণতায় পৌঁছতে বাধা সৃষ্টি করছে। আর সে কারণেই ফেরেশতা খাসলাতের অনুগামী হতে পারছে না। তাই সে তার পশু স্বভাবকে খারাপ ভাবতে থাকে ও তা দমন করার জন্যে পথ খুঁজে বেড়ায়। তখন সে তা দমনের জন্যে ক্ষুৎপিপাসাকে অবলম্বন করে, স্ত্রী সাহচর্য ত্যাগ করে, মুখ, অন্তর ও অন্যান্য অংগ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণে রাখে। মোটকথা, এগুলো দ্বারা সে আত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা করে।

এর পরবর্তী স্তর হল তাদের যারা এক সত্য সংবাদ দাতার সংবাদকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে ও তা অনুসরণের মাধ্যমে আত্মিক উৎকর্ষ সৃষ্টি করে।

এর পরবর্তী স্তর হল তার যাকে কোন নবী মেহেরবানী করে সেই কাজে নিয়োজিত করে যে সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিল না। তার সে আত্মসংযমের কার্যাবলীর পুরস্কার সে পরকালে পাবে।

অনেক সময় মানুষ নিজেই জানতে পায়, প্রবৃত্তিকে জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণে রাখাতেই মানুষের সাফল্য আসে কিন্তু তার প্রবৃত্তি বিদ্রোহী হয়ে যায়। কখনও জ্ঞানের নির্দেশ মানে, কখনও আবার মানে না। তখন তার জন্য অনুশীলন অত্যাবশ্যক হয়। তাই রোযার মত কোন কষ্টকর কাজে প্রবৃত্তিকে

নিয়োজিত রাখতে হয়। রোযা প্রবৃত্তিকে দমন করে ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য করে। এভাবে প্রবৃত্তি দিনের পর দিন রোযা রেখে সংযমে অভ্যস্ত হয় ফলে তাকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য সফল হয়।

কখনও বা কোন লোক পাপ করে ফেলে। তখন বেশ কিছু কাল রোযা রাখতে থাকে। এটা প্রবৃত্তির জন্যে অধিক কষ্টদায়ক হয় ফলে তার পক্ষে দ্বিতীয় বার সেই পাপ করার হিম্মত থাকে না।

কখনও কারো ভেতর নারী সম্ভোগের প্রবণতা দেখা দেয়। অথচ বিয়ে করার তার সামর্থ্য নেই। তাই ব্যভিচার থেকে বাঁচার জন্যে সে রোযা রেখে যৌন প্রবণতা স্তিমিত করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে আছাল্লাম বলেনঃ যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। কারণ, রোযা মানুষের কামভাব স্তিমিত করে।

রোযা বড়ই পুণ্য কাজ! রোযা মানুষের ফেরেশতা স্বভাবকে জোরদার ও পশু স্বভাবকে দুর্বল করে। আত্মার পরিচ্ছন্নতা ও প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রোযার চেয়ে ফলপ্রসূ কোন আমল নেই। তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ ' রোযা আমারই জন্যে হয় এবং আমি নিজেই তার পুরস্কার দেব।"

রোযা প্রবৃত্তিকে যত বেশী নিয়ন্ত্রিত করে পাপও তত বেশী হ্রাস পায়। ফলে তা মানুষকে ফেরেশতার স্বভাবের সাথে তুলনীয় করে তোলে। ফলে রোযাদারকে ফেরেশতারা ভালবাসে। এ ভালবাসা পশু প্রকৃতিকে দুর্বল করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ পাকের কাছে মিশ্‌কের ঘ্রাণের চেয়েও প্রিয়।

রোযা যদি কেউ নেহাৎ আনুষ্ঠানিকভাবেও রাখে তাতেও কল্যাণ রয়েছে। যখন কোন মানুষ রোযা রাখে তখন তার কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান শৃংখলাবদ্ধ হয়, তার জন্য জান্নাতের দুয়ার খুলে যায় এবং দোযখের দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়। যখন কোন লোক প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় ও তার খারাপ প্রভাব দূর করতে চায়, তখন নমুনার জগতে তার এ প্রয়াসের একটা পবিত্র নকশা তৈরী হয়ে যায়। তখন কিছু পুণ্যাত্মা সাধকের সে দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ফলে অদৃশ্য জগত থেকে সে জ্ঞানগত সাহায্য পেয়ে থাকে। এভাবে পবিত্র নক্শা ও পুণ্যাত্মার সংযোগে যে এক পুণ্যময় পরিমন্ডল সৃষ্টি হয় তাতে সেই ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। রাসূল (সঃ) যে আল্লাহ

পাকের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন ঃ রোযা আমার এবং তার পুরস্কার আমিই দেব, এ কথার তাৎপর্যও তাই।

অনেক সময় মানুষ এটা জানতে পায় যে, জীবিকার ধাঁধায় ডুবে থাকা ও তা নিয়ে মেতে থাকা ক্ষতিকর। পক্ষান্তরে মসজিদে পড়ে থেকে এক ধ্যানে কায়মনে ইবাদত করা উত্তম ও কল্যাণকর অথচ সব সময়ের জন্যে তা সম্ভব নয় তা বলে কোন সময়ই তা না হওয়া ঠিক নয়। অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য হলেও তা হওয়া উচিৎ। এ কারণেই কিছু মানুষ নিজেই কিছু সময় বের করে এতেকাফ করে থাকে।

তারপর আরেক দল সত্য সংবাদদাতার প্রদত্ত সংবাদ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে সেই অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে তা করে।

তৃতীয় দলকে বিধি-বিধানের বাঁধনে-বেঁধে এতেকাফ করানো হয়। এ কথাটি আগেও বলা হয়েছে।

কখনও এমন হয় যে, একটি লোক রোযা তো রাখে, কিন্তু এতেকাফ ছাড়া মুখটাকে সংযত ও পবিত্র রাখতে পারেনা।

কখনও কেউ আবার লাইলাতুল কদর আর ফেরেশতার দেখা পেতে চায়। সেটাও এতেকাফ ছাড়া সম্ভবপর হয়না। লাইলাতুল কদর সম্পর্কে শীঘ্রই আপনারা জানতে পারবেন।

পরিচ্ছেদ ঃ আটচল্লিশ

হজ্জের হাকীকত

জেনে রাখুন, হজ্জের হাকীকত হল এটাও যে, নেককারদের বিরাট একটি দল আল্লাহর নিদর্শনপূর্ণ এক জায়গায় সমবেত হয়ে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহদের অবস্থা স্মরণ করবে! দ্বীনের ইমামদের বড় বড় দল হজ্জে গিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে সম্মান দেখানো, দীনহীন ভাবে আল্লাহর মহব্বত প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে পাপ মার্জনা করানো ও আল্লাহর রহমত লাভ করা যখন এ মনোভাব নিয়ে অনুরূপভাবে সমবেত লোকদের অন্তরে রহমত লাভের প্রত্যয় সৃষ্টি হয়, তখনই অপরিহার্যভাবে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া অবতীর্ণ হয়। যেমন–

রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ আরাফার দিন শয়তান যে ভাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়ে থাকে আর কোন দিন সেরূপ হয় না।

হজ্জের মূলবস্তু সব জাতির ভেতরেই নিহিত রয়েছে। কারণ, সব জাতিই এমন একটি মিলনতীর্থ কামনা করে, যেখানে একত্রিত হয়ে স্রষ্টার পুণ্য নিদর্শনাবলী দেখে তারা কৃতার্থ হবে। প্রত্যেক জাতির ভেতর মানত ও কুরবানী করার বিশেষ একটি ধরন রয়েছে। তাদের পূর্বপুরুষ থেকেই এটা চলে আসছে। তারাও সেটা অপরিহার্যভাবে অনুসরণ করে চলেছে। কারণ এর ভেতর দিয়ে তারা স্রষ্টার নৈকট্য প্রাপ্তদের স্মরণ ও অনুসরণ করে নিজেরা নৈকট্য লাভের প্রেরণা অর্জন করছে।

হজ্জের জন্য বায়তুল্লাহ যোগ্যতম কেন্দ্র। সেখানে স্রষ্টার সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। সেটি আল্লাহ পাকের নির্দেশ ও ওহী মোতাবেক হযরত ইবরাহীম (আঃ) এক পবিত্র ভূখন্ডে প্রতিষ্ঠিত করেন। অধিকাংশ জাতির ভেতর তার গুণ কীর্তন চলে আসছিল। কারণ, সেটি ব্যতীত অন্য যে কোন তীর্থধাম ছিল মানুষের মনগড়া শির্ক ও বিদআতের আস্তানা।

আত্মিক পবিত্রতার জন্যে এটাও প্রয়োজন যে, এমন কোথাও গিয়ে আস্তানা করা চাই যে স্থানটিকে পুণ্যাত্মাগণ সম্মানের চোখে দেখে গেছেন এবং আল্লাহর জিক্‌র ও ইবাদত দ্বারা সে স্থানটি সমুজ্জ্বল করে গেছেন। কারণ পার্থিব ব্যাপারে নিয়োজিত ফেরেশতাদের দৃষ্টি সে স্থানটির প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তাই যখন কোন ব্যক্তি সেখানে অবস্থান নেয়, তখন ফেরেশতাদের দৃষ্টির প্রভাবে তার চরিত্র প্রভাবিত হয়ে থাকে। আমি নিজেও বারংবার তা উপলব্ধি করেছি।

আল্লাহর নিদর্শন দেখা ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনও আল্লাহর জিকরের একটি পদ্ধতি। ধোঁয়া দেখলে যেভাবে তার পেছনে আগুনের অস্তিত্ব স্মরণে আসে ঠিক তেমনি আল্লাহর নিদর্শন দেখলে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে সীমা লংঘনের ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কতা প্রয়োজন। আল্লাহর নিদর্শনকে আল্লাহর মর্যাদায় ভূষিত করা না হয়।

মানুষ কখনও আল্লাহর দীদার কামনা করে। তার এ কামনা হজ্জ ছাড়া অন্য কোন পথে পূর্ণ হতে পারে না। প্রত্যেক রাষ্ট্রনায়কেরই মাঝে মাঝে দরবার বসাতে হয়। তাতে রাষ্ট্রের উন্নতি ও অগ্রগতির প্রচার-প্রসারের

ব্যবস্থা হয়। তেমনি ধর্ম জগতেরও হজ্জ যেন সেই রাষ্ট্রীয় দরবার। যেখানে দ্বীনদার ও নাফরমানের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্র দ্বীনে কিভাবে সারা দুনিয়ার মানুষ দলে দলে যোগ দিচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। সারা দুনিয়ার তীর্থযাত্রীর সাথে ভাবের আদান-প্রদানে পারস্পারিক কল্যাণ সাধিত হয়। আল্লাহর দীদারের জন্যে আন্তরিক হজ্জ যদি না করে কেউ আনুষ্ঠানিক হজ্জও করে তাতেও বহু সামাজিক কল্যাণ পাওয়া যায়। তবে দ্বীনের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ ও উন্নয়ন সৃষ্টির ব্যাপারে হজ্জ অতুলনীয় অবদান রাখে।

হজ্জে যেহেতু দূর-দূরান্তে সফর করতে হয় তাই তা বেশ কষ্টসাধ্য কাজ। সেখানে গিয়েও হজ্জ সমাধার জন্যে যথেষ্ট কায়িক ও আর্থিক কষ্ট, ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এ জন্যে হজ্জ মানুষের অতীতের পাপরাশি সেভাবেই ধুয়ে-মুছে যায় যেভাবে ঈমান এনে মুসলমান হবার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

পরিচ্ছেদ ঃ উনপঞ্চাশ

বিভিন্ন পুণ্যের হাকীকত

(১) আল্লাহর জিক্র এক শ্রেণীর পুণ্য কাজ। কারণ, আল্লাহর জিক্র ও তাঁর মাঝখানে কোন পর্দা থাকে না। আল্লাহ্র পরিচয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিশুদ্ধির জন্যে জিক্রের চেয়ে উপকারী কোন বস্তু নেই। স্বয়ং রাসূল (সঃ) বলেন, আমি কি তোমাদের সব আমলের ভেতর উত্তম আমল বলে দেব না? বিশেষতঃ যে ব্যক্তির ভেতর পশু প্রবৃত্তি প্রকৃতিগত ভাবেই দুর্বল কিংবা কষ্টকর কাজ দ্বারা তা দুর্বল করে রেখেছে তার ক্ষেত্রে জিক্র বেশী কল্যাণকর। তেমনি কল্যাণপ্রদ যারা জাহেরী ইবাদতে মন স্থির রাখতে ব্যর্থ হয় তাদের জন্য।

(২) দোয়া বা প্রার্থনাও এক শ্রেণীর পুণ্য কাজ। এ কাজটি আল্লাহর দরবারের প্রশস্ত দরজা খুলে দেয়। দোয়ার মাধ্যমে বান্দার মাবুদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও তাঁর কাছে সর্বতোভাবে মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ পায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ দোয়া ইবাদতের মগজ। দোয়াকারী মূলতঃ আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে আত্মার নিজ উৎসের দিকে নিবিষ্ট হওয়া।

দোয়ার গুণগত উৎকর্ষই হল প্রার্থীত বস্তু লাভের ব্যাপারে প্রাণসত্তা স্বরূপ!

(৩) কুরআন তিলাওয়াত ও ওয়াজ-নসিহত শ্রবণ। যে ব্যক্তি তা কানে শুনে মনে ঠাঁই দেয়, সে আল্লাহ্‌ভীতি ও হাল-হাকীকত, আল্লাহ্‌র বিশালত্ব বোধের বিস্ময় ও আল্লাহ্‌র দান-দাক্ষিণ্যে অভিভূত ও প্রভাবিত হতে বাধ্য। বস্তুতঃ তার নিজের আত্মাকে সজীব করার ক্ষেত্রে তা খুবই ফলপ্রসূ হয়। আর আত্মাকেও উর্দ্ধজগতের বিশেষ রং-এর প্রভাবে রঞ্জিত করবে। এ কারণেই কাজটি পরকালে যথেষ্ট ফলদায়ক হবে। কবরেরও ফেরেশতা মৃতকে প্রশ্ন করবেঃ তুমি কোরআন বুঝেছ ? ও তা তিলাওয়াত করেছ? কোরআন পাঠ মানুষের আত্মার নীচতা ও দীনতা দূর করে এবং সেটাকে পূত-পবিত্র করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক বস্তুর রেত রয়েছে এবং অন্তরের রেত হল কোরআন তিলাওয়াত।

(৪) আত্মীয়-স্বজন পাড়া-পড়শী, এলাকাবাসী ও জাতির সেবা ও কল্যাণ করা ও দাস মুক্ত করা। এ কাজগুলো আল্লাহর রহমত ও শান্তিপূর্ণ জীবনের পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ কাজের দ্বারা জীবন ধারার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের কাজ পূর্ণতা লাভ করে। এর ফলে ফেরেশতার দোয়া পাওয়া যায়।

(৫) জিহাদ। এটা এভাবে সংঘটিত হয় যে, কোন এক পাপাচারী ও অত্যাচারী লোক সর্ব সাধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলছে যা আল্লাহ্‌ পাক তাঁর পৃথিবীর শান্তি-শৃংখলার পরিপন্থী বিধায় তিনি তাকে ধ্বংস করতে চান, তখন এক পুণ্যবান ব্যক্তির অন্তরে তিনি এলহাম করে দেন যাতে সে সেই জালিমকে হত্যা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। তখন সে নিছক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে নিজের সব কাজ ছেড়ে দিয়ে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নেমে পড়ে। স্বভাবতঃই তখন সে আল্লাহ্‌র রহমত ও নূর দ্বারা পরিবৃত হয়। তাই সহজেই সে সেই জালিমকে হত্যা করে মজলুম জনগণকে মুক্তি দান করে।

এর কাছাকাছি আরেকটি অবস্থা আছে। তা হল এই যে, আল্লাহ্‌ পাক কখনও কোন পাপচারী জালিম জাতিকে শায়েস্তা করতে চান। তখন কোন নবীকে জিহাদের জন্যে নির্দেশ দেন। তেমনি তাঁর উম্মতদের ভেতরেও এরূপ প্রেরণা সৃষ্টি করেন যাতে তারা একটি নেককার জাতি হিসেবে

আত্মপ্রকাশ করে। তখন তাদের ওপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়। ফলে তারা সকলেই জালিম সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়।

কখনও এরূপ হয় যে, কোন জাতির সর্বসাধারণ এ ব্যাপারে এক মত হয়ে যায় যে, হিংস্র প্রকৃতির শাসকমন্ডলীর হাত থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে হবে এবং অত্যাচারী গোষ্ঠীকে শাস্তি দিতে হবে। তারপর দেশে সর্বপ্রকারের অন্যায় নির্মূল করতে হবে। তখন সেই জাতির ওপর আল্লাহর রহমত নেমে আসে এবং তাদের এ পুণ্য প্রয়াসে তারা সফল হয়। ফলে দেশময় স্বস্তি ও শান্তি ফিরে আসে।

(৬) মুমিনের জীবনে বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধিও কয়েক ভাবে পুণ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(ক) যখন আল্লাহর রহমত কোন লোকের কাজ শুধরে নিতে চায়, তখন পৃথিবীর কার্যকারণগুলো সক্রিয় হয়ে তাকে বিপদগ্রস্ত করে। তখন সেই পরীক্ষায় উতরে গিয়ে সে তার সব পাপ ধুয়ে-মুছে ফেলে। ফলে তার জন্যে পুরস্কার লেখা হয়। যেমন কোন প্রবাহমান শ্রোতধারা যদি বন্ধ করে দেয়া হয় তা হলে তা উদ্বেলিত হয়ে বাঁধের ওপর ও নীচ উভয় দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়, মুমিনের জীবনে বাধা-বিপত্তিকে সেই বাঁধের সাথে তুলনা করা যায়। এ বাঁধ তার পুণ্য প্রবণতাকে উদ্বেলিত করে বহুমুখী করে দেয়।

(খ) মুমিনের ওপর যখন কঠিন বিপদ দেখা দেয় এবং অন্যের জন্যে পৃথিবী প্রশস্ত হলেও তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়, তখন তার স্বভাব-প্রকৃতিতে যে সামাজিক বন্ধনের তোয়াক্কা ছিল তা বিলুপ্ত হয় এবং সে পুরাপুরি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে কাফের তখন হারানো জীবনের সব কিছু নিয়ে বিলাপ করে আর দুনিয়াবী ব্যাপার নিয়ে কান্না-কাটা করে। ফলে সে চূড়ান্ত পাপী হয়ে যায়।

(গ) কখনও বিপদাপদ এজন্যে পুণ্যের কারণ হয় যে, প্রবৃত্তি তখনই শক্তিশালী থাকে যখন দেহে শক্তি থাকে। ফলে তাতে বাসনা, কামনাও প্রবল থাকে এবং পাপ প্রবণতা জোরদার হয়। কিন্তু রোগ-ব্যাধি এসে যখন দেহকে দুর্বল করে ফেলে তখন প্রবৃত্তিও দুর্বল হয় এবং পাপ প্রবণতা নিস্তেজ হয়। তাই আমরা যে কোন দুর্বল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে যৌনাচার বা উত্তেজনাকর ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকতে দেখি। মোট কথা

লোকটি একদম বদলে যায় এবং তার পেছনের জীবন সে ভুলে যায়। তখন ভাবাই যায় না যে, এ লোক আগে অন্যরূপ ছিল।

(ঘ) যখন কোন মুসলমানের পশু প্রবৃত্তি তার ফেরেশতা স্বভাবের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং সে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তাকে দুনিয়াতেই শাস্তি দিয়ে পরকালের জন্যে পরিচ্ছন্ন করে নেন। হাদীসে আছেঃ- পার্থিব জীবনে মুমিনের জন্যে বিপদাপদ তার কৃতকর্মের শাস্তিরূপে দেখা দেয়।

পরিচ্ছেদ ঃ পঞ্চাশ

পাপের বিভিন্ন স্তর

জেনে রেখ, অনেক কাজ আছে যা আনুগত্যের অংগ। তেমনি বহু পদ্ধতি আছে যদ্বারা আনুগত্য অর্জিত হয়। তদ্বারা পশু প্রবৃত্তির ফেরেশতা স্বভাবের অনুগত হওয়ার কথা জানা যায়। তেমনি এমন সব কাজ, স্থান ও পদ্ধতি রয়েছে যদ্বারা নাফরমানীর অবস্থা জানা যায়। সেগুলোকেই বলা হয় পাপ। এ পাপ- গুলোর বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

(১) সেই পাপ যা মানুষের উন্নতির পথ একেবারেই রুদ্ধ করে দেয়। এ ধরনের বড় পাপ দু ধরনের হয়ে থাকে। একটি ধরন হচ্ছে, আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত। তা হচ্ছে নিজ প্রভুর পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা সৃষ্টির গুণ দিয়ে স্রষ্টাকে পরিমাপ করা। অর্থাৎ সৃষ্টির গুণই স্রষ্টার ব্যাপারে প্রমাণ করা কিংবা স্রষ্টার গুণ সৃষ্টির ব্যাপারে প্রয়োগ করা। দ্বিতীয় ধরন হচ্ছে, উপমাগত পাপ। এ- গুলোই হচ্ছে শির্‌ক।

কারণ আত্মা তখনই পবিত্র ধারার অধিকারী হয় যখন তা নিরাকার প্রভুর নিখিল সৃষ্টির সার্বিক পরিচালকের ব্যাপার গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে সক্ষম হয়। এ বিরাট চিন্তাশক্তি যে হারিয়ে বসে স্বভাবতঃই নিজের ক্ষুদ্র গন্ডীর ভেতরে আবদ্ধ হয়ে যায়। তার অপরিচিতি ও অস্বীকৃতির দেয়াল কখনও ভাঙ্গেনা। তাই আল্লাহর পরিচয়ের ক্ষেত্রে সূচাগ্র পরিমাণ দখলও অর্জন করতে পারে না। এটাই সব চাইতে বড় বিপদ।

(খ) মানুষ এ ধ্যান-ধারণা পোষণ করে যে, আত্মার উৎস হল এ দেহ, এছাড়া অন্য কোন ঠাঁই নেই। এ পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন, এ ছাড়া

অন্য কোন জীবন নেই। তাই পার্থিব জীবনের উন্নয়ন ও সাফল্য ছাড়া আর কিছুই করার নেই। অন্তরে যদি এ বিশ্বাসটি জমে থাকে তা হলে তার জন্যে আত্মিক উন্নয়ন ও সাফল্য অর্জনের দিকে দৃষ্টিপাতের কোনই পথ থাকে না।

যখন মানবিক পূর্ণতা অর্জন বলতে জৈবিক উন্নয়ন ছাড়া অন্য কিছু বুঝবে, তখন জনসাধারণ সেটাই অর্জনের জন্যে চেষ্টা করবে। আর তা তখনই সম্ভব হবে যখন সব দিক দিয়েই সে বস্তুগত উন্নয়নের বিপরীত চিন্তা-ভাবনা করবে। যদি তা না হল তা হলে জৈবিক উন্নয়ন ও আত্মিক উন্নয়ন পরস্পর বিপরীত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ফলে মানুষ আত্মিক উন্নয়ন ছেড়ে জৈবিক উন্নয়নের দিকে ঝুঁকে পড়বে। তাই সে জন্যে একটি সতর্ক ঘন্টা ঠিক করা হল আর তা হচ্ছে কেয়ামত ও আল্লাহর সাথে মোলাকাতের ওপর ঈমান আনা।

নিম্ন আয়াতের এটাই তাৎপর্য ঃ

فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ *

সরা নাহল ঃ ২২

সূরা নাহল ঃ আয়াত ২২

অর্থাৎ যারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা তাদের অন্তর সত্য অস্বীকারকারী হয় ও অহংকারী হয়।

মোট কথা, মানুষ যখন অনুরূপ পাপের ওপর মারা যায়, আর তার জৈবিক শক্তি ধ্বংস হয়, তখন উর্ধজগত থেকে চরম ঘৃণা এসে তাকে আচ্ছন্ন করে। তা থেকে সে আর কখনও মুক্তি পায় না।

পাপের দ্বিতীয় স্তর এই যে, জৈবিক শক্তির দম্ভে মানুষ যে সব ফজিলতের কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সেগুলো আল্লাহ তা'আলা তার পূর্ণত্ব ও সাফল্য লাভের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যেহেতু সর্বোচ্চ পরিষদ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পয়গাম্বর ও শরীয়তের মাধ্যমে সেগুলো প্রকাশ ও তার মর্যাদা উঁচু করার ইচ্ছা পোষণ করে। তাই তা অস্বীকারকারী মূলতঃ তাদের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হয়। তাই যখন সে মারা

যায়, তখন সর্বোচ্চ পরিষদের সব সদস্য তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। তারা তাকে শাস্তি দেয়ার পক্ষপাতি হয়। তখন তার পাপ তাকে এরূপ ঘিরে ফেলে যে, তা থেকে তার আর বেরোবার পথ থাকে না। যেহেতু সে তার যথার্থ যোগ্যতা ও গুণ সম্পর্কে অনবহিত থাকে, কিংবা যদি কিছুটা অবহিতও থাকে, কিন্তু তা অপর্যাপ্ত, তাই তার এদুর্গটি থেকে আর রেহাই মেলে না। পাপের এ স্তরটি মানুষকে সকল নবীর ধর্ম থেকেই বাইরে রাখে।

পাপের তৃতীয় স্তর এই যে, মানুষ তার মুক্তির পথ বর্জন করে অভিশপ্ত পথ অনুসরণ করে। কিংবা সে এমন কাজ করে যাতে পৃথিবীতে বড় ধরনের বিপদ ও ফাসাদ সৃষ্টির আশংকা দেখা দেয়। কিংবা সে সব কাজ সচ্চরিত্রতা ও সভ্যতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ স্তরের পাপের কয়েকটি ধরন রয়েছে। এক, সে শরীয়তের সে বিধানগুলো মেনে চলে না যদ্বারা আনুগত্য অর্জিত হয়।

দুই', আনুগত্যের কাজে তার কিছু না কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও শৈথিল্য থেকে যায়।

শরীয়তের অনুসরণ মানুষের জন্যে পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি পশু প্রবৃত্তিতে ডুবে আছে, আর ফেরেশতা স্বভাব যার নিস্তেজ হয়ে গেছে, তার জন্যে শরীয়তের বেশী বেশী বিধান প্রয়োজন। তেমনি যার ভেতর পশু প্রবৃত্তি খুবই শক্তিশালী ও মজবুত, তার জন্যে শরীয়তের কষ্টকর বিধান বেশী করে অনুসরণ করা প্রয়োজন।

পাপ কাজগুলোর ভেতর কিছু আছে হিংস্র প্রকৃতির। সেগুলো সর্বাধিক অভিশপ্ত। যেমন হত্যা, ধর্ষণ, ব্যভিচার ইত্যাদি। তেমনি জনক্ষতিকর কাজ। যেমন জুয়া, সুদ প্রভৃতি। এ তিন ধরনের পাপ আত্মাকে মেরে ফেলে। কারণ তা হচ্ছে সরল সত্য পথের পরিপন্থী। আমি তা আগেই বলে এসেছি। এ পাপগুলোর কারণে সর্বোচ্চ পরিষদ থেকে এরূপ অভিশাপ বর্ষিত হয় যা মানুষকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। পাপ ও অভিশাপের সমন্বয় ঘটলে শাস্তি অপরিহার্য হয়ে যায়।

তৃতীয় স্তরটি সকল পাপের সেরা পাপ। পবিত্র মজলিসে এর হারাম হওয়া ও এর অনুসারীর ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করার পাকা-পোক্ত সিদ্ধান্ত রয়েছে। সব নবী রাসূলই এগুলো ক্রমাগতভাবে বলে গেছেন। এ পাপগুলোর অধিকাংশের ব্যাপারেই সকল নবীর শরীয়তে মতৈক্য রয়েছে।

চতুর্থ স্তরের পাপ হচ্ছে সে সব শরীয়ত ও তরীকাতের নাফরমানী করা যেগুলো জামানা ও জাতির পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়ে থাকে। তার কারণ এই যে, আল্লাহপাক যখন কোন জাতির কাছে কোন নবী পাঠান তাদের আঁধার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য, তখন তাকে দায়িত্ব দেন তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে তাদের ভেতরে ন্যায়ের অনুশাসন চালু করার। তখন তাকে এমন সব কাজ দিয়ে পাঠানো হয় যেগুলো ছাড়া সংশোধন ও অনুশাসন চলতে পারে না। এ কারণে প্রত্যেকটি বিশেষ উদ্দেশ্যের একটি স্থায়ী অথবা দীর্ঘস্থায়ী মানদণ্ড থাকে। আর সে ভিত্তিতেই তাদের জবাবদিহি হতে হয়। প্রত্যেক কাজের জন্যে সময় নির্ধারিত করার প্রয়োজনীয় রীতি থাকে। কোন কোন কাজ ভালাই কিংবা ধ্বংসের হয়ে থাকে। আর সে বিচারেই তার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হয়।

কিছু কাজ তার অনিষ্ট বা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণের সাথে সংযুক্ত থাকে। কিছু কাজের সে সংযুক্ততা থাকেনা। তার ভেতর স্বল্প সংখ্যক কাজের ব্যাপারে প্রকাশ্য ওহী নাযিল হয়েছে। কিন্তু তার অধিকাংশই নবীদের ইজতেহাদ থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

পাপের পঞ্চম স্তর হচ্ছে সে সব পাপ, শরীয়ত প্রণেতা যে ব্যাপারে খুলে কিছু বলেননি এবং সর্বোচ্চ মজলিসেও তার কোন নির্দেশ বা মতামত নেই। কিন্তু বান্দা যখন সাহস করে আল্লাহর দিকে পুরোপুরি মনোসংযোগ করে, তখন তার কেয়াস কিংবা উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে যে কোন কিছুর আদেশ অথবা নিষেধ সম্পর্কে জানতে পারে। যেভাবে কোন সাধারণ ব্যক্তি বিজ্ঞ ডাক্তারের বিশেষ রোগের জন্যে দেয়া প্রেসক্রিপশন থেকে অপূর্ণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কোন ওষুধের কি প্রভাব তা বুঝতে পায়, অথচ না সে প্রভাবের কারণ জানে আর না ডাক্তার তাকে তা বলে দিয়েছে, এও তেমনি ব্যাপার। এ ধরনের ব্যাপার উপেক্ষা করলেও মানুষ দায়মুক্ত হতে পারেনা। তার এ কেয়াসলব্ধ ও বিবেক নির্দেশিত কাজ উপেক্ষা করলে তার ও আল্লাহর মাঝে এক আবরণ সৃষ্টি হয় এবং এ জন্যে তাকে জবাবদিহি হতে হবে। এ নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করাটাই তাকওয়ার কাজ। অবশ্য এমন লোকও রয়েছেন যারা এ ধরনের পাপ বর্জন করা ও পুণ্য অর্জন করাকে ওয়াজিব মনে করেন। আল্লাহ্ পাকও তাদের জন্যে তা ওয়াজিব হিসেবে বিবেচনা করেন। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

انا عند ظن عبدى بى

বান্দা আমার ব্যাপারে যেরূপ ধারণা পোষণ করে আমি তার ব্যাপারে সেরূপই হয়ে থাকি। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

وَرَهْبَانِيَّةَ نِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ *

সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ২৭

অর্থাৎ তারা নিজেদের তরফ থেকে বৈরাগ্য গ্রহণ করেছিল। আমি তাদের জন্যে তা লিখেছিলাম না। কিন্তু তারা আল্লাহকে খুশী করার জন্যে তা করেছে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ لَا تَشَدَّدُوْ فَيَشَدِّدَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ নিজেদের ওপর কাঠিন্য চাপিওনা, তাহলে আল্লাহও তোমাদের ওপর সে কাঠিন্য বলবৎ করবেন।

রাসূল (সঃ) আরও বলেনঃ তোমাদের মনে যাতে খটকা লাগে সেটাও পাপ।

কোন মুজতাহিদের ইজতেহাদে প্রমাণিত হুকুমের নাফরমানী এ স্তরের পাপেরই সমগোত্রীয় পাপ।

পরিচ্ছেদ ঃ একান্ন

পাপের কুফল

স্মরণ রেখ, বড় পাপ ও ছোট পাপ নির্ধারণ দুভাবে হয়ে থাকে। এক, পুণ্য ও পাপের গূঢ় রহস্যের ভিত্তিতে।

দুই, শরীয়ত ও তরীকাতের ভিত্তিতে যা বিশেষ যুগের সাথে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

তত্ত্বগত কারণে নির্ধারিত কবীরা গুনাহ সেটাকেই বলা হয়, যার জন্যে কবর ও হাশরে শাস্তি অপরিহার্য এবং মানব জাতির সভ্যতা ও শৃংখলা বিধ্বস্ত হয়। এমন কি তা মানুষের সহজাত স্বভাবেরও পরিপন্থী। পক্ষান্তরে সগীরা গুনাহ সেটাকেই বলা হয়, যা কবীরা গুনাহ নয় বটে, কিন্তু কবীরা গুনাহর পথ খুলে দেয় এবং তা থেকে কবীরা গুনাহের আশংকা সৃষ্টি হয়।

যেমন, এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে খরচ করে, কিন্তু তার পরিবারবর্গ ভুখা-ফাকা থেকে মরণাপন্ন হয়। সে লোক কার্পণ্যের হীনতা তো দূর করে বটে, কিন্তু পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে থাকে।

যুগের সাথে নির্দিষ্ট বিশেষ শরীয়তের ভিত্তিতে পাপ সেটাকেই বলা হয়, যা সে শরীয়তে হারাম হওয়া প্রমাণিত হয় কিংবা শরীয়ত প্রণেতা যে কাজের জন্যে দোযখের শাস্তির কথা বলেছেন কিংবা যা করার কারণে কাফের অথবা মুরতাদ সাব্যস্ত করা হয়। এরূপ পাপই বড় পাপ বা কবীরা গুনাহ।

অনেক সময় এমনও হয় যে, পাপ-পুণ্যে তত্ত্বগত বিচারে যা ছোট পাপ তা শরীয়তের মানদণ্ডে বড় পাপ। তার উদাহরণ এই যে, জাহেলী যুগের কোন সম্প্রদায় কখনও কোন একটি অন্যায় কাজ পছন্দ করল, আর সেটাকে সামাজিক রীতিতে পরিণত করল। তখন তা থেকে তাদের কারো বেরিয়ে আসা যেন তাদের অন্তর চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার শামিল। অতঃপর শরীয়ত এসে তাদের সে কুপ্রথা থেকে বিরত থাকতে বলল। অথচ তারা তা মেনে না নিয়ে সদম্ভে শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণে লেগে গেল। তাদের এ দম্ভ ও জিদের কারণে শরীয়তও কঠিন হয়ে গেল। অবশেষে সে পাপ অনুসরণ করাটা মিল্লাতের সাথে দুশমনী করার পর্যায়ে চলে গেল। সুতরাং এরূপ পাপ কেবল মরদুদ ও নাফরমানের পক্ষেই সম্ভব হতে পারে। সে না আল্লাহকে পরোয়া করে, না মিল্লাতের তোয়াক্কা করে। এ কারণেই এরূপ পাপকে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মোটকথা, শরীয়তের মানদণ্ড নির্ধারিত কবীরা গুনাহ নিয়ে আমি এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করব। কারণ, সেটাই এ ব্যাপারে আলোচনা নির্ধারিত স্থান! এখানে সে পাপের কুফল নিয়ে আলোচনা করব, যা তত্ত্বগত কারণে পাপ বলে বিবেচিত। আমি যেভাবে পাপের স্তরগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি কুফলও সেভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

কবীরা গুনাহ সম্পর্কে এ মতভেদ রয়েছে যে, তা করে কেউ তওবা ছাড়া মারা গেলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন কি না? প্রত্যেক দলই নিজের সপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল পেশ করেছেন। আমার মতে, এ মতানৈক্যর সমাধান হচ্ছে এই যে, আল্লাহ পাকের কাজ দু'ধরনের হয়ে থাকে।

এক, আল্লাহ পাক প্রতিনিয়ত নিজ মর্জী মোতাবেক যেসব কাজ স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ঘটিয়ে থাকেন।

দুই, বিশেষ কারণে স্বাভাবিক পদ্ধতি ভংগ করে যে কাজ সম্পাদন করেন। যে বাক্যটি নিয়ে মানুষ মতানৈক্যের শিকার হয়েছে তাও দু'ধরনের। এক, স্বাভাবিক পদ্ধতির, দুই, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক উভয় পদ্ধতির। অথচ বিরোধ সৃষ্টির জন্যে বাক্যটির ধরন এক হওয়া চাই। তর্কশাস্ত্রবিদরা বাক্যের একই ধরন হওয়ার অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন। কখনও কোন বাক্যের দিকই উল্লেখ থাকে না। তখন সেখানে কোরআন খুলে দেখা দরকার। যেমন, বলা হল, "যে বিষ পান করে, সে মারা যায়।" এবাক্যটি স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই যা ঘটে সেটাই ব্যক্ত করেছে। কিন্তু সেখানে এটা বলা হয় না যে, বিষ পান যে করবে সে মরেই যাবে। কারণ, অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে সে বেঁচেও যেতে পারে।

এ কারণেই মূলতঃ আলোচ্য ব্যাপারটি বিতর্কিত ব্যাপার নয়। পৃথিবীতেও আমরা আল্লাহ পাকের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কাজের যথেষ্ট উদাহরণ দেখতে পাই। যেভাবে আখেরাতেও তাঁর উভয় ধরনের কাজ প্রকাশ পাবে। স্বাভাবিক নিয়ম তো এটাই যে, বড় পাপ করে তওবা ছাড়া যে লোক মারা যাবে সে দীর্ঘকাল ধরে শাস্তি পাবে। কিন্তু আল্লাহ পাক সে নিয়ম ভংগ করে তাকে ক্ষমাও করতে পারেন।

বান্দার হকের ব্যাপারটিও তাই। তবে কবীরা গুনাহ করলে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে এটা ঠিক নয়! আল্লাহ পাকের নীতিও এটা নয় যে, তিনি কবীরা গুনাহর গুনাহগারকে কাফেরের সাথে একাকার করে শাস্তি দেবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

পরিচ্ছেদ ঃ বায়ান্ন

॥ ব্যক্তিগত পাপ ॥

জেনে রাখুন, মানুষের আত্মিক শক্তিকে তার জৈবিক শক্তি চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। আত্মাটি হল দেহ নামক খাঁচায় বন্দী পাখী। এ পাখীর সৌভাগ্যের পথই হচ্ছে খাঁচামুক্ত হয়ে নিরাপদে তার আসল ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়া। তারপর সেখানে বসে মুক্তভাবে ভাল ভাল ফলমূল ও দানাপানি খেয়ে অন্যান্য মুক্ত পাখীদের সাথে আনন্দ করে উড়ে

বেড়ানো।

তেমনি মানুষের চরম দুর্ভাগ্য হল এটাই যে, সে পূর্ণ মাত্রায় বস্তুবাদী হয়ে যায়। বস্তুবাদের তাৎপর্য এটাই যে, তা মানুষের আল্লাহপ্রদত্ত সহজাত স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আমি আগেই বলে এসেছি যে, মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ তার উৎস স্থল সৃষ্টিকর্তার দিকে। তারা স্বভাবতঃই তাঁকে অতিমাত্রায় সম্মান দেখাতে চায়। নিম্ন আয়াতেও তাই বলা হয়েছে—

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِى اٰدَمَ ... الخ

সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৭২

অর্থাৎ তোমার পালনকর্তা যখন বনী আদম থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তারা বলল, "হাঁ"।

মহানবী (সঃ) বলেনঃ প্রতিটি শিশু প্রকৃতির ধর্ম ইসলামের ওপর জন্ম নেয়। সৃষ্টার ওপর মানুষের অন্তরে এ অন্তহীন সম্ভ্রমবোধ তখনই দেখা দেয়, যখন তাদের অন্তরে এ প্রতীতি জন্মে যে, তিনি যা যেভাবে ইচ্ছা করে থাকেন, ভাল কি মন্দ কাজের ফলাফল দেন এবং মানুষের জন্যে শরীয়ত বা আইন-কানুন নির্ধারণ করেন।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার কোন প্রতিপালক প্রভু রয়েছেন বলে বিশ্বাস করে না, এও বিশ্বাস করে না যে, সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে কিংবা মনে করে সৃষ্টাতো আছেন বটে? কিন্তু পার্থিব জীবনের ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করেন না, কিংবা যদি কিছু করেন তা ইচ্ছা করে করেন না, আপনা আপনি হয়ে থাকে এবং তা ঠেকানোর ক্ষমতা তাঁর নেই অথবা তিনি বান্দার ভাল-মন্দ কাজের ফলাফল দেবেন না কিংবা সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির মতই একজন হবেন অথবা সৃষ্টির গুণাবলীতেই তিনি গুণান্বিত কিংবা তিনি কোন নবীর মারফত কোন শরীয়ত পাঠাননি, সে ব্যক্তি নিশ্চিত নাস্তিক। সে ব্যক্তির অন্তরে না আল্লাহ পাকের কোন মর্যাদাবোধ আছে, আর না তার বুদ্ধ-ব্যবস্থার সাথে পবিত্র মজলিসের কোন সম্পর্ক আছে। সে তো এমন এক খাঁচাবদ্ধ পাখী যে খাঁচায় সূচ্যাগ্র পরিমাণ ছিদ্র নেই। মৃত্যুর পর তার সামনে সব কিছু প্রকাশ পাবে। তখন কোনভাবে তার ফেরেশতা স্বভাবও প্রকাশ পাবে এবং তার আকর্ষণ স্বভাবতঃই স্রষ্টার দিকে হবে। কিন্তু সে আকর্ষণের পথে আল্লাহ পাকের ইলম ও পবিত্র মজলিসের সিদ্ধান্ত অন্তরায়

হয়ে দাঁড়াবে। তখন তার জৈব প্রবৃত্তি অত্যন্ত উত্তেজিত ও হিংস্র হয়ে প্রকাশ পাবে। তার সে অবস্থা দেখে আল্লাহ্ পাক ও সর্বোচ্চ পরিষদ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হবেন। তাকে তখন ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হবে এবং ফেরেশতাদের ওপর ইলহাম হবে তাকে শাস্তি দেবার। ফলে সে নমুনা জগত ও বহির্জগতে শাস্তি ভোগ করবে।

মানুষের জন্যে কাফের হওয়া বড় দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

আল্লাহ্ পাক বলেনঃ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ *

সূরা আর-রাহ্মান ঃ আয়াত ২৯

অর্থাৎ জগতের জন্যে আল্লাহ্ পাক কৌশলগত কারণে বিভিন্ন যুগ ও তার রীতি-নীতি নির্ধারণ করেন। যখনই কোন যুগ শুরু হয় তখন আল্লাহ পাক সকল আকাশে তার বিধান জারী করেন। সর্বোচ্চ পরিষদকে তিনি তার তদারকির কাজে নিয়োজিত করেন। মানব জাতির জন্যেও তিনি বিশেষ শরীয়ত ও কল্যাণ ব্যবস্থা নির্ধারণ করেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা সর্বোচ্চ পরিষদকে ইলহাম করেন পৃথিবীকে সে রীতি-নীতি ছড়িয়ে দেবার ব্যাপারে একমত হতে। তাদের একমত হওয়ার কারণে মানুষের অন্তরে ইলহাম হয় তা গ্রহণের জন্যে। এটাই হচ্ছে আল্লাহর শানের তাৎপর্য। তাঁর চিন্তার শানের এটা খন্ড প্রতিফলন মাত্র। কারণ, তাঁর মৌলিক শান কখনও নতুন ভাবে সৃষ্টি হয় না।

মোটকথা,আল্লাহ্ পাকের এ শানকে যে অস্বীকার করে সে কাফের। কারণ, এ শানতো আল্লাহর মৌলিক অবিনশ্বর শানেরই প্রতিফলন। তাই এ শানের বিরোধিতাকারীর ওপর আল্লাহর অসন্তোষ প্রকাশ পায়। তার ওপর যখন সে অপরকেও সে কাজে বাধ্য করে , তখন সর্বোচ্চ পরিষদের অভিশাপ বর্ষিত হয়।

এ অভিশাপ তাকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে এবং সকল কাজ বরবাদ হয়ে যায়। তার অন্তর কঠিন হয়ে যায়। ফলে তার জন্য কল্যাণকর কোন ভাল কথা গ্রহণ করার ক্ষমতা তার থাকে না। নিম্ন আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছেঃ

"যারা আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হেদায়েতকে মানুষের জন্যে আমি পারিষ্কারভাবে বর্ণনা করার পরেও গোপন করে তাদের ওপর আল্লাহর

অভিশাপ ও অন্যান্য অভিশাপকারীদের অভিশাপ বর্ষিত হয়।"

আল্লাহ পাক আরও বলেনঃ

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ *

সূরা বাক্বারা ঃ আয়াত ৭

"আল্লাহ তাদের অন্তরে সীল মেরে দিয়েছেন এবং তাদের কর্ণকুহরেও।"

এ ধরনের লোক হল সেই খাঁচাবদ্ধ পাখী যার খাঁচায় ছিদ্র আছে বটে, কিন্তু তা আবরণ দিয়ে ঢাকা।

পূর্বোক্ত নাস্তিক ও কাফেরের পরবর্তী স্তর হল তার, যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্ব ও তাঁর মর্যাদায় আস্থাবান বটে, কিন্তু পাপ-পুণ্যের ভিত্তিতে তাকে যেসব বিধি- নিষেধ পালন করতে বলা হয়েছিল তা সে করেনি। এ লোক হল সেই জ্ঞানীর মত যে লোক বীরত্ব ও তার উপকারিতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত বটে, কিন্তু সে নিজে কাপুরুষ। কারণ, বীরত্বের গুণাগুণ জানা আর বীর হওয়া স্বতন্ত্র ব্যাপার। অবশ্য যে ব্যক্তি বীরত্ব সম্পর্কে কোন ধারণাই রাখে না তার চেয়ে সে ভাল। এ লোকটির অবস্থা হল সেরূপ খাঁচায় আবদ্ধ পাখীর মত যে খাঁচায় ছিদ্র আছে, আর যা দিয়ে সবুজ বাগ বাগিচা ও বহুবিধ মজাদার ফলমূল দেখা যাচ্ছে। এমন কি তা দেখে সে পাখা ঝাপটাবার কসরৎ চালাচ্ছে আর ছিদ্র পথে ঠোঁট বাড়াবার চেষ্টা পাচ্ছে। কিন্তু বেরোবার কোন পথ পাচ্ছে না। এরাই কবীরা গুনাহর পাপী।

এ দলের পরবর্তী স্তরে রয়েছে সেই লোক যে পাপ-পুণ্যের বিধি-বিধানগুলো মেনে চলল বটে, কিন্তু যেসব শর্ত পূরণ করে তা পালন করা প্রয়োজন ছিল তা সে করেনি। তার অবস্থা হল সেই পাখীর মত যেটি একটি ভাংগা খাঁচায় আবদ্ধ এবং অনেক কষ্টেসৃষ্টে সে তা থেকে রেহাই পেতে পারে বটে, কিন্তু পালক ও চামড়ার নিরাপত্তা থাকে না। তার এ দুর্গত অবস্থার জন্যে সে অন্যান্য পাখীর সাথে না একত্রে ফলমূল খেতে পারে, আর না আনন্দ করে বেড়াতে পারে। এরা পুণ্যের সাথে পাপ মিশ্রণকারী সগীরা গুনাহর পাপী। নবী করীম (সঃ) পুলসিরাতের হাদীস প্রসঙ্গে বলেনঃ একদল পুলসিরাত থেকে জাহান্নামে পড়ে যাবে। একদল আহত অবস্থায় তা পার হবে। অপর এক দল জাহান্নামের আগুনে জ্বলে মুক্তি পাবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

পরিচ্ছেদ ঃ তেপ্পান্ন

সামাজিক পাপ

জেনে রাখুন, প্রাণীকুলের কয়েক শ্রেণী রয়েছে। এক শ্রেণীতে পোকা, যা মাটিতেই জন্ম নেয়। মহা পরিকল্পনাবিদ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সেগুলোর ইলহাম হয়, কিভাবে তারা মাটি থেকে খাদ্য জোগাড় করবে। তবে কোন পারিবারিক ব্যবস্থাপনার ইলহাম তাদের হয় না। অপর এক শ্রেণীর বাচ্চা বা বংশধর হয়। সেখানে স্ত্রী ও পুরুষ জাতি মিলে-মিশে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করে। তাই আল্লাহ পাক তাদের খাদ্যের ইলহামের সাথে সাথে পারিবারিক ব্যবস্থাপনারও ইলহাম প্রদান করেন। পাখীদের ইলহাম হয়, কিভাবে তারা খাদ্য সংগ্রহ করবে, কিভাবে উড়ে বেড়াবে, কিভাবে যৌথ সম্পর্ক স্থাপন করবে ও কিভাবে বাসা বেঁধে শাবকদের লালন-পালন করবে।

জীব জগতে প্রকৃতিগতই সামাজিক মানুষ। তারা পারস্পরিক সহায়তা ছাড়া বাঁচতে পারে না। কারণ, তারা যেমন ঘাস খেতে পারে না, তেমনি কাঁচা শস্য সব্জীও পারেনা। তাদের গায়ে এমন পালকও নেই যদ্দারা তার শীত নিবারণ হয়। এভাবে আরও বহু ব্যাপার রয়েছে। তাই আল্লাহ পাক তাকে ঘর-সংসার, সমাজ-জমাত ও সরকার, দরবার ইত্যাকার ব্যাপারে ইলহাম করে থাকেন। অন্যান্য জীব থেকে মানুষের পার্থক্য এই যে, অন্যান্য জীবের ইলহাম হয় প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তা পূরণের জন্যে। আর মানুষের ইলহাম হয় জীবনের এক এক অধ্যায়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞান দানের মাধ্যমে। যেমন মানব শিশু কিভাবে স্তন চুষে দুধ পান করবে, কণ্ঠ পরিষ্কার করার জন্যে কিভাবে কেশে নেবে আর দেখার সময় কিভাবে চোখ খুলে নিবে তা তাকে ঠিকমত একই সাথে জানিয়ে দেয়া হয়। কারণ, তার খেয়াল অনুসারেই সব বস্তুই গড়ে উঠে ও গুরুত্ব পায়। সে পারিবারিক ও সামাজিক জ্ঞান লাভ করে প্রচলিত ব্যবস্থা ও রীতি-নীতি থেকে এবং আধ্যাত্মিক আলো থেকে যাদের আল্লাহ সাহায্য করেন তাদের অনুসরণের মাধ্যমে। মূলতঃ শেষোক্ত জ্ঞান তারা অর্জন করে ওহীর মাধ্যমে। তা ছাড়া অভিজ্ঞতা ও গায়েবী ইলহাম থেকে তারা জ্ঞানার্জন করে। কখনও সে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষ উর্ধলোক থেকে জ্ঞানার্জন

করতে পারে। সে জ্ঞান তার উপযোগী একটা রূপধরে ধরা দেয়। মানুষের অবস্থা ভেদে তা ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়।

সব মানুষকে যে জ্ঞান দেয়া হয় তা সে আরব-আজম, শহর-পল্লী যেখানেরই হোক না কেন, আর যে পথেই সে জ্ঞান হাসিল করুক না কেন, তা হচ্ছে কতিপয় স্বভাবের অবৈধতার জ্ঞান। মূলতঃ সেগুলো নিষিদ্ধ না হলে সব নিয়ম-শৃংখলা চুরমার হয়ে যায়। সে স্বভাব হল তিনটিঃ যৌথ অনাচার, হিংস্র আচরণ ও অবিশ্বস্ত কায়-কারবার। এগুলো নিষিদ্ধ হবার দলীল হচ্ছে এই যে, মানব জাতির স্বভাবে কামভাব, আত্মশ্লাঘা ও লালসা বিদ্যমান।

পশুত্ব, পাশবিকতা চরিতার্থের জন্যে স্ত্রী পশুর প্রতি আকৃষ্ট থাকে। সে তার জুটির ব্যাপারে অপরের হস্তক্ষেপ সহ্য করে না। এ স্বভাব মানুষেরও। কিন্তু তফাত এখানে যে, পুরুষ পশু স্ত্রী পশু দখলের জন্যে লড়াই করে এবং শক্তিশালী পশু দুর্বল পশুর উপর জয়ী হয়। ফলে দুর্বলটি পালিয়ে যায়। আর এই অনুপস্থিতির কারণে তার জুটির সাথে সকলের মিলন দেখে না বলে প্রতিশোধ স্পৃহা দেখা দেয় না।

পক্ষান্তরে মানুষকে অত্যন্ত অনুভূতিশীল ও সচেতন করে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে অনুমান দ্বারা একটা ব্যাপারকে এরূপ অনুভব করে যেন সে তা দেখতে পাচ্ছে কিংবা শুনতে পাচ্ছে।

তবে মানুষকে এ বিবেক দান করা হয়েছে যে, এসব ব্যাপার লড়াইয়ে লিপ্ত থাকা হলে রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতা ছাড়া রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে নারীর চাইতে পুরুষের দখল বেশী। তাই আল্লাহ পাক তাদের এ বিবেক দিয়েছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্ত্রী নিয়েই তৃপ্ত থাকবে, তার অন্য ভায়ের স্ত্রী নিয়ে হাংগামা বাঁধাবে না।

ব্যভিচার নিষিদ্ধ হওয়ার এটাই স্বাভাবিক কারণ। স্ত্রী নির্দিষ্ট করে নেয়ার ব্যাপারে সামাজিক রীতি কিংবা শরীয়ত সহায়ক হয়।

মানুষের ভেতরে পশুর স্বভাবের আরেকটি সাযুজ্য এই যে, পশুর পুরুষ আকর্ষণ যেরূপ স্ত্রী পশুর দিকে ঠিক তেমনি পুরুষ লোকের যদি বিবেক ঠিক থাকে, তাহলে স্ত্রী লোকের দিকেই আকর্ষণ দেখা দেয়। বিকত বিবেক

ছাড়া কখনও পুরুষের দিকে পুরুষের যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না। অবশ্য যেমন কোন কোন পুরুষের সেরূপ বিকৃতি দেখা দেয়। কোন কোন লোক মাটি কিংবা কয়লা খেতে স্বাদ পায়, এও ঠিক তেমনি ব্যাপার। সে ব্যক্তির স্বাভাবিক রুচি ও স্বভাবে চরম বিকৃতি থাকে। এ বিকৃত কাজের অভ্যেস তার মন-মেজাজ বদলে ফেলে ও সে রুগ্ন মানসিকতার অধিকারী হয়। এ বদ অভ্যেস মানুষের বংশধারা সৃষ্টির মূলে কুঠারাঘাত করে। কারণ, যে যৌন শক্তি আল্লাহ পাক মানুষের বংশ ধারা সম্প্রসারণের জন্যে প্রদান করেছেন, তা যদি বিপথে বিনষ্ট করা হয়, তখন মানব সমাজে বিপর্যয় দেখা দেয়। এ কারণেই মানুষ স্বভাবতঃই সে কাজকে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় মনে করে। তাই কোন পাপী বদকার যদি তা করে, তবে অতি সংগোপনে করে থাকে। তার এ কাজ বাইরে জানাজানি হোক তা সে কখনও চায় না। যদি কেউ এ ধরনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে, তখন সে লজ্জায় মরে যায়। হাঁ যদি সে পুরোপুরিই মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে তখনই কেবল তার পক্ষে প্রকাশ্যে এ কাজ করা সম্ভব হয়। মানুষ যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহর গজব নাযিল হতে আর বিলম্ব হয় না। যেমন. হযরত লূত (আঃ)-এর যুগে হয়েছিল। এ কারণেই সমকামিতা নিষিদ্ধ হয়েছে।

মানুষের জীবিকা পদ্ধতি, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যেহেতু জ্ঞান ও ভাল- মন্দ বাছাই শক্তি ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না এবং মদ্যপ ব্যক্তির মদ্য পানের মাতলামী যেহেতু শান্তি-শৃংখলার জন্য ক্ষতিকর ও প্রতিবন্ধক হয়, এমনকি তা দাংগা-হাংগামা সৃষ্টিরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাই তা নিষিদ্ধ হওয়া মানুষের স্বভাবগত দাবী। কিন্তু কিছু লোক এ ক্ষতিকর অভ্যেসের শিকার হয়ে পড়ায় তারা নীচ প্রকৃতির কাজ অনুসরণ করে। ফলে সমাজের শান্তি-শংখলা বিনষ্ট হয়। যদি এটা নিষিদ্ধ করা না হত, তাহলে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হত। মদ হারাম হওয়ার এটাই স্বাভাবিক কারণ। এ নিষিদ্ধতার সবিস্তার আলোচনা আমি শরীয়তের দৃষ্টি ভংগী বর্ণনার সময় করব।

পশু যদি কোন লক্ষ্য অর্জনে বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে যেভাবে ক্ষিপ্ত হয়, মানুষও তেমনি হয়ে থাকে। কোন দৈহিক বা মানসিক আঘাতও তাকে ক্ষিপ্ত করে। তবে পশু ও মানুষের ভেতর তফাত এই যে, পশু জৈব ও খেয়ালী লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ধাবিত হয়, আর মানুষ জৈব বা জ্ঞানগত লক্ষ্য

অর্জনের চেষ্টা করে থাকে। তবে পশুর তুলনায় মানুষের লালসার মাত্রা বেশী। তেমনি পশু পরস্পর লড়াই করে বটে, কিন্তু যেটি পরাজিত হয়ে পালায় সেটির ভেতরে আর কোন প্রতিশোধ স্পৃহা কাজ করে না। হ্যাঁ, কোন কোন পশু এর ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন উট, গরু, ঘোড়া। কিন্তু মানুষ স্বভাবতঃই শত্রুর শত্রুতা ভুলতে পারে না। এখন যদি মুক্তভাবে শত্রুতার লড়াই করতে দেয়া হয়, তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্রে অশান্তি-অরাজকতা দেখা দেবে ও জীবন-জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। এ কারণেই তাদের বিবেক দেয়া হল যে, এরূপ খুনখারাবি ও দাংগা-হাংগামার কাজ নিষিদ্ধ ও অন্যায়। হাঁ বিশেষ কল্যাণ সাধনার্থে হত্যা করা যেতে পারে। যেমন-হত্যার পথ বন্ধ করার জন্য হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান।

এ মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে কারো অন্তরে হিংসা-দ্বন্দ্বের আগুন জ্বলতে থাকলেও হত্যাকাণ্ড ঘটাতে বিরত থাকবে।

কেউ কেউ তার প্রতিশোধস্পৃহা বা হিংসা-দ্বেষের প্রতিফলন সরাসরি হত্যা কাণ্ডের মাধ্যমে না ঘটিয়ে বিষ প্রয়োগ বা যাদু-টোনার সাহায্যে হত্যা কার্য সাধন করে। এ কাজটি মানুষের বিবেচনায় সরাসরি হত্যার চাইতেও জঘন্য। কারণ, প্রকাশ্য আক্রমণ থেকে মানুষ আর না হোক পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু গোপনে বিষ প্রয়োগ বা যাদু-টোনা থেকে আত্মরক্ষার কোন সুযোগ থাকে না।

কেউ আবার তার হত্যাস্পৃহা চরিতার্থ করে রাষ্ট্রনায়কের কাছে অপবাদ ও চোগলখুরীর মাধ্যমে কিংবা মিথ্যা অভিযোগ সৃষ্টি করে। এ কাজগুলোও মানুষ অন্যায় ও নিষিদ্ধ ভেবে থাকে।

আল্লাহ পাক বান্দাদের জন্যে রুজী-রোজগারের বিভিন্ন ব্যবস্থা রেখেছেন। যেমন, বৈধ যমীন থেকে শস্য উৎপাদন, পশু পালন, কৃষিকাজ , নানাবিধ শিল্প ও কারিগরী কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি। এ ছাড়াও রয়েছে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব পালন। এ ছাড়াও বিভিন্ন পেশায় কাজ করা হয় বটে, কিন্তু সভ্য সমাজে তার কোন ঠাঁই নেই।

কোন কোন লোক ক্ষতিকর পেশায় নিয়োজিত। যেমন–চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি। এগুলো দেশের জন্য ধ্বংসকর পেশা। তাই মানবের বিবেক সাক্ষ্য

দিল যে, এগুলো অবৈধ কাজ। সমগ্র মানব জাতি এ ব্যাপারে একমত। কিছু নাফরমান লোক প্রবৃত্তির তাড়নায় এ পেশা অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে ইনসাফগার শাসকমণ্ডলী এরূপ অসৎ পেশাদারদের বিলোপ সাধনের জন্যে সার্বিক প্রয়াস চালিয়ে আসছেন। তাই কিছু লোক শাসকমণ্ডলীর এ প্রয়াস থেকে বাঁচার জন্যে মিথ্যা দাবী, মিথ্যা ভাষণ ও মিথ্যা সাক্ষী, মাপে কম দেয়া, জুয়া খেলা, সুদ খাওয়া ইত্যাদি পেশা ধরেছে। অথচ এগুলোও ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ পেশা। এমনকি ভারি ট্যাক্স-খাজানা চাপানোও ডাকাতি, এমনকি ডাকাতির চেয়েও জঘন্য কাজ।

মোটকথা সমাজ ও রাষ্ট্রের এসব ক্ষতিকর কাজ মানব মনে আবহমান কাল থেকে নিষিদ্ধ পেশা বলে বদ্ধমূল হয়ে আছে। ফলে বুঝ-জ্ঞানের অধিকারী মানুষেরা বংশ পরম্পরায় এসব কাজ নিষেধ করে আসছে। পরিণামে এ নিষিদ্ধতা সামাজিক রীতি-নীতিতে পরিণত হয়েছে। তাই তা এখন আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে। এ অপরাধের সাথে স্বভাবতঃই সর্বোচ্চ পরিষদের ঘৃণা সংযুক্ত হয়েছে। তাই মানুষের অন্তরে ইলহাম হয়েছে যে, এগুলো হারাম কাজ। এ ধরনের পেশাদারদের প্রতি সর্বোচ্চ পরিষদ অত্যন্ত রুষ্ট হন। কেউ জ্বলন্ত অংগারে পা রাখলে যেভাবে তার কষ্ট প্রতিটি অনুভূতি ইন্দ্রিয়কে তোলপাড় করে তোলে, তাদের অবস্থা তা-ই হয়। তাদের এ কষ্টের ফলে আগুনের বেড়ী সৃষ্টি হয় এবং তা অপরাধীকে ঘিরে ফেলে। তখন অন্যান্য কর্মরত ফেরেশতাদের অন্তরে এ ইলহাম হয় যে, তাকে কষ্ট ও শাস্তি দিতে হবে। ফলে তার জন্যে যা কিছু বরাদ্দ ছিল অর্থাৎ ফেরেশতাদের তার ব্যাপারে যে সব কল্যাণ সাধনের ইলহাম হয়েছিল তা তার জন্য আরও প্রশস্ত করে দেয়া হয়। তার রুজী ও আয়ু বেড়ে যায়। তারপর যখন তারা তা পূর্ণ করে মারা যায় তখন আল্লাহ পাক তাদের ইনসাফের জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসেন। যেমন তিনি পাক কালামে বলেন ঃ-

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ *

সূরা আর-রাহমান ঃ আয়াত ৩১

অর্থাৎ হে জ্বিন ও ইনসান! শীঘ্রই আমি তোমাদের হিসেব নিতে অবকাশ নিয়ে বসব। বস্তুত তখন তিনি তাদের পাপের যথাযোগ্য শাস্তি দেবেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

পরিচ্ছেদ ঃ চুয়ান্ন

জাতি-ধর্মের ব্যবস্থাপনা

ধর্মীয় সম্প্রদায় ও ধর্ম নায়কদের প্রয়োজন ও গুরুত্ব

আল্লাহ্ পাক বলেনঃ-

إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ *

সূরা রা'দ ঃ আয়াত ৭

"তুমি শুধুই সতর্ককারী; প্রত্যেক জাতির জন্য প্রদর্শক রয়েছে।"

স্মরণ রাখা দরকার, পশু প্রবৃত্তিকে বিবেকের নিয়ন্ত্রণে রাখার পদ্ধতি ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত পাপাচার সম্পর্কিত জ্ঞান যে কোন বিবেক সম্পন্ন জ্ঞানীরই রয়েছে। তারা তার কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু সাধারণ মানুষ সে সব ব্যাপারে বেখবর। কারণ, তাদের উন্নয়নের পথে বহু অন্তরায়। ফলে তাদের আত্মিক শক্তিগুলো নিস্তেজ হযে যায়। রুগ্ন ব্যক্তির কাছে যেমন সব ভাল খাবারই বিস্বাদ ও তিক্ত হয়ে যায়, তাদের অবস্থাও তা-ই হয়। ফলে নিজের ভাল-মন্দ যাচাইয়ের ক্ষমতা তার থাকেনা। তাই তাদের এমন এক আলেমের মুখাপেক্ষী হতে হয় যিনি সঠিক পথের দিশারী হবার জ্ঞান রাখেন। তিনিই তাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় পথ নির্দেশ করবেন। তিনি তাদের সঠিক পথে চলার প্রেরণা জোগাবেন এবং বিপথে যাওয়া থেকে সতর্ক করবেন।

কিছু লোক এমন রয়েছে যারা মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়ে থাকে। তাদের উদ্দেশ্যই হয় সঠিক পথের বিরোধিতা করা। তারা নিজেরা ভ্রান্ত বলেই অন্যদেরও ভ্রান্ত পথে ডাকে। এ ধরনের লোকদের পুরোপুরি নির্মূল করা ছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্র ঠিক হতে পারে না।

কিছু লোক এমন রয়েছে যাদের কিছু না কিছু সঠিক ধারণা রয়েছে। তারা আংশিক ও অসম্পূর্ণ হেদায়েতের অধিকারী হয়। হেদায়েতের কিছু কথা তাদের মনে থাকে ও কিছু কথা ভুলে যায়। তারপর তারা নিজেদের পূর্ণ হেদায়েতপ্রাপ্ত ভেবে চলে এবং এ ব্যাপারে কারো সাহায্য বা পথ নির্দেশনা প্রয়োজন মনে করে না। তারা এমন এক পথ প্রদর্শকের

মুখাপেক্ষী যিনি তার ভুল ধরিয়ে দিতে পারেন! মোট কথা মানুষ এমন একজন যথার্থ আলেমের মুখাপেক্ষী যিনি নিজে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত।

শহরের যদিও অধিকাংশ নাগরিক রুজী-রোজগারের জ্ঞান রাখে এবং সমাজ ও সভ্যতার পরিমার্জন ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন সম্পর্কে নিজেরাই ধারণা রাখে, তথাপি তারা এমন এক ব্যক্তিত্বের মুখাপেক্ষী থাকে যিনি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত এবং জনগণের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে পারে!

একটি শহরের জন্যেই যখন একজন পথ প্রদর্শক মহাজ্ঞানী ব্যক্তি প্রয়োজন হয়, তখন যে বিরাট জাতির ভেতর বিভিন্ন যোগ্যতা সম্পন্ন বহু প্রতিভা বিদ্যমান, তাদের প্রদর্শক থাকার কি কোন প্রয়োজন নেই? এ ধরনের পথ প্রদর্শক পথ সম্পর্কে শুধু পবিত্র স্বভাবের সচেতন ব্যক্তিরাই যথার্থ সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে। তাঁরা সেই শ্রেণীর লোকই হয়ে থাকেন যারা মানবতার জগতে সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন থাকেন। এদের সংখ্যা অবশ্যই নগণ্য হয়ে থাকে।

লোহারী কিংবা সুতারীর কাজেও যদি পূর্ব পুরুষের অনুসরণ ও ওস্তাদের শিক্ষা গ্রহণ অত্যাবশ্যক হয় তো আপনারা পথ প্রদর্শক ও শিক্ষক ছাড়া সেই মহান উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে বলে আশা করেন যার অনুধাবনের ক্ষমতা কেবল আল্লাহ যাদের দেন তারা লাভ করে থাকে! একমাত্র নিষ্ঠাবান নিঃস্বার্থ ব্যক্তি ছাড়া সে পথের দিকে কেউ আকৃষ্ট হয় না।

এ ধরনের পথ প্রদর্শক আলেমের জন্যে প্রয়োজন হল খোলাখুলি ভাবে মানুষের কাছে এটা প্রমাণ করা যে, তিনি সঠিক পথের বিশেষজ্ঞ, তাঁর কথাবার্তা ভুল-ভ্রান্তি আর বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত ও পবিত্র এবং তিনি হেদায়েত ও ইসলাহের একটি অংশ অনুসরণ করে অন্য কোন জরুরী অংশ বর্জন করেন না। এটা দু ভাবে হতে পারে। এক, তিনি যে ব্যক্তিত্বের বরাত দিয়ে দলীল পেশ করবেন সেই ব্যক্তিত্বটি সর্বজন শ্রদ্ধেয় নির্ভরযোগ্য হতে হবে। তা হলে কেউ কোন ব্যাপারে প্রশ্ন তুললে তাঁর বরাত দিয়ে প্রশ্নকারীকে নিরস্ত করা যাবে। দুই, তিনি নিজেই এমন ব্যক্তিত্ব হবেন যার ব্যাপারে কোন বিতর্ক নেই এবং সবাই তাঁর সততার ব্যাপারে এক মত।

সারকথা হল এই, মানুষের জন্যে এমন এক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যিনি

নিষ্পাপ, এবং যার নিষ্কলুষতা সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই। পরন্তু তাঁর প্রতিটি বক্তব্য ও বর্ণনা নির্ভুল বলে প্রমাণিত।

এখন এতটুকু জানা দরকার যে, লোকটির আনুগত্য সম্পর্কিত পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে বিধায় তিনি উত্তম তরীকা সৃষ্টি করতে পারেন। পরন্তু তিনি তরীকার ভাল-মন্দ হওয়ার কারণগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন। এ গুলো না কোন দলীল-প্রমাণ দ্বারা জানা যায়, না পার্থিব প্রয়োজন মিটাবার জ্ঞান দ্বারা তা পাওয়া যায়। এমন কি কোন ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারাও তা লাভ করা যায় না। এটাতো এমন ব্যাপার যা কেবল আল্লাহই উপলব্ধি করে থাকেন। ক্ষুৎপিপাসা কিংবা ওষুধের উষ্ণতা বা শীতলতা যেরূপ আত্মাই জানতে পায়, তেমনি কোন জিনিস আত্মার অনুকূল বা প্রতিকূল তা শুধু সুস্থ অভিরুচিই জানতে পায়।

উক্ত ব্যক্তির ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকার পথ এই যে, আল্লাহ পাক তার ভেতর এমন জ্ঞান দান করেন যা দ্বারা সে জ্ঞাত ও অনুভূত ব্যাপারগুলো সঠিক কি বেঠিক তা বুঝতে পায়। দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি যেভাবে কোন বস্তু দেখেই তা যথাযথ ভাবে বুঝতে পায় এবং তার এ সন্দেহ জাগে না যে, তার দৃষ্টিভ্রম ঘটেছে কিংবা সে যা দেখছে তা থেকে বস্তুটি ভিন্ন কিছু, এও ঠিক তেমনি ব্যাপার। ভাষার ক্ষেত্রে যে শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সে শব্দটি সেই অর্থে ব্যবহার করার অর্থাৎ পানিকে পানি ও মাটিকে মাটি বলার পর যেরূপ কারো সন্দেহ থাকে না যে, সেটি কোন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করবে, এটাও তেমনি ব্যাপার। এ জ্ঞানের জন্যে না কোন বুদ্ধিলব্ধ দলীল থাকে, না এ শব্দের সাথে অর্থের কোন যুক্তিগত অপরিহার্যতা রয়েছে। তথাপি আল্লাহ পাক এগুলোর স্পষ্ট জ্ঞান মানুষের স্বভাবগত করে দিয়েছেন। অধিকাংশ লোকের ভেতর এ ভাবের সৃষ্টি হয় যে, তাদের ভেতর স্বভাবগত এক প্রতিভা প্রদত্ত হয় আর তার সাহায্যে তারা যথাযথ ভাবেই প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলো জেনে ফেলে। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সর্বদা তারা যেগুলোকে তাদের জ্ঞানের অনুকূলই দেখতে পায়।

ঠিক এ পথেই সাধারণ মানুষের সেই পথপ্রদর্শকের নিষ্পাপ হবার জ্ঞান অর্জিত হয়। তাদের প্রতীতি ও বহুল প্রচারিত দলীল-প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দেয় যে, লোকটি যে পথে ডাকছে এবং যা বলে ডাকছে তা সব

সত্য । কারণ, তার সর্বজন প্রশংসিত গুণাবলী এ কথাই বলে দেয় যে, তিনি যা বলেন তা মিথ্যা হতে পারে না।

কখনও তার প্রভাব এভাবে সৃষ্টি হয় যে, তার ব্যক্তিত্ব থেকে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির নিদর্শন ঠিকরে পড়ে। তার থেকে মুজিযা প্রকাশ পায় ও তার যে কোন দোয়া কবুল হয়। ফলে জনমানুষের প্রত্যয় জন্মে যায় যে, আসমানী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তার কোন মর্যাদাকর ভূমিকা রয়েছে। এমন কি তার আত্মা সে সব পবিত্র আত্মার অন্যতম যার সাথে ফেরেশতাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। তারা এও বিশ্বাস করে যে, এ ধরনের লোক কখনও আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলতে পারে না।

বস্তুতঃ এরূপ ব্যক্তিকে মানুষ সমবেতভাবে তার সন্তান, সম্পদ, এমন কি জীবন ধারণের শীতল পানি থেকেও অধিক ভালবাসে। এ ধরনের ব্যক্তিত্ব ছাড়া কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের ভেতর কখনও উদ্দিষ্ট বিশেষ রং সৃষ্টি হয় না। মানুষ সেই ধরনের ইবাদতেই লিপ্ত যা তারা অনুরূপ ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। তারা তাঁর জীবনের অলৌকিক ব্যাপারগুলো পুরোপুরি বিশ্বাস করে, হোক সে বিশ্বাস ঠিক কিংবা ভুল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

পরিচ্ছেদ ঃ পঞ্চান্ন

নবুওয়াতের হাকীকত

স্মরণ রাখতে হবে যে, মানব সমাজে সব চাইতে সমঝদার ব্যক্তিরাই সর্বোচ্চ মর্যাদায় থাকে। তারা পারিভাষিক ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাদের ফেরেশতা স্বভাব তথা বিবেক অত্যন্ত সবল হয়ে থাকে। তারা সদিচ্ছা নিয়েই অভীষ্ট অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। সর্বোচ্চ পরিষদ থেকে তাদের ওপর সর্বোত্তম জ্ঞান ও ঐশী কার্যাবলী অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

এক, সমঝদারের চরিত্র হল এই যে, তার স্বভাব-প্রকৃতি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ হয়। কোন আবেগ প্রসূত খেয়াল তাকে কখনও অস্থির করে না। তার কোন প্রান্তিক চিন্তা-ভাবনাও থাকেনা। ফলে তিনি শুধু সামষ্টিক জিনিসই দেখেন না; বরং তার প্রতিটি অংশ দেখতে পান। তিনি মানুষের

দেহ ও আত্মা সবই দেখে থাকেন, তিনি এমন মেধাহীনও নন যে, শুধু অংশ বিশেষই দেখেন, কিন্তু তার সামগ্রিক রূপ দেখতে পান না। তেমনি তিনি দেহ থেকে আত্মায়ও পৌঁছতে সক্ষম নন। তিনি সঠিক পদ্ধতির সর্বাধিক অনুসারী ও ইবাদতে সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারীদের সাথে কার্যকলাপে সাফগার ও তাদের ব্যাপারে পরিপূর্ণ তদারককারী হয়ে থাকেন। তাছাড়া জনকল্যাণমূলক কাজে তিনি অত্যন্ত আগ্রহশীল হন। বিশেষ কারণ ছাড়া তিনি কাউকে কষ্ট দেন না। যেমন জনকল্যাণের স্বার্থেই কেবল তিনি কাউকে শাস্তি দেন। তিনি সর্বদা অদৃশ্য জগতের দিকে আকৃষ্ট থাকেন। তাঁর কথায় ও চেহারায় এ সত্যটি প্রতিভাত হয়। তাঁর প্রতিটি কাজে বুঝা যায় যেন তিনি অদৃশ্য জগতের সাহায্য পাচ্ছেন । তাঁর সাধারণ সাধনায়ই নৈকট্য ও স্বস্তির দরজা উন্মুক্ত হয়। অথচ অন্যান্যের তা হয় না।

এ সমঝদার শ্রেণী আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত। তাদের যোগ্যতায়ও তারতম্য রয়েছে। যেমন ঃ-

১। সাধারণতঃ যার আল্লাহর তরফ থেকে এরূপ জ্ঞানরাশি অর্জিত হয়েছে যা আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখার জন্যে যথেষ্ট, তাকে বলা হয় পরিপূর্ণ সমঝদার।

২। সাধারণতঃ যার চারিত্রিক উৎকর্ষ ও যথাযথ জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তাকে বলা হয় হেকীম বা বিজ্ঞজন।

৩। সাধারণতঃ যার রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জিত হয় ও জনগণের কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দূর করার তাওফিক হাসিল হয় তাকে বলা হয় খলীফা।

৪। সাধারণতঃ সর্বোচ্চ পরিষদে যার উপস্থিতি সম্ভব হয় এবং সেখানকার ফেরেশতারা যাকে শিক্ষা দেয়, তারা যার সাথে কথা বলে, তাদের যে দেখে ও যার বিভিন্ন ধরনের কারামত প্রকাশ পায়, তাকে বলে পবিত্র আত্মার সাহায্য-প্রাপ্ত ব্যক্তি।

৫। যার অন্তর ও মুখ নূরময় হয়ে যায়, যার সাহচর্য ও উপদেশ দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, যার সহচর ও সহযোগীরাও নূরে উদ্দীপ্ত ও প্রশান্ত হয় যার বরকত ও উছিলায় সেও পূর্ণত্বে পৌঁছে থাকে এবং তাদের হেদায়েতের জন্য যে সর্বদা উদগ্রীব থাকে, তাকে পথপ্রদর্শক ও পরিচালক বলা হয়।

৬। যার বিশেষ সম্প্রদায় বা জাতির রীতি-নীতি ও ভাল-মন্দ জ্ঞান অর্জিত হয় ও সে বিলুপ্ত ও হৃত রীতিনীতি পুনঃ প্রবর্তনে উদ্যোগী হয় তাকে ইমাম বলা হয়।

৭। যার অন্তরে এ কথার উদ্রেক হয় যে, সে মানব মন্ডলীকে আসন্ন পার্থিব বিপদাপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেবে কিংবা সে আত্মিক উপলব্ধির মাধ্যমে জানতে পায় যে, মরণোত্তর জীবনে কবর ও হাশরে মানুষের কি দুর্গতি হবে আর সে জন্যে সে তাদের সতর্ক করে থাকে, তাকে বলে সতর্ককারী বা নাজীর।

আল্লাহ পাকের কার্যকৌশলের যখন এটাই দাবী হয় যে, তিনি তার এমন এক সমঝদার বান্দাকে সৃষ্টিকুলে প্রেরণ করবেন যিনি মানব মন্ডলীর আঁধার-পুরী থেকে আলোর জগতে আসার উপলক্ষ হবেন, তখন তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে তার আনুগত্য ও অনুসরণ অপরিহার্য করে দেন। সর্বোচ্চ পরিষদেও তখন তার অনুগত ও অনুসারীদের ওপর সন্তোষ প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। তেমনি তার বিরোধী ও শত্রুতা পোষণকারীর ওপর তাদের অভিসম্পাত বর্ষণের সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। আল্লাহ্ পাক মানুষের অন্তরে অনুসরণ ও সহায়তার প্রেরণা সৃষ্টি করে থাকেন। ইনিই হলেন নবী।

তার ভেতর শ্রেষ্ঠতম নবী তিনিই যার প্রেরণের পেছনে কোন উদ্দেশ্য থাকে। তা হচ্ছে এই, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন যে, তার মাধ্যমে মানব জাতিকে তিনি আঁধারপুরী থেকে আলোর জগতে নিয়ে আসবেন। তার জাতিকে তিনি সর্বোত্তম আলোর দিশারী জাতি হিসেবে মনোনীত করবেন। আর তাই তা প্রেরণ অন্যান্যদের প্রেরণের প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়। এ শ্রেষ্ঠতম নবীর প্রথম প্রেরণ প্রসংগে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ-

هُوَالَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ *

সূরা জুমআ ঃ আয়াত ২

অর্থাৎ, তিনি আল্লাহ যিনি নিরক্ষর মানুষদের ভেতর থেকেই তাদের জন্য নবী পাঠিয়েছেন।

আর দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রেরণ প্রসংগে আল্লাহ্ বলেন ঃ-

كُنْتُمْ خَيْرَاُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ *

সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১১০

অর্থাৎ, তোমরা এমন এক উত্তম জাতি যাদের মানবজাতির জন্য বাছাই করা হয়েছে।

হুজুর (সঃ) বলেন ঃ "তোমাদের আরাম দেয়ার জন্যেই পাঠানো হয়েছে, কষ্ট দেয়ার জন্যে নয়।"

আমাদের মহানবী (সঃ) মূলতঃ সমঝদারীর যাবতীয় বিষয়গুলোর ওপর দখল রাখতেন। পরন্তু তিনি উল্লিখিত দু'স্তরের প্রেরণকার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তাঁর পূর্ববর্তী নবীরা দু'এক বিষয়ে দক্ষ হতেন।

স্মরণ রাখুন, আল্লাহ পাকের কর্মকৌশলে প্রেরণ কার্যকে এ জন্যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, মানুষের কল্যাণ সাধন কেবল সেই পথেই সম্ভব হতে পারে। এর তত্ত্ব কেবল আলেমুল গায়েবই ভাল জানেন। অবশ্য আমরা শুধু এতটুকুই জানি যে, নবী প্রেরণের জন্যে কয়েকটি জরুরী কারণ থাকে। সে কারণগুলোর সাথে প্রেরণ কার্যটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

রাসূলের আনুগত্য এ জন্যে অপরিহার্য যে, আল্লাহ তাআলার ইলমে এটা রয়েছে যে, কোন জাতির সংস্কার ও পরিশুদ্ধি শুধু আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর ইবাদতের ভেতরে নিহিত রয়েছে। অথচ তারা এরূপ যোগ্যতা রাখেনা যে, সরাসরি তারা আল্লাহ পাকের জ্ঞান থেকে কিছু অর্জন করবে। তাই তাদের পথপ্রাপ্তি ও সংশোধনের একমাত্র পথ হল নবুওয়াতে আনুগত্য। অতঃপর আল্লাহ তাআলা পবিত্র মজলিসে এ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, নবীর অনুসরণ সবার জন্যে ফরজ। এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে নতুন অনুশাসনের আগমন ঘটে ও পূর্ব অনুশাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তখন আল্লাহ পাক এমন একজন লোক পাঠান যিনি নতুন অনুশাসনের সহায়ক ও অনুগামীদের জীবন ব্যবস্থা পরিশুদ্ধ করেন। যেমন, আমাদের মহানবীর (সঃ) আবির্ভাব।

কখনও বা আল্লাহ পাকের দরবারে কোন এক জাতির অস্তিত্ব সৃষ্টি ও অন্যান্য জাতির ওপর তাদের প্রভাব বিস্তারের সিদ্ধান্ত হয়। তখন তিনি এমন একজন লোক পাঠান যিনি তাদের বক্রতা ও ভ্রষ্টতা দূর করেন এবং তাদের আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দেন। যেমন, হজরত মুসা (আঃ) এ জন্যে প্রেরিত হন।

কখনও কোন জাতির আধিপত্য ও জীবন ব্যবস্থা অবশিষ্ট রাখা আল্লাহ পাকের মর্জি হয়, তখন তিনি সে ব্যবস্থা আঞ্জাম দেয়ার জন্য সহায়ক নবী বা মোজাদ্দেদ পাঠান। যেমন, হজরত দাউদ (আঃ), হজরত সোলায়মান (আঃ) ও বনী ইসরাঈলের অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম। আল্লাহ্ পাক বলেন, তিনি তাঁর নবীদের তাদের বিরোধীদের ওপর বিজয়ী করবেন। যেমন, তিনি বলেন ঃ

وَهٰؤُلَاءِ الْاَنْبِيَاءُ قَدْ قَضَى اللّٰهُ بِنُصْرَتِهِمْ عَلٰى اَعْدَائِهِمْ *

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا بِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ- اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ- وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ *

সূরা ছাফ্যাত ঃ আয়াত ১৭১-১৭৩

অর্থাৎ, আমার প্রেরিত বান্দাদের আমি আগেই বলে দিয়েছি নিঃসন্দেহে তারাই মদদপ্রাপ্ত আর অবশ্যই আমার সেনাদল বিজয়ী।

উক্ত নবীদের ছাড়া আরও এমন লোক রয়েছেন যাদের প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ করার জন্য পাঠানো হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

যখন কোন জাতির কাছে কোন নবী পাঠানো হয় তখন সে জাতির জন্যে ফরজ হয়ে যায় তাকে মেনে নেয়া ও অনুসরণ করা, যদিও তারা পূর্ব থেকেই কোন সত্য নবীর অনুসারী হয়ে থাকে। কারণ, নবীর মত কোন উঁচু স্তরের বান্দার বিরোধীতা করলে তা সর্বোচ্চ পরিষদের অভিশাপ বর্ষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং নবীর বিরোধীদের লাঞ্ছিত করার ব্যাপারে সবাই একমত হয়ে যায়। ফলে তাদের পক্ষে আর আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের পথ খোলা থাকে না। তখন তাদের সব পরিশ্রম ও সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়। এ ধরনের নবী বিরোধী কেউ মারা গেলে তাকে অভিশাপ গ্রাস করে নেয়।

অবশ্য স্মরণ রাখা চাই যে, যা বললাম তা নীতিগত কথা বললাম যার বাস্তবতা রয়েছে। ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের দিকে তাকিয়ে এর বাস্তবতা অনুধাবন করা যায়। তারা দ্বীনের ব্যাপারে কতভাবে বাড়াবাড়ি করেছিল। আল্লাহর কিতাবে তারা বিকৃতি আনল। তাদের জন্যে নবীর প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। আল্লাহ পাকের নবী পাঠানোর মৌল কারণ এটাই যে, মানুষ জন্মগতভাবে এ যোগ্যতা নিয়ে আসে না যে, কোন মাধ্যম ছাড়াই তারা তাদের ভাল-মন্দের ব্যাপারগুলো সব জানতে বা বুঝতে পারে। হয় তাদের এ ক্ষেত্রে যোগ্যতার অভাব থাকে যা পয়গাম্বরের মাধ্যমে দূর হয় অথবা তাদের ভেতরে এমন দোষ-ত্রুটি থাকে যা ভয়-ভীতি ও জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে দূর করতে হয়। সেটাও নবীরা পরকালীন ভয়-ভীতি ও ইহকালীন শাস্তির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করেন।

বস্তুত বিভিন্ন উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের কারণ দেখা দেয়ায় আল্লাহ পাকের এটাই সিদ্ধান্ত হয় যে, কোন পবিত্র ব্যক্তির কাছে তিনি ওহী পাঠাবেন। আর সেই লোক মানবমণ্ডলীকে সত্য ও ন্যায়ের পথে ডাকবে ও তাদের সহজ-সরল পথে চালাবে। তার উদাহরণ এই যে, কোন এক মালিকের ভৃত্য অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন সেই মালিক তার বিশেষ কোন পার্শ্বচরকে পাঠালেন তাকে যেভাবেই হোক তিক্ত ওষুধ সেবন করানোর জন্য। এখন যদি সে এসে তাকে জোর-জবরদস্তি করে ওষুধ খাওয়ায় সেটাও ন্যায় কাজ হত। কিন্তু আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ মায়া-মমতার এটাই বহিঃপ্রকাশ যে, পয়লা এসে তাঁর লোক জানিয়ে দিল, তুমি অসুস্থ। তাই এ ওষুধ সেবন করলে তুমি সুস্থ ও উপকৃত হবে। তাদের আস্থা সৃষ্টির জন্যে প্রেরিত লোকটির দ্বারা কিছু অলৌকিক ব্যাপারও তিনি ঘটিয়ে থাকেন। তার ফলে রোগীরা বুঝতে পারে, লোকটি যা বলছে তা সত্য। লোকটি তিক্ত ওষুধে মিষ্টি মিশিয়ে তা সেবন করায়। সে এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিচক্ষণতা নিয়ে কাজ করে এবং যেভাবে তাকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেভাবেই সে তা সম্পন্ন করে।

মু'জিযা ও দোয়া কবুলের ব্যাপারটি যদিও নবুওয়াতের অংশ নয়, তথাপি তা নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে সহায়ক হয়ে থাকে। বড় বড় মু'জিযা দেখা দেয়ার কারণ তিনটি।

১। মু'জিযা প্রকাশকারী নিজে অন্যতম সমঝদার। সে কারণে কিছু কিছু ঘটনা তার কাছে ধরা দেয়। দোয়া কবুলের এটা কারণ হয়ে থাকে। তাই সে যে জিনিসে বরকত হওয়ার দোয়া করে, তাতে বরকত দেখা দেয়। অবশ্য বরকত দেখা দেয়ারও বিভিন্ন রূপ রয়েছে। কখনও জিনিসে যথেষ্ট মুনাফা হয়। যেমন, অল্প সংখ্যক সৈন্যকে বহু সংখ্যক বলে মনে হয়, আর তা দেখে শত্রু বাহিনীর মনোবল ভেংগে যায়। এমনকি তারা ভয়ে পালিয়ে যায়। কখনও খাদ্য বস্তুর ভেতরে এরূপ গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয় যে, যে খায় সে অল্প খেয়েই ভাবে অনেক বেশী খেয়েছে। তাই অল্প খাদ্য সামগ্রী বহু লোক মিলেও খেয়ে শেষ করতে পারে না। অথবা সেই বস্তুকেই পরিমাণে এমনভাবে বাড়িয়ে দেয়া হয় যা খেয়ে শেষ করা যায় না। এমন ধরনের আরও বহু রূপ আছে যার সংখ্যা নির্ণয় করা দুষ্কর।

২। উচ্চতম পরিষদে এ সিদ্ধান্ত হয়ে যায় যে, প্রেরিত নবীর কার্যধারাকে এগিয়ে নিতে হবে। ফলে এমন সব মানসিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন দেখা দেয়, যা এর আগে কখনও দেখা যায়নি। দেখা যায়, নবীর প্রিয় অনুসারীরা সাহায্যপ্রাপ্ত হয় ও তাঁর বিরোধীরা লাঞ্ছিত হয়ে থাকে। অবশেষে আল্লাহর ফরমান বিজয়ী হয়, যদিও কাফেরদের জন্যে তা হয় অত্যন্ত কষ্টদায়ক।

৩। বাহ্যিকভাবেও কোন কোন ঘটনা ঘটে থাকে। যেমন, নাফরমানদের শাস্তির জন্যে ভূপৃষ্ঠে বড় বড় দুর্যোগ দেখা দেয়। আল্লাহ্ পাক কোন না কোন ভাবে সেটাকে নবীর মু'জিযা হিসেবে প্রকাশ করেন। যেমন, নবী আগেই সতর্ক করেন ও তার ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক তা দেখা দেয়। কিংবা নবীর হুকুম অমান্য করার ফলে কোন বিপদ দেখা দেয়া। অথবা যে পাপের যে পরিণতি বলে তিনি নির্দেশ করেছেন তা স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় বা তার অনুরূপ কোন অশুভ পরিণতি দেখা দেয়।

নবী নিষ্পাপ হওয়ার কারণ তিনটি ঃ

১। মানুষ হিসেবেই তাঁদের নীচ প্রকৃতির বাসনা-কামনা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে সৃষ্টি করা হয়।

২। নেক কাজের সুফল ও বদ কাজের কুফল তাঁদের ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়।

৩। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাদের মানবিক দুর্বলতা ও স্খলন-পতন থেকে হেফাযত করেন।

স্মরণ থাকা চাই, আম্বিয়ায়ে কেরামের এটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে,তাঁরা আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্ব ও গুণাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ দেন না। কারণ, সেটা সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরের ব্যাপার। রাসূলাল্লাহ (সঃ) বলেন, আল্লাহ্র সৃষ্টি জগত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর এবং আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে না। পাক কালামে রয়েছে ঃ-

وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى *

সূরা নাজম ঃ আয়াত ৪২

অর্থাৎ তোমার পালনকর্তাকে নিয়েই সব কিছুর পরিসমাপ্তি।

তাই নবী করীম (সঃ) বলেন,

রাব্বুল আলামীনের সত্তা নিয়ে কোন চিন্তা-গবেষণা নেই। অবশ্য নবীগণ আল্লাহ পাকের নেয়ামতরাজি ও তাঁর বিশাল কুদরত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আম্বিয়ায়ে কেরামের এটাও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে, মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী তারা তাদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং তাদের প্রকৃতিগত যে সহজাত জ্ঞান ও বিদ্যা রয়েছে সে অনুসারেই তাদের যা কিছু বলার তা বলেন। তার কারণ এই যে, মানব জাতির প্রকৃতিগত জ্ঞান-বুদ্ধি অন্যান্য জীব- জানোয়ার থেকে স্বভাবতঃই বেশী। অবশ্য যার মৌল সত্তাই নষ্ট ও ভ্রষ্ট সে জীব- জানোয়ার থেকে আদৌ উন্নত নয়। কোন কোন মানুষের সহজাত জ্ঞান-বুদ্ধি এমন পর্যায়ের হয় যেখানে পৌছতে গেলে মানুষের স্বাভাবিক দৈনন্দিন অভ্যাসের বিপরীত পথে গিয়ে তা করতে হয়। যেমন, আম্বিয়া ও আওলিয়ায়ে কেরামের মত পবিত্রাত্মাদের জ্ঞান-বুদ্ধি। তাছাড়া কখনও কোন মানুষ আধ্যাত্মিক সাধনা ও এলমী মেহনত দ্বারা এমন স্তরে পৌছে যেতে পারে যা কেউ ভাবতেও পারেনা। বিজ্ঞান, দর্শন, শাস্ত্রীয় মূলনীতি ইত্যাদির ওপর দীর্ঘকাল চর্চার মাধ্যমেও এরূপ স্তর অর্জিত হয়।

মোটকথা, আম্বিয়ায়ে কেরাম মানুষের সাথে তাদের স্বাভাবিক

জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী কথা বলেন। প্রতিটি লোক জন্মগত ভাবে যে জ্ঞান-বুদ্ধি পেয়ে থাকে সে অনুযায়ী তাদের কাছে তাঁরা বক্তব্য রাখেন। কোন দুর্লভ ও অস্বাভাবিক কিছুর দিকে তাঁরা আদৌ দৃকপাত করেন না। এ কারণেই আম্বিয়ায়ে কেরামের কর্ম-ধারা এটাই হয় যে, তাঁরা আল্লাহ পাককে তাঁর তাজাল্লীসহ দেখার কিংবা দলীল-প্রমাণ বা অনুমানের ভিত্তিতে তাঁকে চেনার জন্যে কাউকে বলেন না। পরন্তু তাঁদের এ সবকই দেন যে, আল্লাহকে দলীল-প্রমাণ থেকে উর্ধ্বে ভেবে মেনে চলবে। কারণ, সে পথে তাদের আল্লাহ প্রাপ্তি এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে যতক্ষণ না তারা দীর্ঘকাল ধরে আত্মিক সাধনা চালাবে এবং দর্শন-বিজ্ঞানে পারদর্শীদের সাথে পর্যাপ্ত মেলামেশা না করবে, ততক্ষণ কেউ উক্ত দুঃসাধ্যপথে পা বাড়াতে পারবে না। কারণ, দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি লাভ না করে সে পথে অগ্রসর হওয়াটা বিপজ্জনক। অবশ্য যাদের সেই প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতা বিদ্যমান স্বভাবতঃই তারা ব্যক্তিগত মতামত পোষণের অধিকারী মুজতাহিদ এবং তাদের মর্যাদা মুহাদ্দিসদের ওপরে।

আম্বিয়ায়ে কেরামের পবিত্র স্বভাব এই যে, তাঁরা ব্যক্তির পরিশুদ্ধি ও জাতির বিন্যস্ততার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান ছাড়া অন্য কোন জ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ করেন না। যেমন, জল-স্থলে সংঘটিত দুর্ঘটনার বস্তুগত কার্যকারণ উদ্‌ঘাটন, বৃষ্টিপাত, সূর্যগ্রহণ কিভাবে সংঘটিত হয় তা নির্ণয় করা, জীব-জানোয়ার ও গাছ-পালার ওপর তাঁর প্রভাবের দিকগুলো নির্ধারণ, বিভিন্ন শহর, রাজা-বাদশাহ বা নবী-পয়গাম্বরদের ইতিহাস ও কাহিনী ইত্যাকার ব্যাপার নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না। হ্যাঁ, তাঁরা শুধু এতটুকু উল্লেখ করেন যাতে সেগুলো শুনে ও বুঝে কেউ আল্লাহ পাকের কুদরত ও নেয়ামত সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। তাই তা বলা হয় অত্যন্ত সংক্ষেপে ও ইশারা-ইংগিতে।

তাঁদের এ নীতির কারণেই যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একদল লোক প্রশ্ন করল, চাঁদ কেন কমে ও বাড়ে? তার জবাবে আল্লাহ পাক সে প্রশ্ন এড়িয়ে মাসগুলোর কল্যাণকারীতা সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ-

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَ هِلَّةِ- قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ *

সূরা বাক্বারা ঃ আয়াত ১৮৯

অর্থাৎ, তোমাকে চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে? তুমি বলে দাও, ওটা মানুষের জন্যে সময় নির্দেশক ও হজ্জের নির্ধারক।

আপনারা কোন কোন লোককে দেখতে পাবেন যে, সব বৈষয়িক বিষয়ের জ্ঞান চর্চায় অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে তাদের মৌল বিষয়ের রুচি হারিয়ে ফেলেছে। এ সব লোকই আম্বিয়ায়ে কেরামদের বাণীসমূহের অপব্যাখ্যা দেয় ও বেজায়গায় তার প্রয়োগ ঘটায়। এভাবে তারা নবীদের বাণীগুলোর তাৎপর্য ওলট-পালট করে থাকে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

পরিচ্ছেদ ঃ ছাপ্পান্ন

দ্বীন এক ঃ শরীয়াত বিভিন্ন

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا *

সূরা শূরা ঃ আয়াত ১৩

অর্থাৎ, তোমাদের জন্যে দ্বীন থেকে সেই বস্তু (বিধান) নির্ধারণ করা হল যা নূহকেও নির্দেশ করা হয়েছিল। আর আমি ওহীর মাধ্যমে তাই তোমাকে নির্দেশ করেছি যা নির্দেশ করেছি ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে। (তা হচ্ছে) তোমরা দ্বীন কায়েম রাখ এবং এ ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

হযরত মুজাদ্দিদ (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে ও তাদেরকে একই দ্বীন সম্পর্কে ওসিয়ত করেছি।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَإِنَّ هٰذِهٖٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ فَتَقَطَّعُوْٓا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ *

সূরা মুমিনূন ঃ আয়াত৫২- ৫৩

অর্থাৎ ইসলামী মিল্লাতই তোমাদের সকলের মিল্লাত। অতঃপর ইয়াহুদী, নাসারা ও মুশরিকরা তাতে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই যার যার মত ও পথ নিয়ে তৃপ্ত।

আল্লাহ পাক আরও বলেন ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا *

সূরা মায়িদাহ ঃ আয়াত ৪৮

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্যে শরীয়াত ও তার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন করেছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, শরীয়াত অর্থ পথ ও মিনহাজ অর্থ পদ্ধতি।

আল্লাহ জাল্লা জালালুহ্ বলেন ঃ

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ *

সূরা হাজ্ব ঃ আয়াত ৬৭

অর্থাৎ, প্রত্যেক উম্মতের জন্যে আমি ইবাদতের পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করেছি। তদনুসারে তারা ইবাদত করে থাকে।

স্মর্তব্য, মূল দ্বীন একই। সকল নবী ও রাসূল এক্ষেত্রে এক। অবশ্য পথ ও পদ্ধতি ভিন্ন। এর ব্যাখ্যা এই যে, সকল নবী ও রাসূলেরই কথা হচ্ছে, আল্লাহ এক, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে। সাহায্য শুধু তাঁরই চাইতে হবে এবং তিনি সর্ব প্রকারের অশোভন কিছু থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তেমনি তাঁর পবিত্র নামসমূহে অবিশ্বাস ও অনাস্থা হারাম। বান্দার ওপর

আল্লাহর হক এটাই যে, বান্দা আল্লাহর এরূপ ইবাদত করবে যাতে কিছুমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি না থাকে। আল্লাহ্ পাকের সামনে তারা কায়মনে ঝুঁকে যাবে। তারা আল্লাহর নিদর্শনের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করবে।

এ ব্যাপারেও তারা একমত যে, আল্লাহ্ পাক যা কিছু ঘটার তা আগে থেকেই জানেন এবং আল্লাহর ফেরেশতারা তাঁর নাফরমান নন। তারা আল্লাহর যখন যে নির্দেশ আসে তা হুবহু পালন করেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদের থেকে যাকে খুশী কিতাব প্রদান করেন এবং মানুষের জন্যে তাঁর আনুগত্যকে ফরজ করে দেন।

তাঁরা এ ব্যাপারেও একমত যে, কিয়ামত সত্য, পুনরুত্থান সত্য এবং দোযখ সত্য, তেমনি পবিত্রতা অর্জন, নামায পড়া, যাকাত দেয়া, রোযা রাখা, হজ্জ করা, নফল ইবাদত করা অর্থাৎ, দোয়া, জিকির, তিলাওয়াতে কালামে পাক ইত্যাদির মাধ্যমে যে পুণ্য অর্জিত হয় এ ব্যাপারে তাঁরা একমত।

তেমনি বিবাহ বৈধ ও ব্যভিচার অবৈধ হওয়া, মানুষের ভেতর ইনসাফ কায়েম করা ও জুলুম নিষিদ্ধ করা, নাফরমানদের শাস্তির বিধান করা, আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা, আল্লাহর দ্বীন ও বিধি-বিধান প্রচার ও প্রসারের প্রয়াস চালানো ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁদের মতৈক্য রয়েছে। এগুলোই দ্বীনের আসল কথা। একারণেই কোরআনে পাকে এ সবের রূপ সম্পর্কে সবিস্তারে বলা হয়নি। হ্যাঁ, কোথাও কোন ব্যাপারে সামান্য যা কিছু ইংগিত করা হয়েছে তা স্বতন্ত্র কথা। যাদের ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এমনকি এসব তাদেরও সর্বজন স্বীকৃত ব্যাপার ছিল।

অবশ্য উক্ত মৌলিক ব্যাপারগুলোর রূপ বিভিন্ন নবীর কালে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। যেমন, হযরত মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত নামাযের সময়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করা হত। অথচ আমাদের রাসূল (সঃ)-এর শরীয়তে কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে নামায পড়ার বিধান দেয়া হয়েছে। মূসা (আঃ)-এর বিবাহিত কি অবিবাহিত সবারই ব্যভিচারের শাস্তি ছিল প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড। কিন্তু আমাদের শরীয়তে বিবাহিতের জন্যে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড ও অবিবাহিতের জন্যে দোররা মারার ব্যবস্থা রয়েছে। হযরত মুসা (আঃ)-এর শরীয়তে হত্যার বদলে হত্যা অথবা ক্ষতিপূরণ,

দু'ব্যবস্থাই প্রদত্ত হয়েছে। এভাবে এবাদতের সময়, পদ্ধতি ও রীতি-নীতিতেও পার্থক্য রয়েছে।

মোটকথা, সে সব বিশেষ ধরন-ধারণ যার ওপর পুণ্য অর্জনের সব কর্ম ও কৌশল নির্ভরশীল সেগুলোই হচ্ছে শরীয়ত ও মিনহাজ্ব বা পথ ও পদ্ধতি।

মনে রাখতে হবে, সব ধর্মের ভেতরেই আল্লাহ পাক যে সব ইবাদত ও আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে সে সব কাজ যার ভিত্তি ও উৎস হচ্ছে মানুষের অন্তর। তার ভিত্তিতেই সেগুলো পরকালে কল্যাণকর কিংবা ক্ষতিকর হয়ে দেখা দেবে। আসল ইবাদত ও আনুগত্য মূলতঃ অন্তরের ব্যাপার। বাহ্যিক কাজগুলো শুধু তার বহিঃ প্রকাশ মাত্র। অন্তরের অবস্থা দিয়েই কর্মের বিচার হবে। এটা যে না জানবে তার আমল অর্থহীন হবে। কারণ, মনোযোগ বিহীন আমলের যত আধিক্যই থাকুক না কেন দোয়া ও কিরাআতের ত্রুটি-বিচ্যুতিতে তা কল্যাণকর হবে না।

ধর্মীয় কাজের ভেতর এরূপ বিচক্ষণতা ও ব্যবস্থাপনা থাকা চাই যা থেকে সর্ব স্তরের মানুষ তা সহজেই উপলব্ধি ও অনুসরণ করতে পারে। কোন আমল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে কারো যেন কোনরূপ অস্পষ্টতা ও সন্দেহ দেখা না দেয়। প্রতিটি আমল যেন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পাওয়া দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে যথাযথভাবে আদায় হয় ও পরকালে তা সর্বোতভাবে স্বীকৃত হয়।

কখনও কোনটি পাপ আর কোনটি পাপ নয় তা নিয়ে বিভ্রম সৃষ্টি হয়। যেমন, মুশরিকরা বলেছিল, সুদ ও ব্যবসায়ের মুনাফা তো একই ব্যাপার। এ ধরনের মতিভ্রম কখনও অজ্ঞতা থেকে দেখা দেয় কখনও পার্থিব স্বার্থান্ধতা থেকে সৃষ্টি হয়। এ কারণেই পাপ ও অপাপের ভেতর এরূপ সুস্পষ্ট সীমারেখা থাকা চাই যা সকলের জন্যই সহজবোধ্য। ইবাদতের জন্যে সময় যদি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা না হত, তাহলে অনেকের পক্ষেই সঠিক ভাবে নামায, রোযা করা সম্ভব হত না। সে ক্ষেত্রে মানুষের বাহানা ও অজুহাতের জন্যেও তাদের ধমকানো-যেত না। যদি মানুষের জন্যে ইবাদতের আরকান-আহকাম সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া না হত, তাহলে তারা ইচ্ছামত হাত-পা ছুঁড়তে থাকত। তেমনি পাপের জন্যে কোন শাস্তিও

নির্ধারিত না হত তা হলে নাফরমানেরা কখনো নাফরমানী ছাড়ত না। মোটকথা, ইবাদত ও আমলের সুনির্দিষ্ট সময়, নিয়ম-কানুন ও শাস্তি-পুরস্কার রয়েছে বলেই মানুষের জন্যে তার বাস্তবায়ণ সহজ হয়েছে এবং এ কারণেই জনসাধারণকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করা যাবে। যদি শরীয়াত প্রণয়নের কায়দা-কানুন জানতে হয় তাহলে বিজ্ঞ ডাক্তারের বিধি-ব্যবস্থা প্রদানের ব্যাপারটি গভীরভাবে খেয়াল করতে হবে।

লক্ষ্য করুন, কিভাবে তিনি রোগীদের নিরাময় করার জন্যে পথ নির্দেশ করে থাকেন। রোগীরা যা জানে না সে ব্যাপারে তিনি সতর্ক করে দেন। যে সূক্ষ্ম ব্যাপার তাদের বোধগম্য হয়না সে সব ব্যাপারে তাদের না বুঝিয়ে বাধ্যগতভাবে পালনের ব্যবস্থা দেন। তিনি শিরা ধরে রোগীর অন্তর্নিহিত রোগ নির্ধারণ করে দাওয়াই দেন। কখনও চেহারার রক্তিমতা বা ফ্যাকাশে ভাব দেখে রোগ নির্ধারণ করেন। তিনি রোগীর শক্তি, বয়স, পরিবেশ, ঋতু ইত্যাদি অনুসারে ওষুধ ঠিক করেন।

মোটকথা, রোগীর সব কিছু বিবেচনা করে ওষুধ ও তার পরিমাণ স্থির করে তিনি চিকিৎসা করে থাকেন। অনেক সময় নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুমানের ভিত্তিতে রোগের কারণ নির্ণয় ক্ষতিকর দিকগুলো অপনোদনের ব্যবস্থাসহ ওষুধ ও তার পরিমাণ নির্ধারণ করেন। যেমন, তিনি বলেন, যদি কোন রোগীর চেহারা রক্তিম হয়ে যায় এবং তার শিরা-উপশিরায় রক্ত সঞ্চালন তীব্র হয়ে যায়, তখন তাকে আংগুরের শরবত কিংবা মধুমিশান পানি পান করাবে। এটা না করলে সে মারা যাবে। অথবা তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অমুক অমুক মাজুন এই এই পরিমাণ খাবে সে অমুক রোগ থেকে রেহাই পাবে। ডাক্তার বা হাকিম এসব বিধি-বিধান তৈরী করেন, মানুষ তা পালন করে এবং আল্লাহ্ পাক তাতে কল্যাণ দান করেন।

এক্ষণে সেই বিজ্ঞ শাসকের ব্যাপারটি ভেবে দেখ যিনি রাষ্ট্রের সংস্কার ও সেনাবাহিনীর শৃংখলার জন্যে প্রখর দৃষ্টিদান করেন। তিনি যারা দেশের জমাজমি আবাদ ও ফসলপূর্ণ করার জন্যে চাষীদের সর্বপ্রকারের উপায়-উপকরণ দিয়ে উৎসাহিত করেন। তারপর তার উপর রাজস্ব ধার্য করেন। রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে সহায়তার জন্যে তিনি নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কাজে লাগিয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ উজীর ও কর্মচারী নিয়োগ করেন। তাদের

মাধ্যমে আইন-কানুন তৈরী করে তা রাষ্ট্রে জারী করেন। তিনি জনগণের প্রয়োজন সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকেন। তিনি অসংখ্য কর্মচারী পুষে থাকেন ও তাদের যাবতীয় প্রয়োজন মিটান। তাদের এমন ভাবে যার যার কাজে নিয়োজিত করেন, যাতে উদ্দেশ্য সফল হয়, অথচ তাদের ওপর অতিরিক্ত চাপও না পড়ে। এভাবেই সকলের সব দিক খেয়াল রেখে তিনি সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকেন।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। তারা শিশুদের কিরূপভাবে শিক্ষা দেন। তেমনি কোন মালিক তার ভৃত্যদের কিভাবে পরিচালনা করেন তাও লক্ষ্য করুন। শিক্ষক চায় শিশুর শিক্ষা। মালিক চায় ভৃত্যের দ্বারা তার কাজ উদ্ধার করতে। কিন্তু শিশু ও ভৃত্য তো তাদের যথার্থ কল্যাণ কিসে তা জানে না, তাই তারা সেরূপ কোন ব্যবস্থা পছন্দ করতে পারেনা। তারা তা এড়াবার জন্য নানা বাহানা ও অজুহাত সৃষ্টি করে। তবে শিক্ষক ও মালিকরা তাদের অবস্থা আগে থেকেই জানেন। তাই তারা কিভাবে সে সব বাধা দূর করে কার্য সমাধা করবেন তা স্থির করেন। তারপর তারা শিশু কিংবা ভৃত্যদের প্রয়োজনে দিনকে রাত ও রাতকে দিন বানিয়ে সুনিপুণ কৌশলে কাজে লাগিয়ে থাকেন। ফলে তাদের বাহানা ও অজুহাত কোন কাজেই আসে না। যার ফলে শিশু ও ভৃত্যরা শিক্ষক ও মালিকদের কলাকৌশল বুঝুক বা না বুঝুক তাদের কল্যাণ অর্জিত হয়ে যায়।

মোটকথা, যে লোকই এমন কোন জনগোষ্ঠীকে সংস্কার করার জন্যে নিয়োজিত হবেন, যাদের যোগ্যতার বিভিন্ন স্তর আর যাদের দূরদর্শীতা তা যেমন নেই, তেমনি নেই কোন আগ্রহ, তিনি তখন বাধ্য হন তাদের জন্যে বিভিন্ন সময় ও পরিমাণ নির্ধারণ করতে। তাকে সব কিছুর রূপরেখা ও প্রয়োগ পদ্ধতি রচনা করতে হয় এবং সে সবের ভিত্তিতে লোকদের পরিমাপ ও জবাবদিহির ব্যবস্থা করতে হয়।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ পাক যখন মানব জাতিকে আঁধার থেকে আলোর জগতে নিয়ে আসার জন্যে নবী পাঠাবার ইচ্ছা করলেন, তখন সে নবীর কাছে ওহী পাঠালেন। এমনকি সে নবীকে আলোকময়

করলেন ও তাঁর ভেতরে জগতের সংস্কার স্পৃহা সৃষ্টি করলেন। এ সবই হচ্ছে তখনকার মানবগোষ্ঠির সংস্কার ও হেদায়েতের পটভূমি। আল্লাহ পাক আম্বিয়ায়ে কেরামকে পাঠাবার ব্যাপারে এ সমস্ত দিকগুলো সামনে রেখেছেন। তাই তিনি মানব জাতির জন্যে পয়গাম্বরদের আনুগত্য ও অনুসরণ অপরিহার্য করে দিয়েছেন। কারণ, সংস্কার কাজটিকে মানুষের স্বভাব ও অভ্যেসের প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়নের জন্যে এ অপরিহার্যতা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই।

বস্তুতঃ আলোচ্য বিষয়বস্তুর এটাই সামগ্রিক রূপ। এর একটি অংশ অপর অংশের সাথে অংগাংগীভাবে জড়িত। আল্লাহ পাকের কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। আল্লাহর দ্বীনে কোন হাওয়াই কথা বা বাজে কথা নেই। মূলতঃ সেখানে যখন কোন ব্যাপার নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন তা নজিরবিহীন কোন কিছু হয় না। তবে হ্যাঁ, তিনি বিশেষ অবস্থায় নির্দিষ্ট হেকমত মোতাবেক বিশেষ কোন হুকুম জারী করেন যার রহস্য বিশেষজ্ঞ আলেম ছাড়া কেউ বুঝতে পারেনা। আমি চাই, সে ধরনের কিছু রহস্য জনগণের সামনে তুলে ধরি।

পরিচ্ছেদ ঃ সাতান্ন

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির কাছে ভিন্ন ভিন্ন শরীয়াত প্রেরণের রহস্য

এ বিষয়বস্তুর আসল রহস্য আল্লাহ পাকের নিম্ন আয়াতে নিহিত রয়েছে। তিনি বলেন ঃ-

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ اِسْرَآئِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآئِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰةُ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ *

সূরা আলে-ইমরান ঃ আয়াত ৯৩

অর্থাৎ বনী ইসরাইলের জন্যে সব খাদ্যই হালাল ছিল। তবে ইয়াকুব নিজের জন্যে কিছু হারাম করে নিয়েছিল। তাও তাওরাত নাযিল হবার পূর্ব

পর্যন্ত। তুমি বলে দাও, তাহলে তাওরাত নিয়ে এস এবং পড়, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) একবার গুরুতর অসুস্থ হলেন। তখন তিনি মানত করলেন, আল্লাহ্ পাক যদি তাকে সুস্থ করেন, তাহলে তিনি তার প্রিয়তর খাদ্য ও পানীয় বর্জন করবেন। তারপর যখন তিনি সুস্থ হলেন, তখন তিনি তার প্রিয়খাদ্য উটের গোশত ও প্রিয় পানীয় উটের দুধ নিজের জন্যে হারাম করে নিলেন। তাঁর বংশধররাও তাঁর দেখাদেখি সেগুলো বর্জন করে গেল। কিছুকাল এ অনুসরণ চলছিল। এর ফলে জনমনে এটা মজবুতভাবে বসে গেল যে, এটা অমান্য করা নবীকেই অমান্য করা এবং নবীর অভিসম্পাতের শিকার হওয়া। ফলে তওরাতেও সেগুলোর নিষিদ্ধতা বহাল রাখা হল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন ঘোষণা করলেন যে, তিনি ইবরাহীম (আঃ)-এর মযহাব অনুসরণ করছেন, তখন ইয়াহুদীরা প্রশ্ন তুলল, কি করে তিনি ইবরাহীম (আঃ)-এর মিল্লাতে রয়েছেন? তিনি তো উটের গোশত খান ও উটের দুধ পান করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের যুক্তি খণ্ডনের জন্যে বললেন ঃ বনী ইসরাঈলের জন্যে তো সব খাদ্যই হালাল ছিল। উটের গোশত ও দুধ তো বিশেষ কারণে নিষিদ্ধ হয়েছে। এখন যখন বনী ইসরাঈল থেকে বনী ইসমাঈলে নবুওয়াত স্থানান্তরিত হয়েছে, তখন পূর্ব কারণ এখানে অবর্তমান বিধায় সেগুলো বৈধ হয়ে গেল।

এ প্রেক্ষিতেই হুযুর (সঃ) নিয়মিত তারাবীহ নামায পড়া থেকে বিরত ছিলেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের যেভাবে আমি নিয়মিত তারাবীহ নামায পড়তে দেখছি তাতে আমার ভয় হয় যে, আল্লাহ পাক তোমাদের ওপর তারাবীহ ফরজ করে দেবেন এবং তোমাদের জন্যে তা আদায় করা কঠিন হয়ে যাবে। তাই হে লোক সকল! তোমরা যার যার ঘরে বসে তা পড়।

মোটকথা, তিনি তারাবীহ নামাযকে ধরাবাঁধা রীতিতে এ জন্যে পরিণত হতে দিলেন না যে, সেটা দ্বীনের অপরিহার্য অংগ হয়ে যাবে। ফলে তা ফরজের স্তরে পৌঁছে যাবে। হুযুর (সঃ) এও বলেছেনঃ

মুসলমানদের ভেতর সব চাইতে বড় অপরাধী সে ব্যক্তি যার প্রশ্ন তোলার কারণে কোন হালাল বস্তু হারাম হয়ে গেল। তিনি বলেনঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) মক্কাকে হরম শরীফ বানিয়ে গেছেন এবং তার জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমিও তাঁর পথ ধরে মদীনাকে হরম শরীফে পরিণত করলাম। তেমনি আমি মদীনার বস্তুগুলোর ভেতরে বরকত সৃষ্টির জন্যে যে ভাবেই দোয়া করছি সেভাবে ইবরাহীম (আঃ) মক্কার জন্যে দোয়া করে গেছেন।

এক ব্যক্তি হুজুর (সঃ)কে প্রশ্ন করল ঃ হে আল্লার রাসূল! প্রত্যেক বছরই কি হজ্জ ফরজ? হুযুর (সঃ) জবাব দিলেন, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে সেটাই হয়ে যেত অথচ তোমরা তা পালন করতে পারতে না। ফলে তোমরা কঠিন শাস্তির শিকার হতে।

মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন কল্যাণের কারণে বিভিন্ন কালের নবীদের শরীয়তে তারতাম্য রাখা হয়েছে। তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ পাক স্থান-কাল-পাত্রের উপযোগী করে তাঁর নিদর্শন ও শরীয়ত নাযিল করেছেন। হযরত নুহ(আঃ)-এর সম্প্রদায় অত্যন্ত কঠিন হৃদয় ও শক্তিমত্তার অধিকারী ছিল। আল্লাহ পাক নিজেই তা বলেছেন। তাই তাদের ওপর স্থায়ীভাবে সারা বছর রোযা ফরজ করা জরুরী ছিল। তার ফলে যেন তাদের পাশব শক্তি নিয়ন্ত্রণে থাকে। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত হল দুর্বল। তাই তাদের সে ব্যবস্থা দেয়া হয়নি। তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্যে আল্লাহ পাক গনীমতের মাল হালাল করেন নি, কিন্তু আমাদের এই দরিদ্রদের জন্যে তিনি তা হালাল করেছেন। মূলতঃ আম্বিয়ায়ে কেরামের কাজই হচ্ছে জাতির সামগ্রিক দিকগুলোর সংস্কার ও কল্যাণ সাধন। বস্তুতঃ কোন নবী বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া মানুষের স্বভাব ও অভ্যেসের পরিপন্থী কোন নির্দেশ দেননা। তাই এটা স্বাভাবিক যে, বিভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে সৃষ্ট বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত এসেছে। এ ধরনের কারণ পরিবর্তন সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট।

তার উদাহরণ এই যে, প্রত্যেক ডাক্তার রোগীর পরিবেশ ও অবস্থার দিকে খেয়াল রেখে বিধান দেন। সে ক্ষেত্রে কাল ভিন্ন, ব্যক্তিও ভিন্ন তথাপি বিধান এক হবে কেন? একটি তরুণকে যে কাজ দেয়া যায়, কোন এক বৃদ্ধকে কি সে কাজ দেয়া যায়? গ্রীষ্মকালে যেভাবে খোলা ময়দানে শোয়ার ব্যবস্থা করা যায়, শীত কালেও কি তা পারা যায়?

মূলতঃ যারা দ্বীনের একত্ব ও শরীয়তের সূক্ষ্ম তারতম্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, তাদের কাছে দ্বীনের ভেতর কখনও কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। এ কারণেই শরীয়তের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে বিভিন্ন জাতির সঙ্গে। কারণ, প্রত্যেক জাতি তাদের প্রাপ্ত ও অনুসৃত শরীয়তেরই উপযোগী। এ যেন তারা দরখাস্ত করে তাদের উপযোগী শরীয়ত চেয়ে নিয়েছেন। এ কারণেই তারা স্বভাবতঃই জবাবদিহি হবে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ-

فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ *

সূরা মুমিনূন ঃ ৫৩

অর্থাৎ, তারপর তারা নিজেদের কাজকে নিজেদের মধ্যে টুকরা টুকরা করে ভাগাভাগী করে নিল এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের কাছে যা পেল তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকল।

এ কারণেই আমাদের নবী-এর উম্মতের সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রাপ্তি ঘটল এবং তাদের জন্যেই শুক্রবারকে জুমুআর দিন নির্ধারণ করা হল। কারণ, এ জাতি ছিল নিরক্ষর জাতি উপার্জিত বিদ্যা থেকে ছিল তারা মুক্ত। পক্ষান্তরে ইয়াহুদীর জন্যে শনিবার ধার্য করা হল। কারণ, তাদের আকীদা এটাই ছিল যে, আল্লাহ্ এই দিন সৃষ্টিকার্য শেষ করে অবসর নিয়েছেন। তাই নির্দিষ্টভাবে ইবাদতে নিয়োজিত হবার জন্যে এটাই উপযুক্ত দিন। অথচ আল্লাহ্ পাক সব কিছুই করেন নির্দেশ ও ওহীর মাধ্যমে, তিনি নিজে সে সব কাজে নিয়োজিত থাকেন না।

শরীয়তে এর উদাহরণ হচ্ছে এই যে, শুরুতে কিছু হুকুম-আহকাম অপরিহার্য করে দেয়া হয়। তারপর তাতে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। ফলে তা শিথিল করে দেয়া হয়। কারণ, তাতে ব্যাপক শৈথিল্য দেখা দেয়। এক্ষেত্রে মানুষের অবস্থার কারণেই এ শিথিলতা প্রদত্ত হয়েছে। তাই অনেক সময় এ ধরনের শিথিলতার জন্য সেই সম্প্রদায়ই দায়ী হয়। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ *

সূরা রা'দ ঃ আয়াত ১১

-অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটান না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না ঘটায়।

রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ- কোন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোকের বুদ্ধিভ্রষ্ট করার ব্যাপারে তোমাদের স্বল্পবুদ্ধি ও অসম্পূর্ণ দ্বীনের নারীদের চেয়ে বেশী সক্রিয় আর কাউকে দেখিনি। নারীদের অসম্পূর্ণ দ্বীনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ- তোমরা দেখতে পাচ্ছ ঋতুবতী নারী না নামায পড়ছে না রোযা রাখছে।

মনে রাখা দরকার, অবস্থা বিশেষে যদিও বিভিন্ন শরীয়ত নাযিল হবার অনেক কারণ রয়েছে, তথাপি মূলতঃ তা সবই দু'ধরনের হয়ে থাকে।

এক, মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতা। এর ভিত্তিতেই মানুষ শরীয়তের অনুসারী ও তার জন্যে জবাবদিহি হয়ে থাকে। মানুষ স্বভাবতঃই শ্রেণীগত উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতার অধিকারী হয়। যেমন, জন্মান্ধের ধারণার ভাণ্ডারে কোন রূপ বা রঙ্গের ঠাঁই নেই। তাতে থাকে শব্দ আর স্পর্শের সঞ্চয়। ফলে সে যখন স্বপ্নে কিছু দেখতে পায়, তখন সে তার ভাণ্ডারে যা আছে তা দিয়েই সেটা বুঝে থাকে, অন্যভাবে বোঝার তার কোন উপায় নেই।

যে আরব আরবী ছাড়া আর কোন ভাষা জানে না, যদি তাকে অন্য ভাষায় কোন কথা বলা হয়, তখন স্বভাবতঃই সে আরবী ভাষায় তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হবে। যে সব দেশে হাতী, ভল্লুক ইত্যাদির মত ভয়াবহ জন্তু অহরহ দেখা যায়, সেসব দেশে জ্বিন-শয়তানের কল্পনায় হাতী-ভল্লুকের বিদঘুটে রূপই পরিদৃষ্ট হবে। যে দেশে যে বস্তুর মর্যাদা দেয়া হয়। আর যে ধরনের উত্তম খানা-পিনা ও আকর্ষণীয় পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করা হয়, তারা কোন ফেরেশতা কিংবা ঐশী নেয়ামতের ধারণা দিতে গিয়ে সেসবের সাহায্যই নেবে। যদি আরবের কোন লোক কোন কাজ করতে কিংবা পথ চলতে গিয়ে 'রাশেদ' কিংবা 'নাজী' শব্দ শুনতে পায়, তাহলে সেটা শুভলক্ষণ ভেবে থাকে, কিন্তু কোন অনারব তা ভাবে না। এ ধরনের কোন কোন ব্যাপার হাদীস শরীফেও এসেছে। যেমন, পূর্ববর্তী ঘটনার প্রভাব পরবর্তী ঘটনায় পরিলক্ষিত হয়। শরীয়তের ক্ষেত্রে জাতির অতীত ধ্যান-ধারণার প্রভাব ছড়াবেই। ব্যাধি যে ভাবে সংক্রমিত হয় এও তেমনি।

এ কারণেই উটের গোশত ও দুধ বনী ইসরাঈলের জন্যে হারাম হয়েছে বটে, কিন্তু বনী ইসমাঈলের জন্যে তা হালাল হয়েছে। এই একই কারণে খানা-পিন্যর পাক-নাপাক ও ভাল-মন্দের ব্যাপারটি আরবদের রুচির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তেমনি ভগ্নী বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ ইয়াহুদীদের বেলায় তা করা হয়নি। কারণ, তারা ভগ্নীকে বিবেচনা করত তার পিতার সন্তান বলে। পিতা যেহেতু তার আপন কেউ নয়, তেমনি ভগ্নীও আপনজন নয়। তাই তার সাথে বিবাহে তাদের অরুচি ছিল না। কিন্তু আরবদের বিবেচনা ছিল বিপরীত। তেমনি বাছুরের গোশত-গাভীর দুধের সাথে পাকিয়ে খাওয়া ইয়াহুদীদের জন্য হারাম। আমাদের জন্যে তা হালাল। কারণ, ইয়াহুদীদের জানা আছে যে, এ কাজটি আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটানো ও তাঁর সৃষ্টি কৌশলের পরিপন্থী কাজ। কারণ, আল্লাহ পাক বাছুর লালন-পালনের জন্যে গাভীর দুধ সৃষ্টি করেছেন। উক্ত কাজ দ্বারা তার মূলোৎপাটন ঘটানো হয়। ইয়াহুদীদের ভেতর এ ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছিল। পক্ষান্তরে আরবদের এসব বিদ্যা ও ধ্যান-ধারণা ছিল না। তাদের তা বলা হলেও তারা তা বুঝত না। কিসের ভিত্তিতে কোন হুকুম আসে তাও তাদের জানা ছিল না। এ অবস্থায় তাদের মন-মানসের অনুকূল ব্যবস্থাই প্রদত্ত হয়েছে।

এটাও মনে রাখা দরকার, শরীয়ত নাযিলের ক্ষেত্রে শুধু যে জনগোষ্ঠীর জ্ঞান, অবস্থা ও ধ্যান-ধারণাই বিবেচনা করা হয় তা নয়; বরং বেশী খেয়াল করা হয় তাদের স্বভাব প্রকৃতিকে। কারণ, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি তার দ্বারাই পরিচালিত ও প্রভাবিত হয়। ফলে তারা এক কথা দিয়ে অন্য কথা বুঝে থাকে। যেমন যারা সেহরী খেল না তাদের বলা হয় মুখে সীল মারা হয়েছে। যেহেতু তারা মুখে সীল মারা থেকে সেহরী না খাওয়া বুঝে থাকে, তাই যথার্থ সীল মারার এখন প্রশ্ন আসে না।

মোটকথা, বান্দার ওপর আল্লাহ পাকের হক এটাই যে, তাঁর যথাসাধ্য মর্যাদা রক্ষা করে চলবে এবং কোন অবস্থাতেই তাঁর বিধি-বিধানের পরিপন্থী কিছু করবে না। তাছাড়া মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের জন্যে অপরিহার্য হচ্ছে সম্প্রীতি ও সহনশীলতা রক্ষা করা। একে অপরকে কষ্ট দেবে না। তবে যদি সবাই মিলে কাউকে শাস্তি দিতে চায়, তাহলে সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। এ কারণেই কোন ব্যক্তি যখন নিজ স্ত্রীর

সাথেও ভিন্ন নারী ভেবে শয্যাশায়ী হয়, তখন তার ও আল্লাহর মাঝখানে এক দেয়াল সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন এ কাজটি খোদাদ্রোহিতার শামিল হয়ে যায়। কারণ, সে জেনে-বুঝে আল্লাহর সাথে নাফরমানীর পদক্ষেপ নিয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী ভেবে ভিন্ন নারীর সাথে শয্যাশায়ী হয়, তাকে আল্লাহ্ পাক ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন।

তেমনি কেউ যদি রোযার মানত করে তো রোযা তার জন্যে অপরিহার্য হয়ে যায়। যদি সে রোযা না রাখে, তাহলে সে জবাবদিহি হবে। কিন্তু মানত না করলে জবাবদিহি করতে হবে না।

মোটকথা, দ্বীনকে যে কঠিন করে নিতে চায়, তার জন্যে কঠিন করে দেয়া হয়। কোন ইয়াতীমকে আদব শিখানোর জন্যে থাপ্পড় মারাও পুণ্যের কাজ। অথচ শুধু কষ্ট দেয়ার জন্যে থাপ্পর দিলে পাপ হবে। ভুল-চুকের ব্যাপারগুলো ক্ষমার্হ। এ রীতি-নীতিগুলো জাতির অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক জ্ঞান থেকেই জন্ম নেয়। এর ভিত্তিতেই শরীয়তের বিধান অবতীর্ণ হয়।

মনে রাখতে হবে, কমনসেন্স বা সাধারণ ও স্বাভাবিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে আরব- আজম তথা সকল সভ্য জাতিগুলোই সমান। যেমন, মৃতের জন্যে শোক করা, তার ব্যাপারে সদয় ও বিনয়ী হওয়া, বংশের গৌরব করা, রাতের এক-চতুর্থাংশ বা দুই-তৃতীয়াংশ পার হতেই শুয়ে পড়া, সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা ইত্যাদি মানব সভ্যতার পয়লা স্তর থেকেই সর্বজন স্বীকৃত হয়ে চলে আসছে। তারপর যে জাতির কাছে নবী প্রেরিত হয়েছে ও তারা নবীর শিক্ষা পেয়েছে এবং যাদের সব কিছুই আল্লাহ পাক নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তাদের ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞান-বুদ্ধি তো আরও উন্নত।

মনে রাখতে হবে, নবুয়ত কোন না কোন মিল্লাতের সাথে সম্পৃক্ত হয়।

যেমন, আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ *

সূরা হাজ্জঃ আয়াত ৭৮

অর্থাৎ তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনি আরও বলেন ঃ

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَٰهِيمَ *

সূরা ছাফ্যাত ঃ আয়াত ৮৩

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে ইবরাহীমের অনুসারী ছিল।

এর রহস্য এই যে, যখন কোন জনগোষ্ঠী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কোন ধর্মের অনুসারী হয় এবং সেই ধর্মের নিদর্শনগুলোকে সম্মান করে চলে, আর তার বিধি-বিধানগুলো অনস্বীকার্য সামাজিক রীতি-নীতিতে পর্যবসিত হল, তখন অন্য যুগ এসে যায়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, এতদিনে দ্বীনের ভেতর যা কিছু ঘাটতি বা বাড়তি হয়েছে তা সংশোধন করা ও মিল্লাতের ভেতরে যে বিচ্যুতি বিপর্যয় ঘটে গেছে তা সংস্কার করা।

বস্তুতঃ নতুন নবী এসে মিল্লাতের সুবিদিত ও সুপ্রচলিত রীতি-নীতিগুলো যাচাই-বাছাই করেন। যেগুলো জাতীয় ব্যবস্থাপনার রীতি-নীতি হয়ে গেছে ও দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক আছে সেগুলো ঠিক রাখা হয় এবং সেদিকে সবাইকে আহ্বান জানায় ও তা অনুসরণের জন্যে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে যেসব রুছম ও রীতি-নীতি দ্বীনের পরিপন্থী হয়েছে ও বিকৃতি ঘটিয়েছে সেগুলোতে প্রয়োজন মোতাবেক পরিবর্তন ঘটান। সাধারণতঃ নতুন নবী আগেকার শরীয়তের বেঁচে থাকা বিধি-বিধানের দলীল হিসেবে পেশ করেন এবং বলা হয় এ নবী অমুক নবীর দ্বীনেরই অনুসারী কিংবা তাঁরই গোত্রভুক্ত। অবশ্য অনেক সময় এ নবুওয়ত ভিন্ন জাতির ভেতর আসে, তখন সেই জাতির ভিন্ন রীতি-নীতির কারণে শরীয়তের ভেতর পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

দুই, বিশেষ ধরনের শরীয়ত নাযিল হওয়ার কারণ নিতান্তই বাহ্যিক। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই, যদিও আল্লাহ পাক স্থান কালের উর্ধ্বে, তথাপি কালগত ব্যাপারের সাথে তাঁর কোন না কোন ধরনের একটা সম্পর্ক রয়েছে। নবী করীম (সঃ) বলেন, আল্লাহ পাক প্রতি শতকে বড় ধরনের কিছু ঘটান। হযরত আদম (আঃ)সহ অন্যান্য নবীগণ কেয়ামতের দিন শাফায়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ আল্লাহ পাক আজ এতই রুদ্ররূপ ধারণ করেছেন যা তিনি আর কখনও করেন নি এবং আজকের পরেও করবেন না।

পৃথিবী যখন তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন তার সীমারেখাও নির্ধারিত হয়। আল্লাহ পাক পৃথিবীতে দ্বীন ও শরীয়ত পাঠাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান। সর্বোচ্চ পরিষদ তদনুযায়ী প্রস্তুতি নেয়। তদ্রূপ সময়ে একটি সাধারণ কারণও যদি দেখা দেয় সেটাও মহান দরবারের দরজায় কড়া নাড়াবার জন্যে যথেষ্ট হয়। তখন যে লোকই দরজায় কড়া নাড়বে তার

জন্যে দরজা খুলে যাবে। এ ব্যাপারটি বোঝার জন্যে শস্য উৎপাদনের মৌসুমটি খেয়াল করুন। তখন বীজ বপন-রোপনের ব্যাপারে সামান্য প্রয়াসই যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়। অথচ অন্য মৌসুমে হাজার চেষ্টায়ও তা হয় না। রাসূলে করীম (সঃ)-এর কোন কিছুর দিকে মনোযোগ দেয়া, তার জন্যে দোয়া করা এবং তা আকাঙ্ক্ষা করা এমনকি আল্লাহর ফায়সালা আসার জন্যে অপেক্ষা করা প্রয়োজনীয় কারণের চাইতে অধিক শক্তিশালী কারণ বটে।

হুযুর (সঃ)-এর দোয়া যখন একটি আলোকময় পদ্ধতিকে জীবন দান করে এবং তাঁর দোয়ায় বিরাট এক জামাত তাঁর অনুসারী হয়ে যায়, দেখাদৃষ্টেই খানাপিনায় বরকত দেখা দেয়, তখন সেই হুকুম নাযিলের ব্যাপারে তোমাদের কি খেয়াল যা হচ্ছে একটি সামগ্রিক প্রাণসত্তা আর যার অবস্থান হচ্ছে বস্তুগত এক অবয়বের সাথে?

এ মৌল নীতির আলোকে জানা দরকার যে, হুযুর (সঃ)-এর যুগের যে দুটি বড় দুর্ঘটনা নিয়ে তিনি নিজেও অত্যন্ত পেরেশান হয়েছিলেন, যেমন হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রাঃ) ওপর অপবাদ ও হুযুর (সঃ)কে তা নিয়ে বারংবার প্রশ্ন করা এবং জেহারের ঘটনা। এ ধরনের ব্যাপারও ওহী নাযিলের কারণ হয়ে যায়। এগুলো আসল সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

এভাবে কোন জাতির আনুগত্যে শৈথিল্য দেখানো, আনুগত্যের পরিপন্থী কাজে নিয়োজিত হওয়া, নাফরমানীর ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করা ও অনুরূপ কোন ব্যাপারে অভ্যস্ত হওয়া, এমনকি এ বিশ্বাস রাখা যে, এ কাজ না করলে আল্লাহর কাজে নিদারুণ শৈথিল্য দেখানো হবে, এসবকাজ সেই জাতির ওপর কড়া বিধি- বিধান নাযিল ও উক্ত কার্যাবলী হারাম হওয়ার কারণ হয়ে দেখা দেয়।

এ ভাবেই লক্ষ্য করুন, যখন কোন নেক বান্দা তাঁর পরিপূর্ণ, আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে কায়মনে আল্লাহর দরবারে করুণার বারি বর্ষণের জন্যে দোয়া করেন, তখন তা সঙ্গে সঙ্গে কবুল হওয়ার সংগত কারণ হয়ে

দাঁড়ায়। এ প্রসংগেই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَلَكُمْ *

সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ১০১

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! সেই ব্যাপারগুলো থেকে কোন কিছুর জন্যে তোমরা প্রার্থনা করোনা যা প্রকাশ পেলে তোমরা নাখোশ হবে। কোরআন নাযিলের সময়কালের ভেতরে যদি তোমরা সে ধরনের কিছু চেয়ে বস, তাহলে তা প্রদত্ত হবে।"

আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্ট হন যদি তাঁর বান্দারা শরীয়ত অবতরণ কালে বা তার প্রাক্কালে শরীয়তে কাঠিন্য সৃষ্টি করার মত কোন কাজ বা প্রার্থনা না করে। কারণ, শরীয়ত নাযিলই হয় জনগোষ্ঠীর বিশেষ অবস্থা ও চাহিদার প্রেক্ষাপটে। অনেক সময়ই পূর্ব প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ পরবর্তী জনগোষ্ঠীর জন্যে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই হুযুর (সঃ) প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে বলতেন। তিনি বলেন ঃ যে ব্যাপার আমি তোমাদের ওপর ছেড়ে দেই সে ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করো না। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ অতিরিক্ত প্রশ্ন ও নবীদের বিরোধিতা করে ধ্বংস হয়েছে।

তিনি আরও বলেন ঃ "মুসলমানদের ভেতরে সবচেয়ে অপরাধী সেই লোক যে অহেতুক প্রশ্ন করে বৈধ বস্তুকে অবৈধ করিয়েছে।" হাদীসে এও আছে ঃ "বনী ইসরাঈলরা যে কোন ধরনের গাভী জবাই করলেই যথেষ্ট হত। কিন্তু তারা অহেতুক প্রশ্ন করে ব্যাপারটিকে কঠিন করে নিয়েছে।" আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

পরিচ্ছেদ ঃ আটান্ন

॥ শরীয়তের জন্যে জবাবদিহির কারণ ॥

এখানে আমরা শরীয়ত ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব। আল্লাহ পাক মানুষের জন্যে যা কিছু নির্ধারণ করেছেন, তা করা বা না করার কারণে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে কিনা এবং দেয়া হলে তা কিভাবে করা বা না করার জন্যে দেয়া হবে তা নিয়ে এখানে আলোচনা

করা হবে। যেমন, এক ব্যক্তি নামাযের ওয়াক্তে নামায না পড়ে অন্তরে আল্লাহর ভয় ও ভক্তিতে ডুবে থাকল, তখন তাকে কি নামায না পড়ার জন্যে শাস্তি দেয়া হবে? আর যে ব্যক্তি যথারীতি ওয়াক্ত মত নামায আদায় করল, কিন্তু অন্তরে আল্লাহর ভয় ও ভক্তির উপস্থিতি ছিল না, তাকে কি পুরস্কার দেয়া হবে?

শরীয়তের নাফরমানীর ভেতর যে মারাত্মক ক্ষতি ও জটিলতা রয়েছে তা প্রশ্নাতীত ব্যাপার। এটা সুস্পষ্ট যে, যে কাজ সুনির্ধারিত ও সঠিক পথে বিকৃতি ও বিভ্রান্তি আনে এবং পাপের দুয়ার খুলে দেয়, গোটা মুসলিম মিল্লাত তাতে বিভ্রান্তির শিকার হয়, তাদের রাষ্ট্র , নগর ও পল্লীতে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। এ ধরনের নাফরমানীর উদাহরণ এই যে, কোন শহরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দেয়া হল, কিন্তু কেউ এসে তাতে সুড়ং খুঁড়ে দিল, তারপর নিজে এড়িয়ে গিয়ে বাঁচল, কিন্তু শহরবাসী ডুবে মরল। এখন প্রশ্ন হল, পাপ বা পুণ্যের আওতায় সে লোক আসে কি না?

সকল মজহাব এ ব্যাপারে একমত যে, শরীয়তের বিধি-নিষেধের ভিত্তিতেই পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে। তাদের মধ্যকার মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম ও সাহাবায়ে কেরাম শরীয়তের কাঠামোর সাথে তার প্রাণসত্তার সংযোগও অপরিহার্য মনে করেছেন। তবে যারা দ্বীনের বাহক ও শরীয়তের সংরক্ষক, তারা শরীয়তের কাঠামোকেই যথেষ্ট মনে করেন। ইসলামের দার্শনিকরা বলেন, সাওয়াব ও আজাবের ভিত্তি হল ব্যক্তির সে সব দৈহিক ও চারিত্রিক আমল, যার সাথে আত্মার সংযোগ রয়েছে। শরীয়তের অবয়বের সাথে পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সূক্ষ্ম তাৎপর্যের দিকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এ ব্যাখ্যাটি জাতির পথ ও পদ্ধতির যথার্থই অনুকূল।

আমি বলছি, বিশেষজ্ঞ আলেমদের বক্তব্য হচ্ছে যে, শরীয়তের বিধি-নিষেধের নিয়ামক কতিপয় কারণ থাকে। তার ফলে এক শ্রেণীর সম্ভাবনাকে অপর শ্রেণীর ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়। আল্লাহ পাক ভাল করেই জানেন যে, এ শরীয়ত ও তরিকত ছাড়া সাধারণ জনগোষ্ঠী দ্বীন অনুসরণ করতে পারবে না। তিনি এও জানেন যে, দ্বীন বাস্তবায়নের শুধু পদ্ধতি দিয়েই হবে না তা অপরিহার্য করে দিতে হবে। যে জাতিকে আল্লাহ পাক

এ কাজ দেবেন আদি থেকে তা তাঁর ইলমে মওজুদ আছে। যখন পৃথিবী এরূপ উপযোগী হয়ে যায় যে, আল্লাহর মূল দ্বীন বিশেষ শরীয়তের রূপ ও কাঠামো নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে এবং তা বিশেষ ধরনের শরীয়ত সমগ্র দ্বীনের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। তারপর যখন আল্লাহ পাক সর্বোচ্চ পরিষদকে তা জানিয়ে দেন এবং ইলহাম করে দেন যে, এ শরীয়তই এখন মূল দ্বীনের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং জনগোষ্ঠীকে এরূপ বিধি বিধানের ব্যবস্থা ছাড়া জবাবদিহি করা যাবে না, তখন পবিত্র মজলিস এ ব্যাপারে একমত হয়ে যায় যে, বর্তমান শরীয়তই দ্বীনের যথার্থ রূপ। শব্দের সাথে অর্থের যে সম্পর্ক, মৌলসত্তার সাথে বাহ্যিক অবয়বের যে সম্পর্ক, ছবি বা প্রতিবিম্বের মূল বস্তুর যে সম্পর্ক, বর্তমান শরীয়তের সাথে সনাতন দ্বীনের সেই একই সম্পর্ক।

এসব ক্ষেত্রে প্রমাণ ও প্রমাণিতের ভেতর সুদৃঢ় সম্পর্ক হয়ে যায় এবং এ দুটোর একটি অপরটির জন্যে অপরিহার্য হয়ে যায়। ফলে এটা সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, প্রমাণই প্রমাণিতের স্থলাভিষিক্ত এবং দুটোই এক। অতঃপর এ জ্ঞানের রূপ ও স্বরূপ আরব ও আজমের সকল লোকের অনুভূতিতেই সাড়া জাগাল এবং এ ব্যাপারে সকলেই একমত হয়ে গেল। তুমি এমন কোন লোক দেখতে পাবে না, যে ব্যক্তি তার অন্তরে গোপন দপ্তর রাখেনি। কখনও আমরা সেটার নাম দেই প্রমাণিতের প্রতিবিম্ব। অনেক সময় সেই অংশটির এমন সব অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক প্রভাব ও লক্ষণ প্রকাশ পায়, যা সন্ধানী লোকের চোখ এড়ায় না। কোন কোন শরীয়তে তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ কারণেই সদকাকে সদ্‌কাদাতার ময়লা আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর এ কারণেই আমলের যা কিছু ত্রুটি আত্মিক সাধনার মাহাত্ম্যে নির্মল হয়ে যায়।

অতঃপর যখন রাসূলাল্লাহ (সঃ) প্রেরিত হন, তিনি তখন পবিত্র আত্মার (জিব্‌রাঈল আঃ) সহায়তা পেলেন। আর তাঁর অন্তরে স্বজাতির সংস্কারের প্রবণতা ঢেলে দেয়া হল। শরীয়তের অবতরণ এবং তার রূপ ও স্বরূপ প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর আত্মিক শক্তির এক প্রশস্ত দরজা খুলে গেল। ফলে তাঁর হিম্মত বেড়ে গেল। তখন তিনি সংস্কার কাজের জন্যে অত্যন্ত দৃঢ় সংকল্প নিলেন। নিজ সহযোগীদের জন্যে তিনি দোয়া করলেন আর

বিরোধীদের জন্যে শক্তভাবে লানত করলেন। আম্বিয়ায়ে কেরামের মনোবল সপ্ত আকাশ ভেদ করে চলে যায়। যখন তাঁরা বৃষ্টি বর্ষণের জন্যে দোয়া করেন, তখন যদি সামান্য মেঘের কণাও না থাকে, তথাপি পাহাড়ের মত কালো হয়ে বর্ষা নেমে থাকে। তাদের দোয়ায় মৃত ব্যক্তি জীবন ফিরে পায়। তাদের কারণে পবিত্র মজলিসে সন্তোষ কিংবা অসন্তোষ দেখা দেয়।

রাসূল (সঃ) বলেনঃ নিঃসন্দেহে তোমার নবী ও বান্দা ইবরাহীম (আঃ) মক্কার জন্যে দোয়া করেছিলেন এবং আমি মদীনার জন্যে দোয়া করছি।

অতঃপর যখন বান্দারা জানতে পেল যে, আল্লাহ তাআলা এই নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং এও জানতে পেল যে, সর্বোচ্চ পরিষদ সব রকমের আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে নবী করীম (সঃ)-এর সাহায্য করে থাকে, তারা এও ভালভাবে জেনে নিল যে, আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ ব্যাপারে বিপরীত পদক্ষেপ নেয়া আল্লাহর সাথে ধৃষ্টতা প্রদর্শন এবং কাজে ত্রুটি ঘটানো বৈধ নয়, তারপরও যদি কেউ জেনে-বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিপরীত কাজ করে বসে, তবে সে নিঃসন্দেহে কুফরীর আঁধারে হাবুডুবু খেয়ে থাকে। তার ফেরেশতাসুলভ স্বভাব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। সে কাজের ফলে তার অন্তর পাপে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে যখন কেউ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন কঠিন কাজ করে, আর তখন তা সে কাউকে দেখানোর জন্যে না করে, বরং আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও তাঁর সন্তোষ লাভের জন্যে করে, তখন তার কারণ এটাই হয় যে, তার অন্তর ইহসান ও ফজিলতে পরিপূর্ণ থাকে এবং তার পাশব শক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। আত্মার ওপর পুণ্যকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনের এটাই কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অবশ্য যদি কেউ কোন নামায তরক করে, তখন জানা দরকার যে, কেন সে তা করেছে। কোন বস্তু তাকে সে কাজে বাধ্য বা উদ্বুদ্ধ করেছে? যদি সে ভুলে গিয়ে থাকে বা ঘুমে অচেতন থেকে থাকে কিংবা উক্ত নামাযের ফরজিয়াত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে অথবা এমন কোন সমস্যায় আবদ্ধ থাকে যা থেকে রেহাই পাচ্ছিল না, তাহলে সে ব্যক্তি সর্বসম্মতভাবেই গুনাহ্ থেকে বেঁচে যাবে। পক্ষান্তরে যদি সে জেনে-বুঝে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নামায বাদ দিয়ে থাকে, তাহলে তার এ কাজটি দ্বীনের ব্যাপারে

শৈথিল্য প্রদর্শন বলে বিবেচিত হবে। হয় সরাসরি শয়তান কিংবা তার শয়তান প্রভাবিত আত্মা তার পথে অন্তরায় হয়েছে। কারণ, শয়তানী প্রভাব তার আত্মার দিব্যদৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

তেমনি যে ব্যক্তি নামায আদায় করে দায়িত্ব পালন করে থাকে, তখন অনুমান করা দরকার, সে কি লোক দেখানো নামায পড়ল, না উদ্দেশ্যবিহীনভাবে খেয়ালে এল তাই পড়ল। যদি সেসবের কিছু হয়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি অনুগত বান্দা নয়। তাই তার সে নামাযের কোন গুরুত্ব নেই। হ্যাঁ, যদি সে আল্লাহকে রাজী-খুশী করার জন্যে তা করে থাকে, আর ঈমানের সাথে বুঝে-শুনে যথানিয়মে তা করে এবং সরল নিয়তে কায়মনে আল্লাহর দ্বীনের অনুসরণের জন্যে তা করে থাকে, তাহলে তার আর আল্লাহর মধ্যকার দরজা অপরিহার্যভাবে খুলে গেল। হোক তা সূঁচের ছিদ্রের মতই ক্ষুদ্র দরজা।

যে ব্যক্তি দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করে নিজেকে বাঁচাল সে ব্যক্তি বেঁচে গেল বলে আমি মনে করি না। তা হয়ই বা কি করে? কারণ, আল্লাহর দরবারের ফেরেশতারা দেশ ও জাতির সামগ্রিক সংস্কার ও কল্যাণ কামনা করে দোয়া করতে থাকেন। সে ক্ষেত্রে যে দেশ-জাতি ধ্বংস করে থাকে সে ফেরেশতাদের বদদোয়া পেয়ে থাকে। তাই তার ফলে কোন না কোন শাস্তি নেমে আসে। এ ক্ষেত্রটি বেশ সূক্ষ্ম ও জটিল বিধায় ফেরেশতার দোয়াকে এর শিরোনাম করলাম।

কলা-কৌশল ও কার্যকারণ রহস্য

স্মরণ রাখা চাই যে, বান্দার কোন কোন কাজ এমন হয় যাতে আল্লাহ্ তার ওপর খুশী হন। তেমনি বান্দার কোন কোন কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। অবশ্য বান্দার এমন কিছু হয় যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট কোনটাই হন না। আল্লাহ পাক নেহাৎ দয়া করে বান্দার কাছে রাসূল পাঠিয়ে থাকেন। তাঁর মাধ্যমে তিনি বান্দাকে তাঁর খুশী ও অখুশীর কাজগুলো বাতলে দেন। তিনি বান্দার কাছে কিছু কাজের দাবী জানান এবং কিছু কাজ করতে নিষেধ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য কাজে বান্দাকে স্বাধীনতা দান করেন। যদি কেউ ধ্বংস চায় সে যেন দলীল দাঁড় করে ধ্বংস হয় এবং যে বাঁচতে চায় সেও যেন দলীল সহকারে বাঁচতে পারে।

বান্দার কাছে কোন চাওয়া কিংবা তাকে কোন কাজে নিষেধ করা অথবা তাকে কোন কাজে স্বাধীনতা দেয়া, এ সবই আল্লাহ্‌র হুকুমের আওতায় আসে। এর ভেতরে কিছুতো আল্লাহর খুশী-অখুশীর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। কিছু কাজ আবার তাঁর খুশী-অখুশীর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে না। কখনও কাজের জোর দাবী থাকে যা করলে আল্লাহ্ খুশী হন ও বান্দা পুরস্কৃত হয় এবং তা না হলে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন ও বান্দা শাস্তি পেয়ে থাকে। আবার কোন কাজ দাবী করা হয় এবং তা করলে পুরষ্কার পেয়ে থাকে, কিন্তু না করলে অসন্তোষ ও শাস্তির যোগ্য হয় না।

তেমনি কোন কাজ জোর দিয়ে নিষেধ করা হয় যা পালন করলে সন্তোষ ও পুরস্কার পাওয়া যায় এবং তা না মানলে অসন্তোষ ও শাস্তি দেখা দেয়। তদ্রূপ কোন কোন নিষিদ্ধ কাজ এরূপ যে, তা থেকে বিরত থাকলে সন্তোষ ও পুরস্কার পাওযা যায়, কিন্তু বিরত না থাকলে অসন্তোষ ও শাস্তি দেখা দেয় না। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের পরিভাষায়ও এ ধরনের ব্যাপার দেখা যায়। এর ওপর ভিত্তি করেই শরীয়তের বিধান পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে।

(১) ওয়াজিব (২) মুস্তাহাব (৩) মুবাহ (৪) মকরূহ (৫) হারাম। অনুসারীদের অবস্থানুসারে প্রত্যেক শ্রেণীর সকল কাজ ভিন্ন ভিন্নভাবে সবিস্তারে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কারণ তা অসংখ্য। কোন মানুষের পক্ষেই তা পুরোপুরি জানা সম্ভব নয়। তাই এটা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল যে, প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যে এমন এক মূলনীতি বলে দেয়া যার মধ্যে সেই শ্রেণীর যাবতীয় কাজ শামিল হতে পারে। মানুষ যেন সেই মানদন্ডে নিজ নিজ কার্যাবলীর অবস্থা পরিপূর্ণ পরিজ্ঞাত হতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ে এ ধরনের মূলনীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন, আরবী ব্যাকরণবিদগণ বলে থাকেন, কর্তা পেশযুক্ত হবে। পাঠক তা স্মৃতিতে ধরে রাখে। তাই তারা "কানা যায়দুন ও কাআদা আমরুন" পাঠ করে। এভাবেই তারা সব কর্তার অবস্থা জেনে নেয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে একই রীতি অনুসরণ করে। এরূপ মূলনীতিই সকল কার্যের কারণ হয়ে থাকে। সেটা আবার দু'ধরনের হয়ে থাকে।

নয় বিধায় বিধানও অবস্থানুসারে পরিবর্তিত হয়। শুধু ঈমানের প্রশ্নটিই অনুসারীর জন্যে সর্বাবস্থায় সমানে প্রতিপাল্য।

অনুসরীর অবস্থা বিবেচনার ক্ষেত্রে দুটি দিক বিবেচ্য হয়। এক, অনুসারীর স্থায়ী গুণগত অবস্থা, যার ভিত্তিতে তাকে দায়িত্ব দেয়া যায়। দুই, তার অস্থায়ী গুণগত অবস্থা। এটা পরিবর্তনশীল এবং পরিবর্তিত অবস্থার ক্রমাবর্তন ঘটে চলে। এ ধরনটি বেশীর ভাগ ইবাদতের ক্ষেত্রে দেখা দেয়। যেমন, ইবাদতের ওয়াক্ত, সামর্থ্য, সুযোগ ইত্যাদি। তাই হাদীস শরীফে এসেছে ঃ "যে ব্যক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত ও বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত পেল, তার জন্যে নামাজ পড়া ফরজ হয়ে গেল। তেমনি যে ব্যক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত ও বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় রমযান মাস পেল তার জন্যে শক্তি থাকলে রোজা রাখা ফরজ হয়ে গেল। তেমনি যে ব্যক্তি যাকাত যোগ্য সম্পদের মালিক হয়, আর তা এক বছর স্থায়ী থাকল, তার জন্যে যাকাত দেয়া ফরজ হল। অতঃপর যে ব্যক্তি সফরে থাকে তার কসর নামায ও রোযা ভঙ্গের অনুমতি রয়েছে। এভাবে যদি কেউ নামায পড়তে চায়, তবে তার জন্যে অজু না থাকলে অযু করা ফরজ হয়ে যায়।

এসব ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই গুণের অনুপস্থিতি ঘটে যার ওপর সাধারণ বিধি-বিধান নির্ভর করে। তখন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষ গুণের ভিত্তিতে বিধান প্রদত্ত হয়। যার ফলে এক ধরনের ইবাদতের ওপর অন্য ধরনের ইবাদত বৈশিষ্ট্য পেয়ে থাকে। অবশ্য ভুলক্রমে সেটাকে ইবাদতের কারণ বলা হয়। বলা হয় নামাযের কারণ হচ্ছে ওয়াক্ত উপস্থিত হওয়া। রোযার কারণ হল রমযান মাস উপস্থিত হওয়া। কোন কোন ব্যাপারে স্বয়ং শরীয়ত প্রবর্তক কোন বিশেষ বিশেষণের ভিত্তিতে সময় নির্ধারণ করেন। যেমন, যে ব্যক্তি যাকাত যোগ্য সম্পদের মালিক হয়েছে তাকে দু'এক বছর আগেই যাকাত দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য যাকাতযোগ্য সম্পদের অধিকারী না হলে তার ব্যাপার স্বতন্ত্র। যাহোক, যে কোন ফিকাহ্‌বিদ প্রত্যেটি বিষয়ের সঠিক পরিমাপ ও যথার্থ নির্ধারিণ করতে পারেন। তিনি কোনটিকে কার্যকারণের সাথে এবং কোনটিকে শর্তের সাথে নির্দিষ্ট করে নেন।

করা হয় যার ওপর কাজটি সক্রিয় হয়, কিংবা সেই অবস্থার সাথে কাজটির কোন না কোন সম্পর্ক থাকে। এ কারণটি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে, শরাব পান করা হারাম, শূকর খাওয়া, হিংস্র জানোয়ার ও নখ বিশিষ্ট পাঞ্জাওয়ালা পাখী হারাম, মা'কে বিয়ে করা হারাম ইত্যাদি। কখনও এ কারণটি সাময়িক হয়। একের পর এক করে তা এসে থাকে। যেমন, আল্লাহ-পাক বলেনঃ "পুরুষ কিংবা নারী চোরের হাত কেটে দাও।"

অনেক সময় এমন অবস্থা দেখা দেয় যে, যে বিষয়ে কাজটি সংশ্লিষ্ট হয়, সে বিষয়টি দুই বা ততোধিক অবস্থার সাথে শামিল থাকে। যেমন, শরীয়ত প্রবর্তকের নির্দেশ হল, "বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা কর এবং অবিবাহিত ব্যভিচারীকে কোড়া মার।"

অনেক সময় বিষয়টি অনুসারীর অবস্থার সাথে কাজটি সংশ্লিষ্ট এ উভয় অবস্থায়ই বিবেচ্য হয়। যেমন, শরীয়ত প্রবর্তক বলেছেনঃ সোনা ও রেশমের ব্যবহার এ উম্মতের পুরুষদের জন্যে হারাম, অবশ্য নারীর জন্যে হারাম নয়।

এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহর দ্বীনে কোন আজেবাজে ব্যাপার নেই। যে সব কাজে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি কিংবা অসন্তুষ্টি জড়িত, তা এ রূপে যে, সে সব কাজের এমন বিশেষ রূপ দেয়া হয়, যাতে তার সাথে আল্লাহর খুশী-অখুশীর প্রশ্নটি জড়িয়ে যায়। তাও আবার দু'ধরনের ঃ

এক, ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণে ও অকল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ ও পুণ্য, যেমন– সাধারণ বৈষয়িক কার্যাবলী।

দুই, শরীয়াতের নিছক ধর্মীয় ব্যাপার সংশ্লিষ্ট পাপ ও পুণ্য, যেমন– তাহরীফ বা বিকৃতির পথ বন্ধ করা, বাহানা খোঁজা থেকে বিরত রাখা ইত্যাদি।

এসব নির্ধারিত কার্যাবলীর যথাযথ স্থান ও অপরিহার্য উপকরণ রয়েছে এবং উভয়ের ভেতরে পরোক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির ব্যাপারটিও কেবল ব্যাপক অর্থে সে সবের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন

বলা হল, সুস্থতার কারণ হচ্ছে ওষুধ খাওয়া। অথচ সুস্থতার কারণ হল পিত্তের এলোমেলো অবস্থা গুছিয়ে যাওয়া কিংবা তা সৃষ্টির কারণ দূর হওয়া। তবে স্বভাবতঃই ওষুধ খেলে এসব হয়ে থাকে। কিন্তু ওষুধ ও পিত্তের স্থিরতা এক বস্তু নয়। যেমন, বলা হয়, রোদে ঘুরলে কিংবা হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটলে অথবা উত্তেজনাকর খাদ্য খেলে জ্বর হয়। আসলে তো পিত্ত তেতে জ্বর হয়। আর পিত্ত গরম হওয়া একই বিষয়। অবশ্য তার কারণ ও উপকরণ বিভিন্ন। মূলনীতিকেই যথেষ্ট ভাবা ও তার কার্যকারণ এড়িয়ে চলা শুধু দর্শন শাস্ত্রে পারদর্শীদের জন্যে সম্ভব। কারণ, তাদের দৃষ্টি অনেক গভীরে। সাধারণ লোকের সেই স্তর নয়।

অথচ শরীয়ত সাধারণ মানুষের উপযোগী করেই নাযিল করা হয়েছে। তাই প্রতিটি হুকুম-আহকামের কারণ এরূপ গুণ বিশিষ্ট হওয়া চাই যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয়। কোন বিধানের রহস্য যেন তাদের কাছে গোপন না থাকে। তার অস্তিত্ব কি অনস্তিত্ব কোনটিই যেন তাদের কাছে লুকানো না থাকে। তবে তা অবশ্যই সেই রীতি-নীতির সাথে কোন না কোনভাবে সম্পৃক্ত থাকবে যার সাথে সন্তোষ ও অসন্তোষ জড়িত। হয় তা সেদিকে নিয়ে যাবে কিংবা তার কাছাকাছি করে দেবে।

যেমন, শরাব পান করার ফলে অনেক অন্যায় কাজ দেখা দেয়। সেগুলোর সাথে আল্লাহর অসন্তোষ জড়িয়ে আছে। যেমন, শরাবখোর ভাল ও নেক কাজ থেকে বিরত থাকে। সে আজেবাজে বকে থাকে। পারিবারিক ও নাগরিক জীবন বিপন্ন করে। এ সব খারাপ কাজ শরাব পানের অপরিহার্য কুফল। তাই সব ধরনের শরাব হারাম করা হয়েছে। কোন এক বস্তুর যখন কয়েকটি উপায় ও অনুষঙ্গ থাকে, তখন সেই বস্তুর কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সেটাকেই প্রাধান্য দিতে হবে যেটা সুস্পষ্ট ও রীতি-নীতির সাথে সুসম্পৃক্ত। মূলের সাথে তার অপরিহার্যতা ও কারণ হিসেবে তার সম্ভাবনা সমধিক হতে হবে। যেমন, কসর নামায ও রোযা ভংগের মূল কারণ সফর কিংবা রুগ্নতা। সে দুটোর অন্যান্য অন্তরায়গুলোর ওপর তা নির্ভরশীল নয়। কারণ, কৃষি ও কামারের কাজ যদিও বেশ কষ্টকর কাজ, তথাপি সেগুলোকে কারণ বানালে আনুগত্য ও ইবাদতে বাধা সৃষ্টি হয়ে থাকে। মূলতঃ পেশাদাররা

নিজ নিজ পেশায় জীবিকার তাগিদেই অভ্যস্ত হয়ে থাকে। তাই গরম-ঠান্ডার সঠিক আন্দাজ তাদের থাকে না। কারণ, গরম-ঠাণ্ডারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সেগুলো সব জানাও কঠিন ব্যাপার। নির্দিষ্ট লক্ষণ ও চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা যায় না।

তাই অন্তরায়গুলোর শুধু সেটাকেই বিবেচনায় আনা হয়েছে যা প্রথম যুগেই পরিচিতি ও খ্যাতি লাভ করেছে। সফর ও ব্যাধি এমন ব্যাপার, যার ভেতরে কোন সংশয়ের বালাই নেই। যদিও আজকাল তাতেও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ, আরবের সেই সহজ সরল পয়লাযুগটি খতম হয়ে গেছে। মানুষ এখন সংশয়ের ভেতর গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করছে। মানুষের সেই সুস্থ বিবেক শেষ হয়ে গেছে যা প্রথম যুগে খাস আরবদের ভেতর দেখা যেত।

প্রথম খন্ড সমাপ্ত